জার্মাণী এবং মধ্য-ইউরোপ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—সাড়ে তিন টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার
মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা
হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মাতা গুণময়ী দেবী এবং পিতা বিরজানাথ দেবশর্মার স্মরণে

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

ভূমিকা

পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাসের পেছনে যেমন রয়েছে ইংলণ্ড তেমনি রয়েছে জার্মাণী। একটার সংগে অন্যটার সংঘর্ষের ফলে যেমন করে নূতন কিছুর সৃষ্টি হয় তেমনি জার্মাণী এবং বৃটেনের যুদ্ধের ফলে অনেক নূতনের সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এই ঘর্ষণের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখার জন্য অনেকেই জার্মাণীতে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু সেরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে জার্মাণী দেখতে যাই নি, গিয়েছিলাম ঘটনা-চক্রে। ইংলণ্ডে চলেছিলাম, পথে পড়েছিল জার্মাণী। সেজন্যই যা দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম তাই লিখেছি।

আশা করি পাঠক-পাঠিকা আমার জার্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ ভ্রমণ পড়ে সুখী হবেন, কারণ এখানে আমি কোনও মত অথবা পথের পথিক হয়ে কিছুই লিখি নাই। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন লোকের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে খুব কমই লেখা হয়েছে, তার উত্তরে বলব, উন্নত দেশের আচার ব্যবহার অতি সত্বর বদলে যায়, সেজন্য আমাদের একটুও চিন্তা করতে হবে না। জার্মাণ জাত যে মরবে না এবং আরও উন্নতি লাভ করবে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। ইতি—

গ্রন্থকার

জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

ভিয়েনার পথে

বুদাপেস্তে দিনগুলি বেশ আরামে কাটছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল জীবনের মত থেকে যাই। কিন্তু আমার সামনে ছিল একটা কর্তব্য, উপরন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন পথে চলা বড়ই আরামের। সেইজন্য আমার বন্ধু আইজেক্‌কে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম—আগামী কল্য সকালে আমি ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হবই। আইজেক আমার কথায় আপত্তি করে বলেছিলেন, আরও কয়েক দিন বুদাপেস্তে থেকে স্থানীয় মিউজিয়মগুলি দেখে গেলে ভাল হত। আইজেকের কথায় প্রতিবাদ করে বলেছিলাম,

যুবক

য় দেখবার মত লোক আমি নই। যাদের মিউজিয়ম দেখে

এনে তাঁদে

দের দরকার তারাই মিউজিয়ম্ দেখবে। ভিয়েনা যাবার

আমাকে পেয়ে

দি করার আর একটি কারণও ছিল। কারণটি হ'ল

রাজি হলাম না।

ভিয়েনায় আছেন। যদি তিনি সেখানে থাকেনই

যুবক একটুও দুঃখি

র সংগে দেখা হবে। সুভাষ বাবু ভিয়েনায় আছেন

মতই। আমাকে

জন্য আইজেককে অনুসন্ধান করতে বলেছিলাম।

ভাড়া আমাদের দে

নও সংবাদপত্রের মারফতে সে সংবাদটি পেতে

লক্ষিত হচ্ছিল। জনে

বুদাপেস্তের কোনও সংবাদপত্রে সুভাষ বাবুর প্রকাশ করা হত না। তবুও দেশের কৃতী

সন্তানকে দেখতে পাব এই বাসনা আমাকে পেয়ে বসেছিল এবং ভিয়েনার দিকে সেই বাসনাটাই টেনে নিয়ে চলছিল।

আইজেকের একটি পাঠাগার ছিল। সন্ধ্যার পর তার পাঠাগারে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম কতকগুলি কলের মজুরকে আইজেক অর্থ-নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাকে দেখামাত্র আইজেক অর্থ-নীতির বই খানা বন্ধ করে দিয়ে পূব দেশীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন এবং আমার উত্তরগুলির অনুবাদ মজুরদের বুঝিয়ে দিলেন। যে সকল কলের মজুর আইজেকের ঘরে বসে অর্থ-নীতির পাঠ নিচ্ছিলেন তারা ছিলেন টিনস্মিথ, বাইসাইকেল মেরামতের মজুর, এবং যে সকল ফ্যাক্টরীতে সাইকেল তৈরী হয় সেখানকার মজুর। এই মজুরদের জন্য আমি সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করছি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই শ্রেণীর মজুরদের জন্য আমাদের দেশে সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার হয় না। তার একমাত্র কারণ হ'ল আমাদের দেশ এখনও মজুরীর মূল্য দিতে শিখেনি। প্রায় ঘণ্টাখানেক বসার পর আইজেককে পুনরায় বল্লাম, "আগামী কল্য আমি এখান থেকে চলে যাব, যদি পারেন তবে সকাল বেলা একবার আসবেন এবং শহর থেকে হবার পথটা দেখিয়ে দেবেন।" আইজেক আমার অনু[illegible] হয়েছিলেন।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বৃদ্ধা [illegible] কাছে থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। বিদায়ের পূ[illegible] আমাকে ইহুদী বৃদ্ধা বলে মনে রেখো না, মনে রে[illegible] বৃদ্ধা মাত্র। বসবার ঘরটাতে বসে বৃদ্ধার সংগে অ[illegible] তারপরও আইজেকের কোন পাত্তা না পেয়ে পথে[illegible] কতক্ষণ চলার পর হঠাৎ একজন হংগেরীয়ান [illegible]

আমি লোকটার জন্য দাঁড়ালাম। লোকটী কাছে এসে বল্লে সে-ই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ল এবং যখন ভিয়েনার পথে আমরা এসে পৌঁছুলাম তখন সে আমাকে বল্লে, আপনার কথা আমরা ভুলব না। আমাদের দৃষ্টি আপনার ওপর থাকবেই; এখন এই পথটী ধরে আপনি এগিয়ে যান।

সামনের পথ বড়ই সুন্দর। পথের দুদিকে নানারূপ তরুলতার যেন সাজানো বাগান। বাগানে লোক নাই, শুধু জংলী পাখী গান করছিল। সুন্দর পথে লোকচলাচল মোটেই ছিল না। প্রথম ভাবলাম হয়ত ভুল পথে এসেছি, ফিরে যাওয়া উচিত। পরে ভাবলাম ফিরে যাব কেন, এগিয়ে যাওয়াই ভাল। এমন সুন্দর পথে চলে যদি পথ হারিয়ে ফেলি তবে ক্ষতি কি? সারাদিন পথ চলে বিকাল বেলায় একটি চৌরাস্তা পেলাম। চৌরাস্তার মোড়ে এক জন বাইসাইকেল আরোহী যুবক দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে দেখেই সাইকেলে চড়ে আমার কাছে এসে বিশুদ্ধ ইংলিশে বল্লে আমাকে তার বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হতে হবেই। লোকটির আগ্রহ দেখে তার বাড়িতে অতিথি হওয়া ঠিক করে সেদিকে রওয়ানা হলাম। চৌরাস্তা হতে তার বাড়ি মাত্র দেড় মাইল পথ। যুবক বাড়িতে পৌঁছেই আমাকে বসতে দিয়ে তার মা বাবাকে ডেকে এনে তাঁদের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। যুবকের মা বাবা আমাকে পেয়ে সুখী হলেন বটে কিন্তু আমি তাঁদের বাড়িতে থাকতে রাজি হলাম না। নিকটস্থ হোটেলে থাকাই পছন্দ করলাম। এতে যুবক একটুও দুঃখিত হল না। এদিকের গ্রাম্য হোটেলও দেখার মতই। আমাকে যে রুমখানাতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তার দৈনিক ভাড়া আমাদের দেশের তিন আনার মত। গ্রাম্য ভাব রুমটার সর্বত্র লক্ষিত হচ্ছিল। জলের বেসিন এমনই সুন্দর করে পরিষ্কার করা ছিল

যা দেখলে মনে আপনা হতে একটা পবিত্র ভাব জেগে উঠে। বিছানা এবং টেবিল চেয়ারও সেরূপই পরিষ্কার। বিছানার চাদরখানা ধোপার বাড়ী হতে পরিষ্কার হয়ে আসেনি। হোটেলের মালিক নিজে অথবা তাঁর কোনও আত্মীয় কেচেছিলেন। এমন স্থানে আসলে কারো মনে অপবিত্র ভাব আসে না। গ্রাম্য হোটেলের নিয়ম কানুনও পৃথক। ইউরোপের কোনও হোটেলে খাওয়া পাওয়া যায় না। গ্রাম্য হোটেলে খাওয়া পাওয়া যায় তবে সকল সময় নয়। সকাল দুপুর এবং সন্ধ্যার পর খাবার পাওয়া যায়। আমাকেও সন্ধ্যার পর খাবার দেবার কথা ছিল। সে জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

হোটেলে পৌঁছে শীতল জলে বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। সন্ধ্যার পূর্বে যে যুবকটি আমাকে পথ থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিল সে এসে হাজির হল এবং তার বাড়িতে গিয়ে কিছু খেতে বল্ল। তার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সাজানো টেবিলের কাছে বসে যুবকের মা বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ফার্ম হাউসের মালিকের বাড়ির খাদ্য হোটেলের খাদ্যের মত নয়। সর্বপ্রথমই প্রত্যেককে এক টুকরা ভেড়ার মাংস দেওয়া হয়। টুকরাগুলি ওজনে আধ সেরের কম ছিল না। দুম্বার মাংস বাষ্পে পাক করলে খেতে বড়ই সুস্বাদু হয়। মাংসের পরই দই এবং ক্রিম। দই যার যত ইচ্ছা। আমি প্রায় আধসের দই এবং এক পোয়া ঘন দুধ খেয়েছিলাম। আমার খাওয়া দেখে যুবকের পিতা সুখী হয়েছিলেন এবং তাঁর ছেলে আমার মত খেতে পারে না বলে আক্ষেপ করেছিলেন।

খাওয়া হয়ে গেলে যুবক তার ব্যবসার কথা বল্ল। যুবক ফলের ব্যবসা করে। বোহিমিয়া, মরভিয়া এমন কি জার্মানীতে পর্য্যন্ত সে ফলের চালান দেয়। যুবকের কয়টি "হবি"ও ছিল। স্টাম্প সংগ্রহ তার

অন্যতম। যুবকের হবির কথায় আমি মোটেই ভুলিনি। পথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আমার মত অতিথিকে ঘরে নিয়ে আসার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পরের দিন সকাল বেলা যুবক এসে আমার সংগে সাক্ষাৎ করল এবং বল্ল সেও সত্বরই ব্রসেলস্ যাবে। সেখানে হয়ত তার সংগে আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তারপরই বল্ল, "আপনি রাব (Raab) নামক স্থানে গিয়ে আজ থাকবেন। সেখানে আমার এক বন্ধু আপনার সংগে সাক্ষাৎ করবে। যুবকের কথা মত রাবে পৌঁছে যখন আমি স্থানীয় বাজারে কি কি জিনিষ বিক্রি হয় দেখছিলাম তখন একজন লোক এসে বলল, চলুন, আপনার জন্য হোটেল ঠিক করে রেখেছি। আমি আশ্চর্য্য হইনি বরং সুখী হয়েছিলাম এবং লোকটির সংগে কথা বলে আরাম পেয়েছিলাম। শুধু ইংলিশ বলতে পারি বলে লোকটি আমাকে ঘৃণা করেনি। এখানে কিন্তু গ্রাম্য হোটেলে থাকতে হয়নি। রাব একটি শহর। রাব শব্দটি হ'ল হংগেরীয়ান তবে তার জার্মান নামও ছিল। গেউর (Gyor) হ'ল জার্মান নাম। হংগেরী যখন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখনই হংগেরী ছোট ছোট শহরগুলির জার্মান নাম দেওয়া হয়েছিল।

হোটেলে পৌঁছুবার পর নব পরিচিত ভদ্রলোক বল্লেন তিনি আগামী কল্য এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে একটি ফার্ম হাউসে যাবেন। সেখান থেকে ভিয়েনা আরও আশি কিলোমিটার। ফার্ম হাউসে যদি দু'এক দিন থাকতে চাই তবে তিনি তারও বন্দোবস্ত করবেন। এই বলেই তিনি যখন বের হতে যাচ্ছেন তখন পুনরায় ফিরে এসে বল্লেন, আপনার খরচ চালাবার জন্য অন্যান্য স্থানে যেমন ভিক্ষা করেন তা করতে ভুলবেন না। আপনাকে আমি একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে

পারব না। লোকটির কথায় দুঃখ হয়েছিল।

পরের দিন সকাল বেলা বের হবার সময় দেখলাম সেই ভদ্রলোক সেজেগুজে এসেছেন। আমি বেশি কথা না বলে চলতে আরম্ভ করলাম। দ্বিপ্রহরে একটি ছোট্ট গ্রামে বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পূর্বে আমরা ফার্ম হাউসে পৌঁছলাম। এটা মস্ত বড় একটা ফার্ম হাউস—যেন একটা চা বাগান; হাজার খানেক লোক সেখানে কাজ করে। ফার্মের মালিকের মস্তবড় একটা গেস্ট হাউস রয়েছে। আমরা সেই ঘরটাতেই গিয়ে উঠলাম। আমার সাথী জন্ লিকো ফার্মের মালিককে গিয়ে আমার আসার সংবাদ দিল। এদিকে আমি মুখ হাত ধুয়ে ভাল মানুষটি সেজে বসে থাকলাম। মালিক তাঁর কন্যাকে সংগে নিয়ে এলেন। সকলের সংগে পরিচয় হয়ে যাবার পর ঘন দুধের সংগে ওট মিল মিশিয়ে তাতে প্রচুর চিনি দিয়ে আমাদের এক এক প্লেট করে দেওয়া হ'ল। আমরা সকলেই প্লেটগুলি উজার করে খেলাম। ফার্মের মালিক দোভাষী লিকোর মারফতে জিজ্ঞাসা করলেন পরেজ আমার ভাল লেগেছে কিনা এবং এরূপ কয় প্লেট পরেজ আমি এক সংগে খেতে পারি। লিকোকে বল্লাম এরূপ ষোল প্লেট পরেজ আমি খেতে পাচ্ছি। মালিকের আদেশে তৎক্ষণাৎ ষোল খানা প্লেট ভর্ত্তি করে পরেজ আনা হ'ল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ষোল খানা প্লেট উজার করে দিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নিলাম। ফার্মের মালিক আমার খাওয়া দেখে সুখী হলেন এবং বললেন হয়ত আমার শরীরেও মোংগল রক্ত রয়েছে কারণ, মোংগল এবং নরডিক ছাড়া আর কোন জাতের লোক এত পায়স খেতে পারে না। আমার পায়স খাওয়া দেখে ফার্মের মালিকের কন্যা আমার সংগে একটু ভাব করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে প্রশ্রয় দেইনি।

রাত্রে ফার্মের মালিক অনেক লোককে জড় করে তিনি নিজেই

আমার পরিচয় জানিয়ে বার বার মদ খেতে আরম্ভ করেন এবং অনেককে মদ খেতে দিলেন। ইংলেণ্ডের ডিউক অথবা লর্ডদের সংগে এই লোকটির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। বনিয়াদী ঘরের ছেলে, পিতার সম্পত্তি দাপটের সংগে রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। হংগেরীয়ান সরকারও তাঁকে ভয় করে চলতেন। এত বড় একটা লোকের বাড়িতে অতিথি হওয়া বড় কম কথা নয়। কিন্তু ইউরোপে যাবার পর এরূপ লোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা লোপ পেয়েছিল, কারণ এই লোকগুলিই পৃথিবীর দরিদ্রদের রক্ত শোষণ করে খাচ্ছিল। ফার্ম হাউসের বাড়িতে আসার পর আমিও আমার ব্যবহার একেবারে বদলী করেছিলাম। নাকটা সব সময়েই উঁচু করে রাখতাম। মজুরদের সংগে মিশতাম না। মজুররা যখন কথা বলতে আসত তখন আমল দিতাম না। মজুররাও আমাকে "ধনী" বলে গাল দিত। ভারতেও আমার মত তথাকথিত প্রহসনকারী ধনীর সংখ্যা অনেক আছে।

রাত্রে আমি কিছুই খাইনি কিন্তু কাউণ্টের বাড়িতে যে সকল ধনী নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাদের প্রত্যকের সংগে কথা বলেছিলাম। প্রত্যেকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভারতের তথাকথিত সম্মানিতদের খবরাখবর নিতে কসুর করেন নি। রাত দুটার সময় শুতে গিয়েছিলাম। পরের দিনটা বেশ আরামে কেটেছিল। ফার্মের মালিক আমাকে খেতে ডাকেননি। গেস্ট হাউসেই খানা পিনার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরের দিন সকাল বেলা বের হবার পূর্বে কাউণ্ট এবং তার মেয়ে এসে আমাকে বিদায় দিতে আসেন। বিদায় নেবার সময় কতকগুলি কপট তোষামোদী করতে হয়েছিল। এরূপ কপট তোষামোদী করা আমার অভ্যাস ছিল না সেজন্য ফার্মের মালিকের বাড়ী হতে একটু দূরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। মঁশিয়ে লিকো আমার সংগে কিছুদূর আসার পর তাঁকে

বিদায় দিয়ে আরও সুখী হয়েছিলাম। এরূপ লোকের সংগে চলাফেরাতেও জাহান্নামে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

ফার্ম হাউস থেকে ভিয়েনা মাত্র আশি কিলোমিটার। পথের দুদিকের দৃশ্যাবলী এতই সুন্দর ছিল যে দ্বিপ্রহরের পর ক্ষুধার জন্য তা উপভোগ করতে পারছিলাম না। শরীরটা যখন নেতিয়ে পড়ছিল তখন পথের পাশে একটি ঝোপের নীচে বসে কতক্ষণ বিশ্রাম করলাম, তারপর উঠে একটু দূরে গিয়েই একখানা ঘর পেলাম। ঘরের মালিক একজন হংগেরীয়ান চাষা। তার ঘরখানা দেখার মত জিনিস আসামের দিকে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন অথবা ময়মনসিং অথবা সিলেট জেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পাড়াগাঁয়ের ঘর দেখেছেন। সেই একই ধরনেরই একখানা ঘরে প্রবেশ করে কৃষককে কিছু খেতে দিতে বল্লাম। কৃষক আমাকে কয়টি পেঁয়াজ, একটি লংকা, এক টুকরা রুটি এবং সামান্য পনির এনে দিলেন। তাই খেয়ে আমি এগিয়ে চল্লাম। কতক্ষণ যাবার পরই একটি গ্রাম দেখতে পেলাম এবং ইচ্ছা হ'ল গ্রামের রেস্তোরাঁতে গিয়ে এক পেয়ালা কাফি খেয়ে আসি। সাইকেল সে দিকেই চালালাম।

গ্রামেই পৌঁছেই একটি রেঁস্তোরায় গিয়ে বসলাম এবং ইংগিতে এক পেয়ালা কাফি দিতে বললাম। দোকানী কাফি দিল। কাফি খাওয়া হয়ে গেলে পাশেই বয়ে যাওয়া নদীটার দিকে চেয়ে দেশের নদীর কথা ভাবতে লাগলাম। নদীর জল ঘোলা এবং নদীর উপরে একটা পোল। ওপারেই ব্রাতিস্লাভা নামক শহর। ইচ্ছা হল শহরটা গিয়ে দেখে আসি কিন্তু পোলটার ঠিক মধ্যস্থলে যাবার পরই এক জন চেক্ পুলিশ আমাকে সেদিকে যেতে নিষেধ করল। আমিও তাকে আমার পাসপোর্ট দেখালাম না কারণ ব্রাতিস্লাভা গিয়ে সময় ক্ষেপণ করা আমার ইচ্ছা ছিল না। লক্ষ্য করলাম সেই পুলিশটার মুখের ভংগি। মনে হ'ল সেই পুলিশটার নাকে

মুখে যেন হংগেরীর লোকের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব বেশ ভাল করেই ছাপ মারা রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ আরও পরিস্ফুট ছিল। হংগেরী বুলগেরীয়া যুগশ্লাভিয়া রুমানিয়া এবং গ্রীস হতে কোনও জিপসী চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করতে পারত না। চেক সেপাইটা আমাকেও জিপসীই ভেবেছিল।

পোলটার মধ্যস্থল হতে ফিরে এসে পূর্ব্বের দোকানেই বসলাম। দোকানের অবস্থিতি দেখে নিজের দেশের কথা মনে হল। আমাদের দেশেও এরূপ একটি নদীতীরের দোকানে বসে আমি অনেক দিন দই চিড়া খেয়েছি। নদীতে হাত মুখ ধুয়েছি। আমি যে ইউরোপের একটি নদীতীরে বসেছিলাম সেকথা আমার মনেই ছিল না। আমাকে চিন্তাকুল দেখে বোধ হয় দোকানীর দুঃখ হয়েছিল সেজন্য সে হংগেরীয়ান ভাষাতেই বোধহয় কিছু বলছিল। তার দিকে চেয়ে আমি কিছুই বলিনি শুধু চিন্তা করছিলাম, আমি আজ সত্যিই "Home sick" হয়েছি। দেশে ফিরে যাবার রোগ হতে রেহাই পাবার জন্য আর এক কাপ কাফির আদেশ দিলাম। দোকানী আর এক কাপ কাফি আমার হাতে দিয়ে বল্ল, নদীটা চেকদের ভাগে পড়েছে। যদি নদীতে নামেন তবে গার্ড গুলি করবে। বুঝলাম আসাবধানতা বসত কোনও জিপসি নদীতে নেমেছিল এবং তাকে হত্যা করা হয়েছিল, সেইজন্যই দোকানী আমাকে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে। দোকানীকে হুঁসিয়ার করে দেবার জন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং হংগেরীয় ভাষায় লেখা আমার একখানা পরিচয় পত্র দিলাম। হংগেরীয় ভাষায় আমার পরিচয় পত্র পড়ে দোকানী একেবারে লাফিয়ে উঠল এবং আমার ডান হাতখানা টেনে নিয়ে বার বার করমর্দ্দন করল। আমি যখন সেখান থেকে বিদায় নেবার মতলব করছিলাম তখন অনেক লোক সেখানে জড় হয়েছিল এবং আমার শরীরটা দেখবার জন্য গায়ের

কামিজটা খুলে ফেলতে অনুরোধ করছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল একজন ভারতবাসীর শরীর ভাল করে দেখা সমূহ দরকার কারণ তারা কখনও ভারতবাসী দেখেনি। আমারও ইচ্ছা হচ্ছিল তাদের কাছে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আলাপ পরিচয় করি, কিন্তু তারা হুংগেরিয়ান্ ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানত না সেজন্য অনিচ্ছায় স্থান ত্যাগ করতে হয়েছিল।

নদীর ওপারে কতকগুলি লোক আমাকে দেখছিল। মনে হচ্ছিল তারা সকলেই চেক এবং জার্মাণ। ব্রাতিশ্লাভাতে জার্ম্মাণদের সংখ্যা বেশি, এমনকি শতকরা পঁচাত্তর জন জার্ম্মাণ হবে বলে পরে শুনেছিলাম। জার্মাণেরা ব্রাতিশ্লাভার নাম পরিবর্ত্তন করে প্রেসবার্গ (Pressburg) রেখেছিল। ব্রাতিশ্লাভা শব্দটি হ'ল শ্লাভন। শ্লাভনদের সংখ্যা এশহরে কম, সেইজন্য চেকেরা ব্রাতিশ্লাভাকে প্রেসবার্গে পরিণত [illegible] কোনও আপত্তি করেনি। শহরটির নামের পরিবর্ত্তন যে প্রকারেই [illegible] ক না কেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি ভাবছিলাম চেক সেপাইটার কথা। তার আচরণ আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। ভাতের হাঁড়ি হতে একটি ভাত উঠিয়ে যেমন আমরা হাঁড়ির সমুদয় ভাতের অবস্থা বুঝি তেমনি একটি চেক সেপায়ের আচরণ কিরূপ হবে তার কিছুটা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলাম। পরে যখন চেকো-শ্লোভাকিয়ার মর্‌ভিয়া প্রদেশ ভ্রমণ করি তখন আমার ধারণা [illegible] ঠিক ছিল তা আরও ভাল করে বুঝতে পেরেছিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হবার পূর্বে সংবাদপত্রের মারফতে শুনেছিলাম, ব্রাতিশ্লাভার বাড়িঘর এবং লোক সব কিছুই লোপ পেয়েছে। জার্মাণেরা কতক নষ্ট করেছিল আর বাকিটা সোভিয়েট সেপাইরা উড়িয়ে দিয়েছিল। এটা অভিসম্পাত নয়। অভিসম্পাত বলে কিছুই নাই, এটা হ'ল প্রতিশোধ। যারা সাম্রাজ্যবাদীর আওতায় থেকে বঞ্চিত

হয় তারা পরের দুঃখ বুঝে না। কিন্তু যেদিন তাদের উপর দুঃখ আসে সেদিন তাদের দুঃখে দরদী হবার মত লোক আর থাকে না। বর্তমানের মরভিয়া বোধ হয় আর সেই মরভিয়া নেই। এখন বোধ হয় তারা পরের দরদে দরদী হতে শিখেছে, নতুবা সোভিয়েট রুশের সংগে বন্ধুতা হতে পারত না।

ভিয়েনা

সামনে আরও চল্লিশ কিলোমিটার পথ। চল্লিশ কিলোমিটার পথ সাইকেল ভ্রমণকারীর পক্ষে কম নয়। সাইকেলের গতি ক্রমেই কমে আসছিল। পরিশ্রম এবং খাদ্যাভাবই তার একমাত্র কারণ ছিল। পরিশ্রান্ত হলে কি হবে, পথ চলতে হবেই। কষ্ট করে পথ চলছিলাম। যখন শরীর দুর্বল হয়ে যেত তখন আর কিছুই ভাল লাগত না। পনর কিলোমিটার চলার পর আর একটা ঝোপের নীচে বসে কি যেন ভাবছিলাম হঠাৎ অতর্কিতে মুখ থেকে একটা কথা বের হয়ে যায়। সেই কথাটি হল "বেশি টাকা বেশি বড় মানুষ"। যখন লোক তন্ময় হয়ে কিছু চিন্তা করে তখন তাদের মুখ থেকে অনেক কথা বের হয়ে আসে। আমি বোধহয় ধনী এবং দরিদ্র নিয়েই কিছু ভাবছিলাম, সেজন্যই এই কথা কয়টি হঠাৎ বের হয়ে এসেছিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম করে আবার রওনা হলাম। কতক্ষণ যাবার পরই পথে লোকের চলাচল বৃদ্ধি হতে লাগল। আমার মন সেদিকে

চলে গেল। বাইসাইকেলের পেডেলে তালে তালে পা পড়তে লাগল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমি ভিয়েনার কাছে এসে পড়লাম। ক্রমেই পথটা একটু অপ্রশস্ত এবং অপরিষ্কার বলে মনে হল। তারপরই পাথরে বাধাই পথে এলাম। পাথরের বাধাই পথের পাশেই পাইকারী বাজার থাকে। চাষারা ফার্ম হতে ঘোড়ার গাড়িতে সওদা নিয়ে আসে। পিচ দেওয়া পথে অনেক সময় ঘোড়ার পা পিছলে যায় সেজন্য পাইকারী বাজারের নিকটস্থ পথগুলি প্রায়ই পাথরে বাঁধানো হয়। পাথরে বাঁধানো পথের কাছে এসে মনে হ'ল আমি শহরের কাছে এসেছি। মনটা আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। নূতন চিন্তা এসে ঘাড়ে চেপেছিল। এবার চিন্তা হয়েছিল কোথায় গিয়ে থাকতে হবে? এদিকে সাইকেলখানা উচু নীচু পাথরে ধাক্কা খেয়ে বার বার কেঁপে উঠছিল। কোমরে বেশ ব্যথা অনুভব হচ্ছিল। শীতের প্রকোপে থাকবার ভাবনাটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মনে হল দেখা যাক না এখানে কোনও মজুর গৃহ আছে কি-না?

পথের পাশে সাইকেলখানা দাঁড় করে দুজন পথচারীকে মজুর গৃহের কথা জিজ্ঞাসা করতেই এক জন আমাকে মজুর গৃহের সন্ধান দিতে পারল। সে পথের উপর দাঁড়িয়েই আমার জন্য একখানা মানচিত্র তৈরী করল। আমি সেই মানচিত্র অনুযায়ী কতক্ষণ এগিয়ে চলার পর আবার সাইকেল হতে নেমে অন্য আর একটি লোকের সাহায্য নিলাম। সেই লোকটি আমার সঙ্গে কথা বল্ল না কিন্তু ইসারা করে বল্লে তার সংগে চলতে। চলছি ত চলছিই। সেও আমাকে কিছুই বলছিল না আমিও ভেবে পাচ্ছিলাম না লোকটা আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেড় ঘণ্টা পথ চলার পর আমরা একটি বাড়ির সামনে এলাম। লোকটি আমাকে আবার ইংগিত করে তার সংগে উপরে

যেতে বল্ল। সাইকেলখানা দাঁড় করে আমি তার সংগে উপরে চল্লাম লোকটি আমাকে তার রুমে নিয়ে গেল। দেখলাম তার রুমখানা বেশ সুন্দর। তার রুমে গিয়ে সে কোনও কথা বল্ল না। আমি লোকটির সংগে নানা ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করলাম। অবশেষে বোধহয় লোকটি বিরক্ত হয়েই আমাকে নিয়ে নীচে এসে একটি দরজা দেখিয়ে দিল এবং এক দিকে চলে গেল। লোকটিকে আর বিরক্ত না করে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরে প্রবেশ করে দেখি ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। অনেকগুলি লোক ঘরে বসে কথা বলছে। আমাকে প্রবেশ করতে দেখে অনেকেরই যেন চমক লেগে গেল। এক জন লোক আমার কাছে এসে বল্লে, "আবিসিনী?" অর্থাৎ আমি আবিসিনিয়ার লোক কি না? তাকে বল্লাম যে আমি ভারতবাসী এবং তারপরই লোকটিকে বললাম, আবিসিনিয়ার লোক আর ভারতের লোকের চেহারায় কত পার্থক্য জানেন না? লোকটি কিন্তু আর কথা বলল না। তারপরই আমি চিৎকার করে বললাম, এখানে কেউ ইংলিশ বলতে পারেন? আমার চিৎকার শুনে এক জন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ আমার কাছে ধীর পদবিক্ষেপে এসে বললেন, এরূপ ভাবে অধৈর্য্য হলে ত চলবে না, স্পেন ত এখান থেকে অনেক দূর। আমি তাকে বললাম স্পেনে আমি যাব না। আমি যাব ইংলণ্ডে। বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন, কি চাই বলুন? আমি বললাম, একখানা রুম ভাড়া করে দিন, তারপর খাবারের বন্দোবস্ত করুন—এই ত চাই সবপ্রথম। বৃদ্ধ একটি চেয়ারে বসে বললেন, এখানে বসুন, আগে কিছু খান, তারপর থাকার বন্দোবস্ত করে দেব।

বৃদ্ধের বয়স যদিও ষাট বৎসর হয়েছে তবুও তাঁর শরীরে বেশ শক্তি ছিল। তাঁর শরীর কৃশ এবং মাঝারি ধরণের লম্বা। দাঁতগুলো পরিষ্কার। গায়ে একটি মাত্র সার্ট। পায়ের জুতা বেশ পরিষ্কার। মাথার চুলগুলি

সুন্দর ভাবে সজ্জিত এবং ছোট করে ছাঁটা। বৃদ্ধকে এত শীতে একটি মাত্র সার্ট গায়ে দিয়ে চলাফেরা করতে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। আমার এবং বৃদ্ধের মধ্যে কি কথা হয় তা শুনবার জন্য কয়েক জন লোক আমাদের কাছে এসে বসেছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম অন্যান্যেরা আমাদের দিকে একটু দেখেই ঘাড় ফিরিয়ে আপন আপন কাজে মন দিয়েছিল। পাশ দিয়ে একটি বয় চলে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বললাম কাফি দিয়ে যেতে। সে আমার দিকে তাকাল মাত্র কিন্তু কাফি দেবে বলে মনে হল না। বৃদ্ধকে কাফি আনাতে বললাম। বৃদ্ধ বললেন কয় কাপ কাফি চাই। শুনে দেখলাম আমাদের টেবিলের চার দিকে চার পাঁচ জন বসেছে। আমি প্রত্যেকের জন্য কাফি আনতে আদেশ দিলাম। এতে বৃদ্ধ আমাকে ধনী লোকই মনে করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তবে কেন আপনি এখানে এসেছেন। বৃদ্ধকে বললাম, সেজন্য আপনাকে ঘাবড়াতে হবে না। আমি ধনী লোক নই সেকথা আপনি জেনে রাখুন। এখন যা আমার কাছে আছে তার সংব্যবহার করি, তারপর অন্য ব্যবস্থা করব। অর্থ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, কুড়াতে পারলেই হ'ল। আমরা যে টেবিলে বসেছিলাম তার পাশেই বয়ের কাউণ্টার। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ইংগিত করা মাত্র কয়েক কাপ কাফি এনে দিল। আমরা তাই খেলাম। তারপর বৃদ্ধকে নিয়ে যে ভদ্রলোক রুম ভাড়া দেন তার কাছে গেলাম। এখানে দুরকমের রুম। এক শিলিং এবং ষাট পেনি। এক শিলিংএর রুমে সকল সময়ই থাকা যায় আর ষাট পেণীর রুমে সন্ধ্যা সাতটা হতে সকাল নটা পর্যন্ত থাকা যায়। সাত দিনের ভাড়া একত্রে নেবার অধিকার নাই বলে এক দিনের জন্যই ভাড়া চুকিয়ে আসতে হ'ল। সাইকেল খানা কোথায় রাখতে হবে তাও আমাকে বলে দিলেন। ভয়ে ভয়ে সাইকেলখানা বাইরে রেখেছিলাম। এবার সাইকেল রাখার একটি

নিরাপদ স্থান পেয়ে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হলাম।

বৃদ্ধের সংগে এসে পুনরায় পূর্ব্বের টেবিলখানা দখল করে বসলাম এবং এবার শুধু বৃদ্ধের সংগেই কথা বললাম। বৃদ্ধকে বুঝিয়ে দিলাম পোষ্টকার্ড বিক্রি করেই আমার থাওয়া থাকার খরচ চলে। পোষ্টকার্ড বিক্রি অথবা ভিক্ষার কথা অনেকবার বলেছি সেজন্য এখানে পুনরাবৃত্তি করব না। বৃদ্ধ আমার কথা বুঝলেন এবং আগামী কল্যই আমাকে একটি প্রেসে নিয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে বৃদ্ধকে বললাম, আগামী কল্য হতে আপনার খাবার ও থাকার খরচ আমি দিতে পারি কি? বৃদ্ধের মনে সন্দেহ হচ্ছিল এই ভেবে যে ভিক্ষা করে অর্থ পাওয়া যাবে না। আমি বৃদ্ধকে অভয় দিয়ে বললাম, সেজন্য আপনাকে মোটেই চিন্তা করতে হবে না। আগামী কল্য দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আমি আপনাকে তিন শিলিং দিয়ে দেব। বৃদ্ধ সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না।

ইউরোপ শব্দটি শুনলেই আমাদের মন যেন কেমন কেমন করে। ভিয়েনাতে এসেই বুঝলাম ইউরোপ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব এবং পশ্চি . পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে পড়েছে গ্রেটবৃটেন, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ালী জার্মেণী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্, স্কেণ্ডেনেভিয়া (ডেনমার্ক, নর য়ে এবং সুইডেন) পোল্যাণ্ড এবং সাদা রুসিয়া আর বাকি স ই হল পূর্ব ইউরোপ। পর্তুগাল এবং স্পেনকে ইউরোপের মধ্যে না ধ আফ্রিকার মধ্যেই গণ্য করা হয়। পূর্ব ইউরোপের লোককে পশ্চিম ইউ.রাপের লোক নেটিভ বলত, এবং এখনও গ্রীকদের বৃটিশরা নেটিভ বলে আরাম পায়। পর্তুগাল এবং স্পেনের লোকের আচার ব্যবহার, গানের সুরে আরবদের সঙ্গে বেশ একটা সংমিশ্রণ রয়েছে তা সকলেই স্বীকার করে এবং যে কোন বিদেশী দুএক ঘণ্টার মধ্যে তা অনুভব করতে পারে। আমি

স্পেনে অথবা পর্তুগালে যাইনি অতএব আমার পক্ষে লোকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা ছাড়া কিছুই বলার নেই।

এতদিন আমি পূর্ব ইউরোপে ভ্রমণ করছিলাম। আজ পশ্চিম ইউরোপে এসেছি অর্থাৎ খাস ইউরোপে এসে থাকবার বন্দোবস্ত করেছি। এখন আগামী কল্য হতে খাবার বন্দোবস্ত করতে হবে এই যা ভাবনা। এ নিয়ে আর বেশি চিন্তা করা দরকার মনে করলাম না। সন্ধ্যার পর খাবার খেয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় আর এক জন লোক কোথা হতে এসে বললে সেও পর্যটক, সেও পৃথিবী ভ্রমণ করে। আমি সেই লোকটির সংগে আগামী কল্য সকালবেলা কথা বলব বলে উপরে চলে গেলাম।

সকালে উঠেই আমি বাইরের একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় গেলাম। রেস্তোরাঁর বয় বোধহয় আমার মত ক্রেতা আর দেখেনি। তাই বার বার সে নানা কথা বলে কয়েক খানা "হট্ কেক্" মধু এবং মারগারিন দিল। আমি মারগারিন না খেয়ে হট কেক্, মধু এবং কাফি খেলাম। তারপরই মজুর গৃহে ফিরে আমাদের টেবিলে এসে বসলাম। কতক্ষণ পর বৃদ্ধও এলেন। তিনি এসেই আমাকে বললেন, মনে রাখবেন এবার আপনি খাটি ইউরোপে এসেছেন। হংগেরিতে কি করেছেন না করেছেন তা জেনে আমার দরকার নেই, এটা কিন্তু ইউরোপ। এদিকে তুরুকরা আক্রমণ করতে সক্ষম হয়নি সেজন্য আমাদের সভ্যতার মধ্যে "তুরুকদের বর্ব্বরতা" প্রবেশ করেনি। মুখে যদিও হাঁ হাঁ করলাম কিন্তু মনে যেন কি একটা দুর্বলতা অনুভব করলাম এবং সেই দুর্বলতাকে দাবিয়ে দিয়ে খাঁটি অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপ সম্বন্ধে আরও সংবাদ সংগ্রহে মন দিলাম।

এই বৃদ্ধ ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে অনেক বৎসর বাস করার পর

স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি ভাবছিলেন স্বদেশে ফিরে এসে সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁর বাকি জীবনটুকু কাটাবেন কিন্তু দেশে এসেই বুঝলেন তিনি যে ধারণা করে দেশে ফিরছিলেন যে ধারণা কার্য্যকরী হবে না। তাঁকে বেকার জীবনই কাটাতে হবে এবং ভিক্ষা লব্ধ অর্থে ভরণ পোষণ করতে হবে। তাঁর স্ত্রী পুত্র সবই ছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই বিদ্রোহী জীবন কাটিয়ে অকালে নানাদেশের জেলে থেকে মৃত্যু বরণ করেছেন। বৃদ্ধ এখন বিদ্রোহীদের কথা শুনতেও ভালবাসেন না। বিদেশের কথা শুনে, বিদেশীদের সংগে কথা বলে সময় কাটাতে ভালবাসেন। আমিও একজন বিদেশী, সেজন্য তিনি আমার কাছে আমাদের দেশ সম্বন্ধেই কথা বলতে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি কথার পেছনে অথবা তিনি যে সকল প্রশ্ন আমাকে করতেন তাতে আভিজাত্যের গন্ধ থাকত সেটি আমি বেশ ভাল করেই বুঝতাম। যাদের পরিবারে আভিজাত্য ভাব রয়েছে তারাই শুধু অন্যের আভিজাত্য ভাবপূর্ণ কথার অর্থ বুঝতে পারে। অন্যলোকে যে বুঝতে পারে না তা নয় তবে একটু পড়াশুনা করার পর সে ভাবটার খাটি চিত্র চোখে ধরা পরে। বৃদ্ধ এবং আমি যখন প্রেসের দিকে চলছিলাম তখন বৃদ্ধকে আভিজাত্যের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার পরিষ্কার কথা শুনে বৃদ্ধ সুখী হয়েছিলেন এবং সে সম্বন্ধেই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলছিলেন।

প্রেসের কাজ অতি সত্বর শেষ করে আমরা মজুরগৃহে ফিরলাম। এই মজুর গৃহটি পূর্বে স্যাল্‌ভেসন আর্মির বাড়ি ছিল। স্যাল্‌ভেসন আর্মি এংলো-এমেরিকানরা স্থাপন করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ মিটে যাবার পরও স্যাল্‌ভেসন আর্মির বাড়িটা আমেরিকানরাই পরিচালনা করছিল। পরে তারা বাড়িটা অষ্ট্রিয়ান্‌দের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

অষ্ট্রিয়ানরা তাদের উপনিবেশ হারাবার পর গ্যাল্‌ভেসন আমি বজায় রাখা দরকার মনে করেনি সেজন্য সেই ঘরটিকে মজুরগৃহে পরিণত করে-ছিল। মজুরগৃহের আয় ব্যয় সমান। মজুরগৃহে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ খুলে মুনাফা খেতে কেউ রাজি ছিল না। মজুরগৃহের কার্য্য মজুররাই চালাত, এতে সরকার অথবা পুঁজিবাদীর কোন হাত ছিল না।

মজুরগৃহে আমরা বারটার সময় ফিরে আসি এবং অনেকগুলি লোক দেখতে পাই। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এরা সবাই বেকার, সবে মাত্র ভিক্ষা করে ফিরছে ; এখন এখানেই সস্তা খাবার খেয়ে বিশ্রাম করবে, তারপর আবার ভিক্ষা করে রাত্রে এসে শোবে। গত রাত্রে সকাল সকাল শুয়েছিলাম বলেই লোক সমাগম দেখতে পাইনি। আমরা কারো সংগে না মিশে এক কোণে বসে খাবার আনতে আদেশ দিলাম। খাদ্যে আলুসিদ্ধ, রুটি, সামান্য সবজি এবং সুপ ছিল : মাখন আমরা বাইরে থেকে কিনে এনেছিলাম। আমরা মাখন খাচ্ছি দেখে অনেকেই আমাদের ধনী বলে বিদ্রূপ করেছিল। আমরা কাউকে কিছু না বলে খাবার খেয়ে সিগারেট ধরালাম। বৃদ্ধ চারটের সময় আসবেন জানিয়ে বিদায় নেন। আমি উপরে না গিয়ে নীচেই বসে থাকলাম।

পূর্বেই বলেছি ঘরটাতে অনেক লোক ছিল। আমাকে একা পেয়ে একটি লোক আমার কাছে এসে বসল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি প্যারী যাব কি না? বার্লিন এবং প্যারী দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল সেজন্য প্যারীর কথা বলতেই প্রাণটা যেন চমকে উঠল। লোকটিকে এই মাত্র বলেছিলাম যে যদি শীত সামনে এসে পড়ে তবে স্পেনে যাব না। আমার কথা শুনে লোকটি আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করেই অন্যত্র গিয়ে বসল। লোকটির ইংলিশ বলাতে বুঝতে পেরেছিলাম সে বিদেশী ভাষা বেশ ভাল জানে এবং

আত্মগোপন করে আছে। রাষ্ট্রনীতি নিয়ে যারা চর্চ্চা করে তাদের মুখ থেকেই বড় বড় শব্দ বের হয়। এই লোকটির মুখ থেকেও যে কয়টি কথা কথা বের হয়েছিল তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম দরিদ্রের বেশে শিক্ষিত লোকটি আত্মগোপন করে আছে।

শীতের পর গ্রীষ্ম এবং তারপরই আবার শীত আসে। বৎসর চলে যায়। কিন্তু ইউরোপের লোক যে পরিবর্তন চায় তা আর আসে না দেখে তারা হাহুতাশ করছিল। অনেকে মত বদলিয়ে আবার পূর্বমত গ্রহণ করছিল। ইউরোপ চাইছিল পরিবর্তন, সে পরিবর্তন যে দিক দিয়েই আসুক তাতে তাদের ক্ষতির কারণ ছিল না। তারা ধনীদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছিল না। সেই অত্যাচার কোথায় এবং কি ভাবে হচ্ছিল তাই আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম।

ইটালী আবিসিনিয়ার ওডাওরা নামক স্থানটি নিয়ে মামুলী একটি ঝগড়ার সৃষ্টি করে। সেই ঝগড়াকে উপলক্ষ করেই ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, ইউরোপের মজুর সে সংবাদ রাখত। অনেকের ধারণা ছিল, পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা ছোট ছোট এশিয়াটিক এবং আফ্রিকার মামুলী স্বাধীন দেশগুলিকে করায়ত্ব করে স্পেনের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের ভেতর দিয়েই সোভিয়েট রুশিয়ার ঘাড় ভাংবার চেষ্টা করবে। সেজন্যই ইউরোপের মজুর শ্রেণীর লোক স্পেনের আশে পাশে থেকে যাতে স্পেনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তারই চেষ্টা করছিল। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ম যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে না থাকে সেজন্য তারা ফ্রান্সের মজুর সমাজকে সকল সময়ই হুসিয়ার রাখত। ফ্রান্সের মজুর সমাজের উপর বিদেশী প্রগতিশীল মজুর সমাজের অনেক প্রভাবও পড়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাগী আসামী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মিত্র মঁশিয়ে লাভাল সে কথাটাই লা-মাতিন নামীয় সংবাদপত্রে প্রায়ই

বলতেন—"ফ্রান্স অতি সত্বরই বলসেভিক হবে" এবং সেজন্য তিনি বৃটিশকেই দায়ী করতেন। ফরাসী ভাষা আমি জানতাম না, এখনও জানি না তবে "লা মাতিন" সংবাদপত্রের অনেক কিছুই দৈনিক টেলিগ্রাফ নামক একখানা ইংলিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। টেলিগ্রাফ প্রকাশিত হ'ত প্যারী হতে। টেলিগ্রাফ কে বা কাহারা পরিচালনা করত সেই সংবাদ নেবার জন্য আমি মাথা ঘামাই নি। সম্পাদকীয় পড়েই বুঝতাম, সংবাদপত্রখানা কোনও ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পড়লেই যেমন মনে হয়, তারা বৃটিশ ধনীদের বার্ত্তাবহ মাত্র, টেলিগ্রাফেও সেই সুরই ছিল।

ফ্রান্সের Man of the street—সাধারণ লোক যাতে সাম্রাজ্যবাদী পরিচালিত সংবাদপত্রের মোহে না পড়ে সেজন্য ফ্রান্সের শিক্ষিত লোক এবং বিদেশাগত প্রগতিশীলরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। প্যারীতে পৌছানোর পর এক ভদ্রলোক আমার কাছে আমাদের দেশের সংবাদপত্র গুলির একটি মোটামুটি আভাস চেয়ে বসেন। আমি তখনও ভারতীয় সংবাদ পত্রের বিশেষ কোনও সংবাদ রাখতাম না, সেজন্য এংলো ইণ্ডিয়ান্ সংবাদ পত্রগুলিকে বেশ গাল দিয়ে আর বাকিগুলিকে বেশ প্রশংসা করেছিলাম। আমার জবাব শুনে একজন ভারতীয়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা বলুন ত ভারতের কয়খানা সংবাদপত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্গত? প্রশ্নের জবাবে যখন বলেছিলাম, ভারতের প্রায় সংবাদপত্রই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তখন ভারতীয় ভদ্রলোক বলেছিলেন, সেজন্যই আমাদের দেশের সংবাদপত্রের বিশেষ উন্নতি হতে পারছে না। যে সকল সংবাদপত্রের মালীকানা স্বত্ব প্রাইভেট লিমিটেড তারা কি করে জাতের ভালমন্দ দেখতে পারবে? যদিও ভারতীয় এংলো

ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রগুলি বিদেশী মূলধনে পরিচালিত হয়, তবুও তারা তত ক্ষতি করে না, যত ক্ষতি করতে সক্ষম হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্গত সংবাদপত্রগুলি। অমৃত বাজার পত্রিকার কথা মনে করে ভারতীয় ভদ্রলোকের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু কালের চক্রে অতি পুরাতন কথাও নূতন হয়ে ভেসে উঠছে আর মনে হচ্ছে হয়ত একদিন ভারতীয় ভদ্রলোকের কথা ভারতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধীনের সংবাদপত্রের প্রতি আরোপিত হবেই, কারণ সম্পাদকের স্বাধীনতায় যখনই হাত পড়ে তখনই এরূপ হয়।

বিকালবেলা বৃদ্ধ আসার পরই তাঁর হাতে তিন শিলিং দিয়ে বল্লাম, আপনি কিছু মনে করবেন না, আজ এর বেশি দিতে পারলাম না। এখন চলুন ভিক্ষাপত্র অর্থাৎ পোষ্টকার্ডগুলি নিয়ে আসি। বৃদ্ধ দ্বিরুক্তি না করেই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রেসে গিয়ে আমরা ভিক্ষা পত্রগুলি তৈরী দেখলাম এবং দাম দিয়ে তাই বগল দাবা করে যখন ফিরছিলাম তখন বৃদ্ধকে কতকগুলি সংবাদপত্র আপিসে দিয়ে যেতে বল্লাম। বৃদ্ধ আমাকে স্থানীয় একটি বড় সংবাদপত্র আপিসে নিয়ে গেলেন। আমাদের দেশে সেরূপ সংবাদ পত্র অপিস আজ পর্য্যন্ত গড়ে উঠেনি। অতএব সেই সংবাদপত্র অপিসটির কথা একটু বলা দরকার মনে করি।

দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করলেই দেখতে পাওয়া যায় রিপোর্টারদের বসবার স্থান। নূতন লোক গেলেই সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা নবাগতকে ঘিরে দাঁড়ায়। আমাকেও তারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল এবং সংগের বৃদ্ধকে আমার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আরম্ভ করেছিল। বৃদ্ধ আমার ভ্রমণের খুটিনাটি কথা বলতে সক্ষম হননি দেখে তাঁকে দোভাষী রূপেই কাজ করতে বাধ্য করলাম। আমার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের রিপোর্টারগণ অনেক কথা জানতে পারল এবং তারপর একটু দাঁড়াতে বল্ল কারণ ইউরোপে কেউ

নিজে এসে যদি কোনও রিপোর্ট দেয় তবে তাকে তার দাম দেওয়া হয়। দাম পেতে হলে সম্পাদকের সম্মতি নিতে হয়। আমার সংবাদ নিয়ে কয়েকজন রিপোর্টারই সম্পাদকের কাছে গিয়েছিল। যখন রিপোর্টারগণ সম্পাদকের কাছে গিয়েছিল তখন অনেক রিপোর্টারই বলছিল, এই সংবাদ দেবার জন্য আপনি পঞ্চাশ শিলিং পাবেন। কিন্তু আমি জানিতাম, আমি কিছুই পাব না। স্থানীয় বৃটিশ "অথরিটি" আমার সংবাদ স্থানীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশ করতে দেবে না। কার্যত তাই হয়েছিল। রিপোর্টারগণ ফিরে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল, মহাশয় দয়া করে ভিয়েনার কোনও সংবাদপত্র অপিসে যাবেন না। কেউ আপনার সংবাদ গ্রহণ করবে না। রিপোর্টারদের কথা শুনে আমি মোটেই দুঃখিত হইনি কারণ বুদাপেস্তে আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এখানে যে তাই হবে সেকথাও আমি জানতাম। এখানে সুভাষ বসুর সম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রকাশ হয় নি। সুভাষ বসু সম্বন্ধে স্থানীয় কমিউনিষ্ট পত্রিকাগুলিই যা কিছু ছাপিয়েছিল। কমিউনিষ্ট পত্রিকাগুলি গোপনে বের হ'ত এবং গোপনেই লোকে তা পড়ত। এতে সুভাষ বসুর নামের এবং কাজের প্রচার হয়েছিল বেশি। ভিয়েনাতে তখন অনেকেই সুভাষ বসুর সংগে মেলামেশা করতে আসত কিন্তু তিনি সেখানে বেশি দিন থাকেন নি। পিন্‌সিন্ নামক চেকোশ্লোভাকিয়ার এক সেনিটোরিয়ামে আশ্রয় নেন্। ভিয়েনাতেও সুভাষ বসুর সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু কতকগুলি লোক রটিয়ে দিয়েছিল সুভাষ বসুর সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

সংবাদপত্র অপিস হতে ফিরে এসে আমরা পুনরায় মজুর গৃহে আসলাম এবং পোষ্টকার্ডগুলি রেখে দিয়ে নিকটস্থ একটা বড় রেস্তোরাঁতে গিয়ে সেদিনের দৈনিক লণ্ডন টাইম পত্রিকা পড়ে পৃথিবীর কিছুটা সংবাদ সংগ্রহ করি। আমার মন খারাপ থাকায় সেদিন আর

কোথাও যাইনি এবং বুদ্ধকেও পরের দিন চারটার পূর্বে আমার সংগে দেখা না করার জন্য বলে দেই। উদ্দেশ্য ছিল বৃটীশ কন্সাল এবং যাঁরা সুভাষ বসুর তত্ত্বাবধান করতেন তাঁদের সংগে সাক্ষাৎ করা। সুভাষ বসুর তত্ত্বাবধায়কদের সংবাদ নিতে হলে স্থানীয় কমিউনিষ্টদের সন্ধান না পেলে সে সংবাদ পাব না মনে করে বিকাল বেলা চুপ করে মজুর গৃহেই বসে থাকলাম। যে লোকটী বলেছিল সেও একজন পর্যটক, সেই লোকটা মজুর ঘরের এক পাশে চুপ করে বসেছিল। আমি গিয়ে তাঁর পাশে বসলাম এবং একটা দামী সিগারেট তাঁর হাতে তুলে দিলাম। আমাদের দেশের লোক যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার সময় হা ভগবান ইয়া আল্লা বলে তেমনি সেই লোকটীও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার সময় কি বল্ল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার সময় কি বলছেন? তিনি বল্লেন—"বিদ্রোহ বেঁচে থাক" কথাটাই তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছে। তাঁর পরিচয় নিয়ে জানলাম তিনি জাতে জার্মাণ। সত্বরই তিনি স্পেনে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে সে দেশটা কেমন দেখে আসবেন। তাঁর কথা শোনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে ভারতবাসীরা কোথায় থাকে জানেন? তিনি বল্লেন, আপনাদের দেশের সুভাষ বোস এসে প্যালেস হোটেলে ছিলেন, সেখানে গেলেই তাঁর সকল সংবাদ পাবেন। আমি আর দেরী না করে সেদিকে রওয়ানা হয়েছিলাম।

ভিয়েনার গলিপথ বড়ই সুন্দর। গলিপথে অতি কম লোকই সাইকেলে চলে। দুঃখের সহিত বলছি ভিয়েনার গলিপথে আমারও পায়ে হেঁটেই চলা উচিৎ ছিল। কিন্তু সাইকেলে চলে চলে যাদের অভ্যাস হয়ে যায় তাদের পক্ষে পায়ে হাঁটা বড়ই কষ্টকর হয়। গলিপথ ধরেই প্যালেস হোটেলে পৌছুলাম। প্যালেস হোটেলে পৌছে সুভায় বসুর সংবাদ দুজন ভারতীয় ছাত্রের কাছে পেলাম। শুনলাম কয়েক দিন

হল তিনি পিণ্‌সিনে চলে গেছেন। সেদিন আর কারো সংগে দেখা না করে শহরের গলিপথগুলিই ভাল করে বেড়ালাম। বিকালে মজুর গৃহে এসে দেখলাম বৃদ্ধ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ভয়ানক পরিশ্রান্ত ছিলাম বলে তাঁকে বসতে বল্লাম এবং উপরে গিয়ে হাত ধুয়ে বৃদ্ধের সংগে এসে বসলাম। বৃদ্ধ আমাকে বসতে না দিয়ে ভিক্ষা করিবার জন্য একটি বড় রেস্তোরাঁর দিকে নিয়ে চল্লেন।

ইউরোপে অনেক শহর আমি দেখেছি কিন্তু ভিয়েনার মত কাফে আর কোথাও দেখিনি। ভিয়েনার কাফি তৈরীর নিয়ম এবং ভিয়েনার কাফে পৃথিবীর শিক্ষিত লোকের কাছে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে নানা দেশ হতে লোক এসে কাফি খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। পৃথিবীর শিক্ষিত ধনীদের নানা খেয়াল থাকে। ভিয়েনাতে কাফি খাওয়া এবং জনাকীর্ণ শহরের থেকে নিরিবিলি অনুভব করবার জন্য এখানে অনেক লোক আসে। শুধু তাই নয়, ভিয়েনার ডাক্তার পৃথিবী বিখ্যাত। যে সকল রোগীকে কোন মতেই নিরোগ করা যায় না সেরূপ রোগী এখানে এসে আরোগ্য লাভ করে। যখন ভিয়েনাতে ছিলাম তখন কয়েকজন ভারতবাসীকেও রোগারোগ্যের জন্য দেখতে পাই। বাস্তবিকই ভিয়েনাতে এসে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। আমি আনন্দ পেয়েছিলাম নানা দিক থেকে। রাষ্ট্রনীতি চর্চা, আমোদ প্রমোদ এবং নানারূপ বিজ্ঞানের বিষয় জানা ইত্যাদি। লণ্ডন, বার্লিন, প্যারি প্রভৃতি বড় বড় শহরেও আমি গিয়েছি কিন্তু সেই শহরগুলিতে সের সুযোগই বোধহয় আমি পাইনি, তারই ফলে হয়ত আমি সেই শহরগুলির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু একথা আমি এখনও জোর করে বলতে পারি যে ইউরোপের ভিয়েনা বাস্তবিকই তখন আনন্দের ছিল। বার্লিনে তখন নাৎসিইজমের যৌবন এসে দেখা দিয়েছিল। বার্লিনে

তখন ধর বল্লে মারতে আসত। প্যারীতে তখন চলছিল পুরাদমে নির্য্যাতন। কে কাকে ধরে কোন দিন জেলে দেয় তার স্থিরতা ছিল না। আর লণ্ডন। সেখানে পুরাদমে চলছিল বেকারদের আর্ত্তনাদ। কিন্তু সেই আর্তনাদের পেছনে ছিল এংলো-জার্মান প্রীতির প্রচ্ছন্ন প্রহসন। বাস্তবিক পক্ষে তখন ইউরোপে শান্তি ছিল না। ভিয়েনায় যদিও লোকের অর্থাভাব ছিল তবুও বাইরের লোক এসে বুঝতে সক্ষম হত না, কোথায় ভিয়েনার অর্থাভাব। ভিয়েনার লোকও সাধারণ লোকের যাতে কিছুটা সুবিধা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, একদিন আমি কয়েকজন ভিক্ষুকের সংগে তাদের ভিক্ষা প্রণালী দেখতে যাই এবং চার ঘণ্টা তাদের সংগে থাকি। মজুর গৃহ হতে তিন জন করে ভিক্ষুক এক এক দলে বের হতে থাকে। আমি যে দলে ছিলাম সেই দলে আমার পূর্বপরিচিত বৃদ্ধও ছিলেন। তাঁরা একটি বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়েন। কড়া নাড়া মাত্র একজন মহিলা দরজা খুলে দেন। তিনজন ভিক্ষুক আমাকে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেই অন্য একটি দরজাতে করাঘাত করেন। সেই ঘরে কেউ ছিল না। দ্বিতীয় দরজায় করাঘাত করা মাত্র একজন মহিলা বের হয়ে এসে ত্রিশ পেনী দিয়ে একখানা রসিদ গ্রহণ করেন। এরূপ করে আমরা চারিটি দরজায় করাঘাত করার পর রেস্তোরাঁয় চলে আসি। ভিক্ষুকদের প্রত্যেকের ভাগে চল্লিশ পেনী করে পড়েছিল এবং সেই চল্লিশ পেনী দিয়ে তিন জন ভিখারী মজুর গৃহে ফিরে এসে খাবার খেয়েছিলেন। বিকাল বেলা আবার ঐ তিনজন ভিখারী ছয়টি ঘরে ভিক্ষা করতে যান এবং প্রত্যেকে আশি পেনী করে পান। রাত্রে শোবার জন্য আট পেনী প্রত্যেকের দিতে হয়েছিল, বাকি কুড়ি পেনী দিয়ে খাবার খেয়েছিলেন। একশত পেনীতে এক শিলিং হয়। তখনকার দিনে

অষ্ট্রিয়ার এক শিলিং আমাদের দেশের প্রায় টাকা চার আনার সমান ছিল। অষ্ট্রিয়ার লোক এরূপ করেই ত দেশের বেকার সমস্যার সমধান করত। যারা বেকাদের ভিক্ষা দিত না, তাদের বাড়ি হতে বেকারগণ শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন জিনিষ এনে বাজারে বিক্রি করে যা পেত তাই দিয়ে তারা তাদের খরচ চালাত। পুলিশ বেকার মজুরদের কিছু বলত না। কারণ লক্ষ লক্ষ মজুরকে যদি জেলে আবদ্ধ করা হয় তবে সমুদয় অষ্ট্রিয়া যে জেলখানাতে পরিণত হবে।

বেলা তখন সাড়ে ছয়টা। পশ্চিমাকাশের সূর্য্য তখনও অস্ত যায়নি। পথে বের হয়েই সুন্দর সূর্য্যকে দেখে সুখী হয়েছিলাম। দুদিকের দৃশ্যাবলীও কম সুন্দর ছিল না। ধীর পদবিক্ষেপে আমরা পথ চলে নদী তীরের একটি প্রকাণ্ড রেস্তোরাঁর কাছে এলাম। বৃদ্ধ আমাকে বল্লেন, সবপ্রথম আপনাকে রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের কাছ থেকে ভিক্ষা করার অধিকার নিতে হবে। আমরা সর্বপ্রথম ম্যানেজারের অপিসে গিয়ে ভিক্ষা করার অধিকার নিলাম। ম্যানেজার আমাকে ভিক্ষা করার অধিকার দিয়ে বল্লেন, জার্মান পর্যটকরা আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ইণ্ডিয়া হতে কোনও পর্যটক আমার এখানে আজ পর্য্যন্ত আসেননি। আমরা বিদেশী পর্যটকদের বড়ই ভালবাসি। অতএব আপনি তিন দিন ধরে আমার রেস্তোরাঁতে পোষ্টকার্ড বিক্রি করতে পারবেন। হোটেল ম্যানেজার ক্রুর ভদ্রলোক। পোষ্টকার্ড বিক্রির আদেশ দিয়েই তিনি বল্লেন, আপনি যে খাঁটী পর্যটক তার প্রমাণ কিছু আছে? পাসপোর্ট অনেকে দেখাতে পারে কিন্তু আপনি যে একটার পর আর একটা দেশ ভ্রমণ করেছেন তার প্রমাণ কি? আমি তৎক্ষণাৎ তার সামনে আমার বগলে-দাবা অটোগ্রাফ বইখানা দেখালাম। ম্যানেজার ভিক্ষাপত্র লিখিত দেশগুলির নাম অনুযায়ী বইটা মিলিয়ে

দেখলেন, তারপর বল্লেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি রেস্তোরাঁয় উপস্থিত ভদ্রলোকদের কাছে গিয়ে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। এতে আপনার প্রাপ্তি বেশিই হবে।

রেস্তোরাঁয় তখন অনেক লোক খাচ্ছিলেন। রেস্তোরাঁতে একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল। রেস্তোরাঁ ম্যানেজার সেটার উপর দাঁড়িয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়ান্ ভাষায় কিছু বল্লেন। তারপর আমাকে পোস্টকার্ড বিলি করতে বল্লেন। পোস্টকার্ড বিতরণ এবং পয়সা কুড়ানো এক জিনিস নয়। পয়সা কুড়াবার ভার বৃদ্ধকে দিলাম। বৃদ্ধ তাঁর টুপিটা বাঁ হাতে ধরে প্রত্যেক টেবিলে যেতে আরম্ভ করলেন এবং যে যা দিল তাই সংগ্রহ করে নিয়ে [illegible]লেন। বৃদ্ধের টুপি রুপা এবং তামার মুদ্রায় ভরে গিয়েছিল। তিনি [illegible]র টুপিটা খালি করে আমার কাছে দিয়ে গিয়ে পুনরায় বাকি টেবিলে গিয়ে আর এক টুপি ভর্তি রুপা এবং তামার মুদ্রা নিয়ে আসেন। সেই মুদ্রাগুলিও আমার হাতে অম্লান বদনে দিয়ে বল্লেন, আজ আর ভিক্ষা করতে হবে না। চলুন ছোট্ট একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খাই এবং কত পেলেন তা গুনে দেখা যাক। ছোট্ট রেস্তোরাঁতে গিয়ে গুনে দেখলাম প্রায় দেড় শত শিলিং হয়েছে। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে পঁচিশ শিলিং দিয়ে বল্লাম, আমরা কাল সকালে রেস্তোরাঁয় গিয়ে, রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে যা পেয়েছি তা বলে আসব এবং তিনি দিন কোথাও না গিয়ে শহরটি ভাল করে দেখব। বৃদ্ধ আমার কথায় রাজি হলেন এবং পেট ভরে বিয়ার খেয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলেন। বৃদ্ধকে বিদায় দিয়ে আমি স্থানীয় ইন্দো-অষ্ট্রিয়ান ক্লাবের সন্ধানে বের হলাম এবং যাতে সেদিনই সেই ক্লাবের কারো সংগে দেখা হয় তার চেষ্টা করতে লাগলাম। ইন্দো-অষ্ট্রিয়ান ক্লাবের সন্ধান পেলাম বটে কিন্তু কারো দেখা পেলাম না।

পথে বেরিয়ে আসার পর এক জন স্ত্রীলোকের সংগে দেখা হ'ল। তিনি ইংলিশ ভাষা ইংলিশদের মতই বলেন তবে তাঁর জাত হল "ভিনীক"। আমার দেখা পেয়েই মহিলাটি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। আমার মনে হল তিনি যেন তাঁর হারানো গরুটিকে খুঁজে বের করেছেন। তিনি আমার সংগে চলতে আরম্ভ করলেন এবং বলতে লাগলেন, ভিয়েনার মত স্থানে দোভাষী ছাড়া চলা উচিত নয়। আমার নিশ্চয়ই দোভাষীর দরকার হবে। বর্তমানে এদেশ থেকে অনেক অষ্ট্রিয়ান্ ফ্রান্সে যেতে আরম্ভ করেছে। তারা সাম্যবাদ বিরোধী এবং রাষ্ট্রনীতিতে যাদের মামুলী জ্ঞানও নেই তাদেরই তারা ফাঁদে ফেলে ফ্রান্সে নিয়ে হাজির করে এবং তথা কথিত প্রগতিশীলদের হাতে সঁপে দেয়। তার পরই বল্লেন, আপনি নিশ্চয়ই মঁশিয়ে অগ্নিহোত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আমি এখন যা আপনাকে বলেছি তা আপনাকে বলেছেন। মঁশিয়ে অগ্নিহোত্রী বড়ই ভাল লোক, তার সংগে যাওয়া আসা করবেন। মহিলা আরও বললেন যে আগামী কল্য সকালে অগ্নিহোত্রীর সংগে দেখা করে আমার সম্বন্ধে সকল কথা অবগত হয়ে আমাকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করবেন।

আমি চলছিলাম মজুর গৃহের দিকে। তিনিও আমার সংগে মজুর ঘরের দিকেই চলছিলেন। কতক্ষণ চলার পর মহিলা আমাকে মস্ত বড় একটি হোটেল দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, এখানে ভারতের রাজা মহারাজারা বাস করেন। আপনি তাদের সংগে দেখা করতে পারেন। হোটেল সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় ইংরেজী সংবাদপত্রও পাওয়া যায়। এই রেস্তোরাঁয় বিশিষ্ট লোক ছাড়া আর কেউ আসে না। এখানে এক পেয়ালা কাফি ষাট সেণ্ট করে বিক্রি হয়। অন্য রেস্তোরাঁয় এরূপ কাফিই দশ সেণ্টে পাওয়া যায়। এখানে সেণ্টকে পেনী বলা হয়।

মহিলার কথা শুনে অনেক কিছুই বুঝলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, অষ্ট্রিয়া হতে স্পেনে লোক যায় কেন? আমার কথা শুনে মহিলা অনেকটা আশ্বস্ত হলেন কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন স্পেনের ঘটনাবলীর সংগে আমার কোন যোগাযোগ নেই এবং আমি কমিউনিজম সম্বন্ধে কিছুই জানি না। যোগাযোগ ছিল না এটা সত্যিকথা কিন্তু কমিউনিজম সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই জানতাম। মহিলা আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে স্পেনে যারা যায় তারা এক বদ্‌খেয়ালী গোছের লোক এবং পৃথিবীতে অশান্তি আনার জন্যই তারা ব্যস্ত। এসব লোককে কোন মতেই সাহায্য করা উচিত নয়। আমিও হাঁ হাঁ করেই মহিলাকে বিদায় দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু মহিলা "নাছোড়বান্দা"। উপায়ান্তর না দেখে মহিলাকে নিয়েই মজুর গৃহের দিকে রওয়ানা হলাম। মহিলা মজুর গৃহের সামনে এসেই থম্‌কে দাঁড়ালেন এবং বল্লেন, এরূপ স্থানেই কি আপনি থাকেন? কি করব মেম্, আমি ত ধনী লোক নই, বড় বড় হোটেলে থাকার মত অর্থ আমার কাছে নেই, সেজন্যই এখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি কি মনে করেন এই স্থানটা খুবই খারাপ? মহিলা বল্লেন, এখানে অনেক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বাস করে এবং কমিউনিজম প্রচার করে। স্পেনে লোক পাঠায়। সুখের বিষয় এখনও গুণ্ডারা আপনাকে স্পেনে পারশেল করতে সক্ষম হয়নি। আগামী কল্য আমি আপনার জন্য অন্যত্র থাকবার বন্দোবস্ত করব। আমার সাহায্যকারী বৃদ্ধ খাওয়া শেষ করে শোবার জন্য কিশোর বয়স্ক বেকারদের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে বল্লাম, এই বাড়িতে নাকি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বাস করে? এরা নাকি মামুলী লোককে ধরে স্পেনে পারশেল করে? বৃদ্ধ কিছু না বলে কিশোরদের হোটেলে চলে গেলেন কারণ তিনি সেই ঘরটাতে কিশোরদের রক্ষণাবেক্ষণ

করতেন। মহিলা আমার কাছে বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না, কাজ আছে বলে বিদায় নিলেন।

পরের দিন সকাল বেলা বৃটিশ কনসালের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। দানীয়ুব নদী পার হতে হ'ল। দানীয়ুব নদীতীরে সুন্দর সেতু। সেতুর উপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন অনুভব করছিলাম বাস্তবিকই আষ্ট্রিয়ান সভ্যতা বলকানের সভ্যতা হতে অনেক উচ্চস্তরের। বড় বড় সুন্দর দালান। মাঝে মাঝে বড় বড় একতলা রেস্তোরাঁ। পথের দুদিকে বড় এবং উচ্চ ফুটপাথ। ফুটপাথগুলি যেন সবেমাত্র কেউ পরিষ্কার করে রেখে গেছে। সবসাধারণের মধ্যে শহরে থাকার স্থান আছে। কলিকাতা অপরিষ্কার একথা সকলেই বলে। কিন্তু কি করে কলিকাতাকে পরিষ্কার রাখা যায় সেকথা কেউ বলে না। শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গ্রামের লোকের শিক্ষার উপর অনেকটা নির্ভর করে।

ভিয়েনার বৃটিশ কন্‌সালের বাড়িতে পৌঁছেই আমার নামের একখানা কার্ড পাঠিয়ে দিলাম। এক মিনিটের মধ্যেই কন্‌সাল আমাকে ডাকলেন এবং বসার পরই বল্লেন, এখানে কেন এলেন, আপনাদের কন্‌সাল ত প্যালেস হোটেলেই রয়েছেন, সেখানে গেলেই পারতেন? কন্‌সালের কথাগুলি আমি "হিউমার" রূপেই গ্রহণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, এখনও আমার মন হতে গোলামী ভাব যায়নি সেজন্য পুরাতন মনিবের সংগে দেখা করতে এসেছি। বৃটিশের হিউমার উপভোগ করার শক্তি আছে। তাই আমার কথায় কন্‌সালের মনে কোন দাগ কাটছিল না। কন্‌সাল আমাকে পর্যটক রূপেই গ্রহণ করেছিলেম এবং পর্যটককে যা বলা হয় তা বলে বিদায় করেছিলেন। অন্যান্য দেশের কন্‌সাল তাদের স্বদেশের পর্যটককে আর্থিক সাহায্য করে, কিন্তু ভিয়েনার বৃটিশ কন্‌সাল

ভারতবাসীকে সাহায্য করার মত কোন কারণ খুঁজে পাননি বলেই আমাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেছিলেন। এতে আমারও দুঃখ করার কিছুই ছিল না।

মজুর-ঘরে ফিরে আসার পর একজন বেকার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় গিয়েছিলাম। বৃটিশ কন্‌সালের বাড়ি গিয়েছিলাম শুনে বেকার মজুর কেঁপে উঠলেন। তাঁর মুখখানা সাদা হয়ে গেল। আমি তাঁকে অভয় দিয়ে বল্লাম, ঘাবড়ে যাবেন না। বৃটিশ কন্‌সালের সংগে দেখা করাও আমার পক্ষে একটি কর্তব্য। আমি রাষ্ট্রনৈতিক নই। আমার দ্বারা আপনাদের ক্ষতি হবার কোন কারণ নাই। পাশে বসে এক ভদ্রলোক সিগারেট তৈরী করেছিলেন। লোকে সিগারেট খাবার পর যে অংশটা ফেলে দেয়, সেই অংশগুলি কুড়িয়ে এনে তা হতে ভাল তামাক বের করে তিনি সিগারেট তৈরী করে তা বেকার মজুরদের কাছে সস্তায় বিক্রি করতেন। সেই ভদ্রলোক আমার কথা শুনে একটু হাসলেন এবং বল্লেন, আমরা ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেট কুড়িয়ে তা দিয়ে সিগারেট তৈরী করে খাই, আমাদের ভয় বলে কিছুই নাই, তবে আপনার মত লোক আমাদের সংগে বাস করা ভাল মনে করি না। যাকগে এটাও একটা ডিমোক্রেসী। ধনী ইচ্ছা করে যদি দরিদ্রের সংগে বাস করে তবে দরিদ্র কি করতে পারে?

ইউরোপে যক্ষ্মারোগ বড়ই তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে। ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেটও যক্ষ্মারোগ বিস্তারের একটি কারণ। যে দেশের লোক দারিদ্র্যের জন্য ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেট ব্যবহার করে তারা কত দরিদ্র তা সহজেই অনুমেয়। ভদ্রলোককে তার মন্তব্যের জন্য কিছুই বলতে সাহস হ'ল না। ভদ্রলোক অশিক্ষিতও নন্। তবুও তিনি এই অন্যায় ব্যবসাটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার সাহায্যকারী বৃদ্ধ আসার পর

তাঁর কাছে কুড়ানো সিগারেট ব্যবসায়ীর কথা বলায় তিনি আমাকে বল্লেন, ভুলেও যেন আমি এই লোকটির সংগে কথা না বলি। এই লোকটিকে জার্মানী হতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই এখনও জার্মানীতে আছে। হিটলার কমিউনিস্ট হত্যার জন্য একটি ফাঁদ পেতেছিলেন। সেই ফাঁদ ডিঙিয়ে তিনি ভিয়েনাতে আসেন। ভিয়েনাতে আসার পর তিনি কোনও প্রকারের কাজ যোগাড় করতে সক্ষম হননি। এদিকে স্ত্রী পুত্র কন্যার মায়া তাঁকে কাবু করে ফেললে। উপায়ান্তর না দেখে এখন তিনি ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেট তৈরী করে নিজে ব্যবহার ত করেনই উপরন্তু যে সকল লোকের অর্থাভাব তাদের কাছেও তিনি এই বিষ বিক্রয় করেন। তিনি শীঘ্রই ফ্রান্সে যাবেন এবং সেখান থেকে ইউরোপের কোথাও যদি লড়াই বাধে তবে তিনি এবং তাঁর দলের লোক তাতে যোগ দেবেন। মরণের ভয় ওদের নাই। তাঁরা যদি বিষাক্ত সিগারেট ব্যবহারও করেন তবে সমাজের কোন ক্ষতি হবে না। এখানে আরও অনেক লোকের সংগে দেখা হয়েছিল যাঁরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু অর্থাভাবে তাঁদের কোথাও যাওয়া হচ্ছিল না। স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধবে আর মরতে যাবে অষ্ট্রিয়ার লোক তা কেমন রাজনীতি তা আমার জানা ছিল না, কিন্তু তা পরে জেনেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম স্পেনের গৃহ বিবাদ স্পেনের ভিতরে আবদ্ধ থাকবে না। হিটলার, মুসোলিনী, চেম্বারলেন, দালাদিয়ের সকলে একজোট হয়ে স্পেনে যাতে সোসিয়েলিস্ট সরকার না হয় তারই চেষ্টা করবেন। সেই চেষ্টাতে অষ্ট্রিয়াও পেছনে পড়ে থাকেনি। অষ্ট্রিয়া সরকার যখনই বুঝতে পেরেছে যে এই লোকটা স্পেনে গিয়ে রিপাবলিকানদের সাহায্য করবে তখনই তাকে ধরে আটক করেছে। অনেককে পৃথিবী হতে বিদায়ও করে দিয়েছে। তাতে

ইউরোপে কোন জাতের লোক বাদ পড়েনি। ভিয়েনার থাকার সময়ই আমার সাহায্যকারী ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, "গতকল্য এক ডজন কমিউনিষ্টকে গুলি করে মারা হয়েছে। তাদের মৃত্যু সংবাদ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়নি, তাদের কোন আদালতে নিয়ে বিচার করা হয়নি, শুধু ধরা আর মারা।" সংবাদটা শুনে মনে হয়েছিল যেন আমি মগের মুল্লুকে বিচরণ করছি। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে কেউ যেন ভুল করে বর্তমানের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সংগে অতীতের রাষ্ট্রনীতির জগা খিচুরী না করেন।

বাইসাইকেলে করে ক্রমাগত ভ্রমণ করলে শরীর দুর্বল হয় এবং নানা রকম রোগও আক্রমণ করে। বুলগেরীয়ার পার্ব্বত্য ভূমি এবং যুগশ্লাভিয়ার উত্তর দিক ভ্রমণ করার সময় খাদ্যাভাবে শরীর বেশ দুর্ব্বল হয়েছিল। দুর্বলতার জন্য কন্‌ষ্টিপেসন হয় এবং পরে ফাটা অর্শ রোগ এসে দেখা দেয়। ভিয়েনাতে পৌঁছানোর পর ফাটা অর্শ রোগটি আমাকে বেশ আক্রমণ করেছিল। রোগের কথা মনেই ছিল, ঔষধের কোনও ব্যবস্থা করতাম না। আজ হঠাৎ মনে হল ভিয়েনাতে এসে যদি শরীরের চিকিৎসা না করাই তবে বড়ই বোকামী হবে। এই ভেবে বৃদ্ধ আসার পর আমার রোগের কথা তাঁর কাছে বল্লাম। তিনি বল্লেন, এখনই চলুন, আমি আপনাকে এমন এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব যিনি পাইলস্ রোগের চিকিৎসা করেন। তিনি শুধু এই রোগটি চিকিৎসা করেন না, এই রোগের যাঁরা চিকিৎসা করেন তাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। বৃদ্ধের কথা শুনে বৃদ্ধকে নিয়ে আমি ডিস্‌পেন্‌সারীর দিকে চল্লাম। পথে দু'একজন ভারতীয় ডাক্তারের সংগে দেখা হ'ল কিন্তু তাঁদের সংগে কথা বলার জন্য কোথাও না দাঁড়িয়ে একেবারে ডাক্তারের বাড়িতে গেলাম। ডাক্তার তখন বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। কতক্ষণ পর

আমাকে ডেকে ছোট্ট একখানা প্রেস্‌কিপশন দিলেন এবং করমর্দ্দন করে বিদায় দিলেন। আমার মত দরিদ্র লোকের প্রতিও এত বড় ডাক্তারের দয়ার কার্পণ্য নেই দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম আর ভাবছিলাম নিজের দেশের কথা।

রুশ দেশের দরিদ্ররা যখন খাদ্যাভাবে মরত তখন রুশের ধনীরা একটুও দুঃখিত হত না। তারা বলত এসব লোক বরফ পড়ার পূর্বে আসে এবং বরফ পড়ার সংগে সংগেই লয় পায়। আমাদের দেশেও যারা মেডিকেল স্কুল কলেজে পড়ে তারা প্রায়ই ধনীর ছেলে মেয়ে। তারা কি বলে জানি না তবে তাদের ব্যবহার অন্যধরণের সেকথা আমার বেশ জানা আছে। একদিন আমার জনৈক বন্ধু ভিনিরিয়েল রোগে আক্রান্ত হয়ে একটি সরকারী ঔষধালয়ে যান। ভারতীয় ডাক্তার সাহেব আমার বন্ধুর চৌদ্দপুরুষ সবপ্রথম উদ্ধার করলেন, তারপর ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদিতে যেরূপ ব্যবহার দেখালেন তাতে মনে হ'ল, কশাইরাও চতুষ্পদী জীবকে হত্যা করার পূর্বে সেরূপ নির্যাতন করে না। বাধ্য হয়ে আমার বন্ধুকে আমি একজন জাপানী ডাক্তারের আশ্রয় নিতে বলেছিলাম। জাপানী ডাক্তার ইউরোপীয়ানদের মতই বলেছিলেন, ভয় কিসের, কয়েক দিনের মধ্যেই ভাল হবেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ব্রহ্মপ্রদেশের মারগুই নামক স্থানে।

এরূপ কুব্যবহারের একমাত্র কারণ হ'ল, মধ্যবিত্ত ধনীদের দরিদ্র মধ্যবিত্তের প্রতি সেরূপ সহানুভূতি নেই। তারপর যারা দরিদ্র তাদের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি থাকতেই পারে না। আমাদের দেশের দরিদ্র লোকেরা শীতের কয়টা দিন কিছু খেতে পায় তারপর যেই গরম আসে অমনি কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি রোগ এবং বন্যজীব তাদের যতদূর পারে টেনে নিয়ে গিয়ে উদরসাৎ করে। এতে ধনী এবং মধ্যবিত্তদের

প্রাণে মোটেই আঘাত লাগে না। যদি এদের প্রাণে আঘাত লাগত তবে এরা হয় পাগল হ'ত নয় বিদ্রোহ করে অকালে মরত।

ভিয়েনাতে আমি যে ডাক্তারের কাছে ঔষধ নিতে গিয়েছিলাম সেই ডাক্তারের ঘরে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি ঘটনা ঘটে। তা দেখতে পেয়ে আমার জ্ঞানচক্ষু আরও খুলেছিল। আমি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাদের দেশে যারা সম্মানিত এবং বুনিয়াদী ঘরের লোক বলে গর্ব করে তাদের কোনদিন কোনরূপ সম্মান দেখাব না। কারণ তারা যা বলে গর্ব করে তারা তা নয়। তাদের গর্ব আর ভেকের পাত কূপে লাফালাফি করা একই কথা। ভারতের "নেটিভ প্রিন্স" থেকে আরম্ভ করে যে কোন তথাকথিত সম্মানিত লোকই হন্ না কেন, তিনি ভারতবাসীই। ভারতবাসী বৃটিশের অধীনস্থ দেশ সে কথা সকলেই জানে। পরের অধীনের দেশগুলিকে ইউরোপের দেশগুলি "কলোনিয়েল" বলে অভিহিত করে। কলোনী এবং কলোনিয়েল এই দুটি শব্দে অনেক প্রভেদ রয়েছে। ইউরোপীয়ানরা যে দেশে গিয়ে বংশানুক্রমে বসবাস করে সে দেশকে বলে কলোনী। আর যে দেশকে তারা স্বদেশে বসে শাসন করে তাকে বলা হয় "কলোনিয়েল"। ভারতবর্ষ হ'ল "কলোনিয়েল" দেশ। অতএব এদেশের লোকের সম্মান অসম্মানের কোনও বালাই নাই। নিজের চোখের সামনে দেখলাম একটা লোক ডাক্তারের সামনে হাত জোড় করে বসে আছে। লোকটার শরীরের রং আমারই মত কালো। তারপর সে ডাক্তারের পায়ের কাছে মাথা নত করে বলতে লাগল, দয়া করে আমার ছেলেটাকে বাঁচান্। ডাক্তার রাগ করে বল্লেন, ইউ রাজা হাম্বাগ, বি ষ্ট্রং, আই ট্রাই, ইয়োর বেবী নট্ ডেড্।" You Raja humbug, be strong, I try, your baby not dead. এর মানে হল, তুমি রাজা নও, মামুলী লোক, তোমার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য

আমি চেষ্টা করছি। ভারতীয় রাজাদের পায়ের কাছে মাথা নত করে অনেক লোক ক্রন্দন করে। রাজারা যা দেখে তাই শিক্ষা করে। রাজাও ভেবেছিল সে যদি ডাক্তারের পায়ে ধরে কাঁদে তবে বোধ হয় তার ছেলের জন্য ডাক্তার বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত করবেন। ডাক্তার রাজাকে যা বলেছিলেন তা পূর্বেই বলেছি। রূপ যাদের মানসিক শক্তি তাদের প্রতি বিদেশী ডাক্তার কেন সম্মান করবেন? ভারতের সকল রাজাই যে অপদার্থ তা আমি বলব না তবে একথা বলবই, যারা নিজের জাতের উপর কর্তৃত্ব করে, অপরের কাছে মাথা নত করে রাখে তারা বাস্তবিকই নরাধম। এরূপ একটা নরাধমের প্রতি বিদেশী ডাক্তার কি করে সম্মান দেখাতে পারে?

এই ঘটনা দেখবার কয়েক দিন পর একটা পাগড়ীধারী ভারতবাসীকে মোটর চালিয়ে চলে যেতে দেখে মনে হল এ লোকটাই কি সেই রাজা? সে যেই হোক আমি আর তার দিকে তাকালাম না। অষ্ট্রিয়ান্ বৃদ্ধ আমার সংগে ছিলেন সেজন্য এসব বাজে লোকের সংগে পরিচয় করতেও ইচ্ছা ছিল না। কতক্ষণ পর দেখলাম লোকটা মোটর ফিরিয়ে আমদের দিকেই আসছে। আমরা দাঁড়ালাম। লোকটা আমাদের কাছে এসে মোটর থামাল এবং আমার দিকে চেয়ে বল্ল, হ্যালো। আমি লোকটাকে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই? তৎক্ষণাৎ লোকটা মোটর চালিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। ভেবে পেলাম না, সে কে এবং কি জন্যই বা আমার কাছে এসেছিল। অষ্ট্রিয়ান ভদ্রলোক আমাদের চাহনী দেখে বল্লেন, লোকটা নিশ্চয়ই কোনও বদমতলবে এসেছিল। আসুন ত আমি ডাক্তারের সংগে ফোনের একটু কথা বলে দেখি, আপনি যখন ঔষধ নিতে গিয়েছিলেন তখন কোনও ভারতবাসীর প্রতি ডাক্তার কোনরূপ অসদ্ব্যবহার

করেছিলেন কি না? বৃদ্ধকে বাধা দিয়ে বল্লাম, সে বিষয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। যতদিন ভিয়েনায় থাকব ততদিন আপনার মত কেউ না কেউ আমার সংগে থাকবেই, অতএব ভয়ের কোন কারণ নাই। দেশে গিয়েও এই কাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে লিখতে পারব না। নেটিভ রাজাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখে মতবাদ প্রকাশ করা আইন বিরুদ্ধ। অষ্ট্রিয়ান বৃদ্ধ বল্লেন, আমাদের দেশে শতবর্ষ পূর্বেও জার, কাইজার, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ইত্যাদির বিরুদ্ধে লোকে অনেক কথাই লিখত, তা বলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হত না। ইউরোপে শতবর্ষ পূর্বে কি হয়েছিল না হয়েছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার দরকার ছিল না বটে, কিন্তু যদি বৃদ্ধের কথা সত্য হয় তবে ভারতবাসী সভ্য সমাজের এত পেছনে পড়ে রয়েছে বলে দুঃখ করতে হবেই।

পরের দিন সকালবেলা আমরা একটি বড় হোটেলে কাফি খেতে গিয়েছিলাম। তখন ছিল সকালের দশটা। ইউরোপের সকাল বিকাল সকল সময়েই রেঁস্তোরায় লোকারণ্য থাকে। সকালে আমি পোষ্টকার্ড বিক্রি করতাম না। সংবাদপত্র পাঠ এবং লোকের সংগে কথা বলেই সময় কাটাতাম। সেদিনও সংবাদপত্র পড়তেই গিয়েছিলাম। লণ্ডন টাইমস্ সংবাদপত্রখানা খুলে বসেছি। সংগের বৃদ্ধ অষ্ট্রিয়ান ভাষার সংবাদপত্রে মন দিয়েছিলেন। এমনি সময় কয়েক জন লোক আমাদের কাছে এসে বসল এবং আমার পরিচয় চাইল। আমার পরিচয় দেবার পর একজন মহিলা আমাকে বল্লেন, আমার বড়ই ইচ্ছা, আমার ছেলেটি ভারতীয় যুবতীকে বিয়ে করুক। শুনেছি ভারতীয় স্ত্রীলোক শ্বশুর-শাশুড়ীকেও নিজের পিতামাতার মতই ভালবাসে। মহিলাকে বল্লাম, আপনার ধারণা খুবই সত্য। আমাদের দেশে যদি আর্থিক সচ্ছলতা থাকত, আপনাদের দেশের মত যদি সর্বত্র হস্‌পিটাল থাকত তবে

আমাদের দেশের লোক স্ত্রী অথবা ছেলের স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত না। হস্‌পিটালে গিয়ে নার্স এবং হস্‌পিটাল অর্ডার্‌লীদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করত। আপনাদের দেশে হস্‌পিটাল রয়েছে বলেই আপনারা ছেলের স্ত্রী কিরূপ যত্ন করে তারই আস্বাদের অপেক্ষায় আছেন। আমাদের দেশের ছেলেদের স্ত্রীর যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকত তবে তারাও আপনাদের মত হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, কাবেরে প্রভৃতিতে গিয়ে সময় কাটাত। আমাদের দেশের লোক সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির দিকে অগ্রসর না হয়ে, স্ত্রীলোকদের কতকগুলি উপকথার ভেতর দিয়ে তাদের মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। যেদিন তারা বুঝবে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তাদের সেই শৃঙ্খল ছেঁড়ার মত শক্তি হয়েছে তখন দেখবেন ভারতীয় যুবতীগণ তুর্কীর হারেমের মহিলাদের চেয়েও বেশি করে ভারতীয় সমাজে বিশৃঙ্খলা আনবে। তারা প্রতিশোধ নেবে। তারা ভারতের বুকের উপর ঘুঘু চড়াবে। অতএব দয়া করে ভারতীয় যুবতীর সংগে আপনার ছেলের বিয়ে দিলে উপ[illegible] চেয়ে ক্ষতিই হবে। অষ্ট্রিয়ান্ মহিলা আমার কথা শুনে স্বজ্ঞানে [illegible] গেলেন এবং ভারতীয় মহিলারা যে এখনও রূপকথার ধাঁধাঁয় নিমজ্জি[illegible] াছে সেজন্য দুঃখিত হলেন।

আমি মহিলাকে বল্লাম, আমাদের দেশের পুরুষ [illegible] স্ত্রীলোকদের সেবাদাসী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে[illegible] তারই [illegible]ন্য আজ আমরা বৃটিশের প্রজা। এখন আপনাদের দেশের কথাও আমার কিছু বলা দরকার। আপনাদের দেশেও যখন কোন [illegible]ক কাজ পায় তখন লোকে তাকে সৌভাগ্যবন্ত বলে থাকে। মানুষ কাজ করবে, তার পেছনে রয়েছে সৌভাগ্য, সে কেমন কথা? এই কথাটি কি আপনাদের পুঁজিবাদীদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে না? আপনাদের বাড়ির

কাছেই রয়েছে সোভিয়েট রুশিয়া। সেদেশে সকলেই কাজ আমার সকলেই সুখে আছে অথচ আপনাদের দেশে সুখ বলে ি রতে নেই। কিসের জন্য নাই, যারাই সেই তথ্যটা আপনাদের দেশে, মজুর শ্রেণীকে বুঝাতে চায়, তাদেরই আপনারা কমিউনিস্ট বলে হত্যা করতে চান। দয়া করে মনে রাখবেন ভারতের লোকও একদিন জাগবে, সেদিন ভারতবাসী আপনাদের পেছনে রেখে এগিয়ে যাবে। ভারতের স্ত্রীলোকদের স্বামী ভক্তির কথা উচ্চ নিনাদে বলে আকাশ কাঁপাবেন না। বৃটিশ প্রপাগেণ্ডিস্টদের কাছে থেকে যে সকল সংবাদ পেয়ে ভারত-বাসীকে কখনও দোষী আর কখনও বা নির্দোষ বলে রায় দিচ্ছেন, সেই রায় দেবার পূর্বে নিজের অবস্থাটাও একবার দেখবেন।

নূতন লোক

সন্ধ্যার পর যখন মজুর-ঘরের দিকে ফিরছি তখন জন লোক পেছন দিক থেকে এসে বল্লে, তবে আপনি সত্যিই ভূপর্যটক, আপনার নিজের দেশের ডাক্তারদের কাছে থেকে কিছুটা ি া করে আন্‌লেন না? বৃদ্ধ আমার সংগে ছিলেন। নূতন লোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন, কই কখনও ত আপনাকে দেখিনি? নূতন লো টি আমাদের কাছে এসে বল্লে, আমি যে কাজ করে খাই, আর আপনারা করেন ভিক্ষা। সারাদিন মজুরী করে যা পাই তাতে হোটেলে থাকা চলে না সেজন্য এক শিলিং এর একখানা রুমে থাকি। মিঃ বিশ্বাস, আপনার রুমের কাছেই আমার রুম, আজ রাত্রেই বোধ হয় দেখা হবে। তবে সারাদিন পরিশ্রম করি বলে খেয়েই শুতে হয়। থাক আজকে আর কথা বলে

আমাদের, রবিবারে সকালে কথা বলব। এই কয়টি কথা বলেই নূতন না। টি হন্ হন্ করে চলে গেল। লোকটি চলে যাবার পর মনে হ'ল একে যেন কোথাও দেখেছি। কোথায় লোকটিকে দেখেছি তাই চিন্তা করে পথ চলতে লাগলাম। আনকক্ষণ লোকটির সম্বন্ধে চিন্তা করলাম, তারপর আর পারলাম না। তাকে ভুলে গেলাম। কাজের যখন গাড়ি চলে তখন লোকে অনেক কথাই ভুলে যায়।

রাত দশটার পর মজুরগৃহে আসার পরই শুতে যাবার সময় নূতন লোকটির সংগে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে বল্লেন, আপনার চালচলন দেখে মনে হচ্ছে, বাস্তবিকই আপনি ইউরোপ সম্বন্ধে কিছু জানতে চান। আপনি যে নিয়ম মেনে ভ্রমণ করছেন সে নিয়ম মেনেই ভ্রমণ করতে থাকুন, এতে আপনার বেশ উপকার হবে। এখন আমার যা বক্তব্য শুনুন। শুনেছি আপনি চীনে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার অনেক লোকের সংগে পরিচয় হয়েছে। সেখানে আপনি অনেক কিছুই দেখেছেন। বলুন ত সেখানের চীনা সোভিয়েটের লোকের খাদ্যাভাব আছে কি না? আমি বল্লাম, চীনা সোভিয়েটে খাদ্যাভাব মোটেই নাই। লোকটি আমার কথা শুনে চুপ করে রইল তারপর বল্লে, এ কথাটাই আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম আর কিছুই নয়।

এরপর এই লোকটির সংগে আর দেখা হয়নি। লণ্ডন পৌছবার পর ইষ্টএণ্ডের চার্চ লেনে একটি খাদ্যের দোকানে গিয়ে বসেছিলাম এবং মামুলি খাদ্যের আদেশ দিয়ে টেবিলে বসে কি ভাবছিলাম, এমনি সময় সেই লোকটি আমার কাছে হাসি মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে আমার কাছে বসতে বলেছিলাম। আমি তখন সকল রকমের পলিটিক্স ভুলে শুধু খাদ্যের চিন্তাই করতাম। ইউরোপ হতে ভিক্ষা করে যা এনেছিলাম তা নিঃশেষ হতে চলছিল। এখানে কি করে ভিক্ষা

করা যায় তার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারণ এখানের লোক আমার কাছেও আসত না। সাধারণ লোককে সেজন্য আমি দোষী করতে পারিনা। সাধারণ লোকের সংগে মিশবারও আমি চেষ্টা করতাম না। অনেক দিনের জমা বৃটিশ বিদ্বেষ আমাকে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে দিত না। প্রথম ভাবতাম এরা উচ্চস্তরের লোক অতএব এরা ঘৃণ্য, তারপর যখন দেখলাম তারা আমাদের মত লোকই এবং বৃটেনের সাধারণ লোকের যে অবস্থা ভারতের সাধারণ লোকেরও সেই অবস্থা, তখন সাধারণ লোকের প্রতি ঘৃণা আর হত না। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক অতি দরিদ্র সেজন্যই আমার অর্থাভাব হয়েছিল।

নূতন লোকটি আমার কাছে বসেই বল্লেন, অর্থাভাব হয়েছে বলেই বোধ হয় মুখ শুকিয়ে গেছে? আমি তাঁকে বল্লাম, আপনার ধারণা ঠিক হয়েছে, বলুন ত কি করে এ বিপদ হতে রক্ষা পাই? তিনি বল্লেন, একটিমাত্র উপায় আমি বলতে পারি এবং আমিও সে সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি। সে "উপায়" এবং "সুযোগ" কি তা জানবার জন্য লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি আমাকে বল্লেন, দারিদ্র্যের কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সোভিয়েট রুশিয়ায় দারিদ্র্য বলে কিছুই নেই। স্পেনও তারই জন্যে চেষ্টা করছে, এখন আমাদের কর্ত্তব্য হল যাতে স্পেনেও সোভিয়েট হয় তার জন্যে চেষ্টা কথা অর্থাৎ রিপাবলিকানের হয়ে কাজ করা। তিনি আরও বল্লেন, কি করে স্পেনে যাব সে কথাই ভাবছি, হয়ত স্পেনে যাবার উপায়ও হবে, তখন আমি যাবই। লোকটির কথায় হাঁ, না কিছুই বল্লাম না শুধু চুপ করে খেতে লাগলাম। নূতন লোকটিকেও কিছু খেতে দিলাম। খাওয়া হয়ে গেলে নূতন লোকটি বল্লেন, চলুন আমার সংগে। লণ্ডনের লোক কত গরিব যদি দেখতে চান ত আমার সংগে আসুন। বিনা বাক্য ব্যয়ে রেষ্টোরেণ্ট হতে বের

হয়ে এক পেনী দিয়ে দুটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সিগারেট কিনে একটি তার হাতে দিয়ে অন্যটি নিজে ধরালাম। নূতন লোকটি সিগারেট দেবার জন্য অথবা তাকে খাবার খেতে দেবার জন্য ধন্যবাদ দেননি। ধন্যবাদ দেওয়া ইউরোপের লোকের একটি নিয়ম। এই লোকটির মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখে আমি একটু চিন্তিত হয়েছিলাম। একটু পথ চলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কিছু খেতে দিয়েছি, একটা সিগারেট দিয়েছি কিন্তু আপনার মুখ দিয়ে ত ধন্যবাদ কথাটা বের হল না, তার কারণ কি? তিনি বল্লেন, আমরা হলাম কমরেড, আমাদের নিয়মের দরকার নেই, আমরা সত্বরই স্পেনে গিয়ে কাজে নামব, সে কাজ শক্ত হবে নিশ্চয়ই। তখন হয়ত রীতি নীতি মানতে পারব না, সেজন্য এখনই এসব পরিত্যাগ করতে অভ্যাস করছি।

কতক্ষণ গিয়েই আমরা একটা বাড়ির দোতলায় উঠলাম এবং একটি রুমের দরজায় টোকা দিলাম। ভেতর থেকে একটি লোক বল্ল, কে? বার থেকে সাথী বল্লে, টোয়েন্টি টু। অমনি দরজা খুলে দিল। রুমের ভেতর প্রবেশ করে দেখি স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে তাদের কাপড় হতে সাদা উকুন মারছে আর পাশে বসে তাদের ছোট্ট ছেলেটি এক শ্লাইজ রুটি কামড়াচ্ছে। আমাকে দেখে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যেন লজ্জিত হয়ে গেলেন। আমি বল্লাম, আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আমাদের দেশেও আমরা ছারপোকা এমনি করেই হত্যা করি। দরিদ্র স্বামীস্ত্রী আমাকে ছোট্ট একখানা চেয়ারে বসতে দিয়ে একটু চায়ের বন্দোবস্ত করবার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উভয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম, আমাদের দেশে অনেক পরিবার উপবাস করছে, তাদের মাথা রাখবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। স্ত্রীলোকটি ধৈর্য্য রাখতে পারেননি, চোখের জল মুছে বল্লেন, আমাদের এই রুমখানাও পরিত্যাগ করতে হবে। গত দু'সপ্তাহ

ধরে ভাড়া বাকি রয়েছে। আমিও আর ধৈর্য্য রাখতে পারলাম না, পকেট থেকে কিছু বের করে মহিলাটির হাতে দিয়ে বল্লাম, বিকালে আসব, এখন যাই। এই বলেই সাথীর হাত ধরে ঘরের বাইরে চলে আসলাম।

কতক্ষণ হেঁটে আমরা একটা বসবার স্থানে এসে সাথীকে বল্লাম, আমি আপনার সংগে ইংলেণ্ডের অনেকস্থানই দেখব, তবে একটি কথা বলে দিচ্ছি, আমি কমিউনিজম বুঝি কিন্তু কমিউনিস্ট নই। আমি একজন পর্যটক মাত্র। আমি স্পেনে যাব না ভারতে ফিরে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা দেশবাসীকে জানানোই হবে সবচেয়ে বড় কাজ। আমার কথা শুনে লোকটি স্তম্ভিত হ'ল, তারপর বল্ল, আপনি যাই করুন না কেন আমি আপনাকে অন্তত লণ্ডন শহরটি দেখাতে চেষ্টা করব। নূতন লোকটির নাম শুধু "বাইশ" ই জেনেছিলাম এবং তার সংগে আটদিন লণ্ডন শহরে বেড়িয়েছিলাম। যখন লণ্ডন শহরের ভ্রমণ কথা বলি তখন মিঃ বাইশের ভ্রমণ কথা বলব।

অষ্ট্রো-ইণ্ডিয়ান ক্লাব। সকাল বেলা চলেছি একাকী গলি পথ ধরে। পথে দেখা হ'ল একটি ভারতীয় ছাত্রের সংগে। ছাত্র মহাশয় বনতত্ত্ব (**Forestry**) শিক্ষার্থে জার্মানী গিয়েছিলেন। ভিয়েনা দেখবার জন্য এসেছেন। ছাত্রের শরীর ছাত্রেই মতই। রুক্ষ শরীরের উপর গতায়মান যৌবনের ছাপ কিছুটা রয়েছে মাত্র। ছাত্রের কাছে আমার পরিচয় দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার অষ্ট্রো-ইণ্ডিয়ান ক্লাবে কি করা হয়? ছাত্র সোজা কথায় বুঝিয়ে দিলেন, ভারতের বদনাম প্রচারার্থে বৃটিশ সরকার দুহাতে টাকা খরচ করছে। মিঃ অগ্নিহোত্রী নামক এক ভদ্রলোক সে টাকার সদ্ব্যবহার করছেন। আপনি সেখানে যান এবং দু একটা এমন বিবৃতি দেন যাতে করে অষ্ট্রিয়ার লোক জানতে পারে

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা অনবরত চলছে। বৃটিশ যদি ভারতে না থাকে তবে মানুষ বাঁচতে পারবে না। ছাত্রের মেজাজ পঞ্চমে উঠেছিল সেজন্য আর কথা বাড়ালাম না। তাড়াতাড়ি করে ক্লাবের দিকে রওয়ানা হলাম।

ক্লাবের প্রকাণ্ড দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে অগ্নিহোত্রী বের হলেন। ঘরে গিয়ে আমার পরিচয় দিলাম এবং আমার একখানা ভিক্ষাপত্রও দিলাম। ভিক্ষাপত্রখানা পড়েই অগ্নিহোত্রী বুঝলেন একজন থার্ডক্লাস লোক। আমার দ্বারা তাঁর কোনও কাজ হবেনা। পথের ফকির দিয়েও যে রাজনৈতিক কার্য উদ্ধার হয় তা অগ্নিহোত্রীর জানা ছিলনা। এখন যদি তিনি ভিয়েনায় থাকতেন তবে বুঝতে পারতেন ফকির দিয়ে কত বড় বড় কাজ করান হয়। প্রপাগেণ্ডিস্ট হওয়া বড়ই কঠিন কাজ। অগ্নিহোত্রীকে ভিক্ষাপত্র দেবার নানা কারণ ছিল। আমার তখন অনেক টাকার দরবার থাকায়, হয়ত টাকার লোভ দেখিয়ে যদি আমাকে দলে টানার চেষ্টা করতেন তবে হয়ত আমি সে লোভ সম্বরণ করতে পারিতাম না। যাতে করে আমাকে মোটা টাকার লোভ দেখান না হয় সেজন্যই ভিক্ষাপত্র আগেভাগে দিতে হয়েছিল। আগ্নিহোত্রী আমার আসার কারণ ভিক্ষাপত্র পড়েই বুঝতে পেয়েছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁর ক্লাবের কথা বিশদ ভাবে বলতে চাননি। আমি কিন্তু তাঁর কাছে ভিক্ষা করতে যাইনি। দেখতে গিয়েছিলাম বিদেশে ভারতবাসী স্বদেশের বিরুদ্ধে কি করে প্রচারকার্য্য চালায়। অগ্নিহোত্রীর রক্ষিত অনেকগুলি ভারতীয় সংবাদপত্রও দেখতে পেয়েছিলাম, সেই সংবাদপত্র ভারতে ছাপা হয়েছে বলে মনে হল না। ভারতের প্রায় সকল সংবাদপত্রই আমি দেখেছি। আমার পরিচিত একখানা সংবাদপত্রও সেখানে দেখতে পাইনি। মিঃ অগ্নিহোত্রীর দ্বারা রক্ষিত সংবাদ পত্রগুলির

বিষয়বস্তুও অন্য রকমের। কোথায় কোনদিন হিন্দু-মুসলমানের লড়াই হয়েছে, কোথায় কোন্ স্ত্রীলোক স্বামীর সংগে ঝগড়া করে জলে ডুবে মরেছে, কোন্ প্রদেশে কত ভ্রূণ হত্যা হয়েছে, কোন্ প্রদেশের কোন্ আশি বৎসরের বৃদ্ধ আট বৎসরের মেয়েকে বিয়ে করেছে, এরূপ সংবাদেই সংবাদপত্রগুলি পূর্ণ ছিল। লণ্ডনের "দি ওয়ার্ল্ড" পত্রিকাতে বৃটেনবাসীর শুধু যে কুৎসা ছাপানো হয় তা নয়, সম্পাদকীয় কলমে অনেক ভাল বিষয়ও থাকে, কিন্তু এখানের সংবাদপত্রগুলিতে সেরূপ কিছুই ছিলনা। কতক্ষণ পর বেশ ভাল করেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম, এই সংবাদপত্রগুলি ভারতের বাইরে অথবা ভারতের এমন কোথাও ছাপানো হয়েছিল যার সংগে ভারতের লোকের কোনও সম্বন্ধ ছিলনা। মিঃ অগ্নিহোত্রী সংবাদপত্র সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষেপে দিয়েছিলাম। তিনি আমার উত্তর শুনে সে সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করেন নি। এর পরও অনেক দিনই মিঃ অগ্নিহোত্রীর সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি কিন্তু আমার সংগে আর কথা বলেননি, আমিও তার সংগে কথা না বলে সুখী হয়েছিলাম। বিদেশে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, যে সকল ভারতবাসী বিদেশে গিয়ে বিদেশীর গোলামী করে তারা সাপের চেয়েও ভয়াবহ। যে সকল বৃটিশ আমাদের দেশে থেকে আমাদের সংগে অসৎ ব্যবহার করে তারা ঐ বিদেশে থেকে যে সকল ভারতবাসী বৃটিশের গোলামী করে, এদের চেয়ে অসংখ্যগুণে ভাল।

যখন আমি সংবাদপত্রগুলি দেখছিলাম তখন দুজন অষ্ট্রিয়ান ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন এবং কোন বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমাকে নিয়েই যে কথা হচ্ছিল তাতে আর সন্দেহ ছিলনা। ওদের কথা হয়ে গেলে একজন অষ্ট্রিয়ান আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,

সংবাদপত্রগুলি কেমন লাগছে ? লোকটির কথার জবাব না দিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে পড়লাম এবং পথে এসে ভাবলাম জবাব না দিয়ে ভালই করেছি, আর এরূপ স্থানে যাব না।

ভিয়েনাতে নানারূপ মিউজিয়ম আছে। এই মিউজিয়মগুলিতে নানারূপ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নানা দেশ হতে লোক এসে এখানে নানারূপ বিদ্যাচর্চ্চা করে থাকে। পূর্বদেশীয় লোক এখানে খুব কমই আসে কারণ মিউজিয়ম হিসাবে ভিয়েনার নাম পূর্বদেশগুলিতে এখনও তেমন সুনাম অর্জন করেনি। পশ্চিম দেশগুলি হতে প্রচুর লোক এখানে আসে এবং নানারূপ বিদ্যা অর্জন করে। সেরূপ বিদ্যা অর্জনকারীদের একজনের সংগে দৈবাৎ দেখা হয়। আমি যে মজুরগৃহে থাকতাম তিনিও সেই মজুর গৃহেই বাস করতেন। অনেক মজুরের খরদৃষ্টি তাঁর প্রতি ছিল। একদিন একজন অপরিচিত মজুর এসে আমার হাত ধরে আর একটি অপরিচিত লোকের কাছে নিয়ে বসাল এবং তাঁকে বল্ল, দেখাও ত তোমার আঁকা ছবিগুলি। আর্টিস্ট মহাবিপদে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর কয়খানা ছবি বের করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, পরন্তু মেরা ইস্‌মে কই কসুর নেই হে, মাইনে বাঙ্গাল মে গিয়াথা আর যো কুছ্ বিচিত্র মালুম হুয়াথা সবই মইনে অঙ্কন কিয়াথা। আর্টিস্ট মহাশয়ের কথা শুনেও অনেক কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। শুনেও ছিলাম। যা শুনেছিলাম তা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সময়মতো বের করবার চেষ্টা করব। এখন ছবিগুলির কথাই দেশবাসীর কাছে বলছি। আমি যখন মন দিয়ে ছবিগুলি দেখছিলাম তখন অপরিচিত প্রথম লোকটি বাইরে গিয়ে আর একজন অপরিচিত লোককে নিয়ে এসেছিল। সুখের বিষয় সেই লোকটি ইংলিশ বলতে পারত। সে এসেই বল্ল, এই ছবিগুলি দেখে মুর্খলোকই নানারূপ মন্তব্য করবে। জেনে রাখুন, যে দেশে আর্থিক

উন্নতি অল্প হয়েছে সেই দেশেই এরূপ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। আপনি যে আর্টিষ্টের কাছে বসে আছেন সে হ'ল দচ্ এবং সাম্রাজ্যবাদী। আপনি তার অঙ্কিত চিত্র দেখে দুঃখিত হবেন না। শুনেছি আপনি পর্যটক। রাষ্ট্রনীতিতে আপনার তত অভিজ্ঞতা নেই। আপনি যদি হলাণ্ডে এই লোকটা যে গ্রামে বাস করে সেই গ্রামে গিয়ে দশটি গিল্ডার মাত্র (বাইশ টাকার সমান) যে কোনও স্ত্রীলোককে দিয়ে কোনও অসৎ কাজের প্রস্তাব করেন তবে যে কোনও রমণী রাজি হবে। আমার হাতের চিত্রখানা দেখিয়ে বললাম, এই নির্বোধ স্ত্রীলোকটিকে যদি লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তবে সে কোনও কুকর্ম করিতে রাজি হবে না।

ছবিখানাতে দেখানো হয়েছিল একটি ডোবার ধারে একটি পুরুষ মলমূত্র ত্যাগ করছে। তারই পাশে আর একটি পথ। সে পথ দিয়ে কতকগুলি মোষ ডোবায় এসে নামছে। মোষগুলির মধ্যে কোনটা জলে ডুবে নাক ভাসিয়ে আছে, আর কোনটা কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। অপর তীরে একটি স্ত্রীলোক তার ছোট্ট সন্তানটিকে তীরে বসিয়ে জলে নেমে এক হাত দিয়ে কলসিতে জল ভরছে আর অপর হাত দিয়ে নীচের দিকের কাপড় খানা তুলে প্রস্রাব করছে। যদিও চিত্রখানা নিখুঁত এবং নির্লজ্জতায় পূর্ণ তবুও তাতে সত্যের ছবি ফুটে উঠেছিল। এরূপ দৃশ্য আমিও অনেক দেখেছি। চিত্র অঙ্কনকারীর দিকে চেয়ে বল্লাম, ভারতে গিয়ে কি এর চেয়ে ভাল কিছু দেখতে পাননি? আপনারা শিক্ষার গর্ব করেন, এই কি আপনাদের শিক্ষার দান। আপনাদের দেশে গিয়ে কখনও মেয়েলোক খুঁজব না এটা খুবই সত্য কথা, কিন্তু এটাও ভাল করে জানি আপনাদের দেশে এর চেয়েও বিভৎস দৃশ্য দেখতে পাব কারণ আপনাদের দেশ নির্যাতীত। হলাণ্ডে পৌঁছানোর পর পুঁজিবাদীদের নির্যাতনের নিদর্শন আমি অনেকই দেখিছিলাম, কিন্তু

সে কুকথা কুবার্তা আমার ভ্রমণ কথায় স্থান পাইবে না। কুকথা কুবার্তা লেখার জন্য আমি ভ্রমণ করতে বের হইনি।

হলাণ্ডবাসী চিত্র অঙ্কনকারীর মুখ সাদা হয়েছিল। সে উঠে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য লোক তাকে জোর করে বসিয়ে নানা মতে উপদেশ দিল। কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা জেনে শুনেও অন্যায় করে। এরূপ লোকের মতের অথবা চরিত্রের পরিবর্তন হয় না। এদের হত্যা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। আমেরিকার মিঃ হুভারকে কেহ কেহ মার্কস এর "ক্যাপিটাল" বুঝাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লোকটার মাথায় তত বুদ্ধি না থাকায় বুঝানো শক্ত হয়েছিল। সেজন্য হুভারকে হত্যা করা হলে না। কিন্তু যে সকল লোক আর্থিক জগতের কথা জেনে শুনেও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় তাদের হত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। সেরূপ লোকের নিধন অনেক হয়েছে শুনেছি। ভবিষ্যতে হয়ত আরও শুনব।

আমি যেদিন আমষ্টারডম্ পৌঁছি সেদিন ছিল রবিবার। ছাত্রেরা ছিল বাইরে। আমাকে দেখতে পেয়ে অনেক ছাত্র কথা বলতে এসেছিল। একটি ছাত্রের সাহায্যে আমি এমন একটি হোটেলে পৌঁছি যেখানে লোক স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারত। যেখানে লোক স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারে সেখানে ইংলিশ জানা লোকের অভাব হয় না। একজন ইংলিশ জানা লোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলাম, হলাণ্ডে যেমন অপকর্ম চলে ফ্রান্সে তার চেয়েও কম হয়। সেরূপ দু একটা ঘটনা স্বচক্ষে দেখে ধাঁধাঁ ভেঙ্গে গিয়েছিল।

প্রাগের পথে

ভিয়েনাতে দেখা এবং শোনার মত আমার আর কিছুই ছিল না। সেজন্য ভিয়েনায় কালবিলম্ব না করে প্রাগের পথে রওয়ানা হই। তাড়াতাড়ি করে রওয়ানা হবার একটি কারণও ছিল। সামনেই শীত আসছে। শীতের সময় সাইকেল কেন, অনেক সময় মোটর কারে চলাও পশ্চিম ইউরোপে সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয়, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ যদি পৃথিবী ব্যাপিয়া আর একটা যুদ্ধ হয় তবে পালাবারও পথ পাব না। এই ভেবেই বিশেষ কিছু চিন্তা না করে পথ ধরলাম। পথ দেখিয়ে দেবার লোক পাইনি বলে আপন মনে সাইকেল চালিয়ে শহরের বাহিরে এসে দেখলাম আমি ঠিক পথেই এসেছি। আজই আমি ষ্টকারু (St ckerau) পৌঁছতে পারব। সুন্দর পথে চলতেও বেশ আরাম লাগছিল। এদিকে জার্মাণ পর্যটকের সংখ্যা খুবই বেশি। দলে দলে লোক চলেছে কিন্তু তাতেও শৃঙ্খলা ছিল।

ইউরোপের প্রায় যায়গাতেই জার্মাণ পর্যটক দে আমি একটু চিন্তিত হয়েছিলাম। ভাবছিলাম এতগুলি পর্যটক স্থানে কিলবিল করে সেখানে কি আমি ভিক্ষা পাব? কিন্তু যত জার্মাণীর দিকে এগিয়ে চলেছিলাম ততই বুঝতে পারছিলাম জার্মাণ পর্যটকদের বড় কেউ পর্যটক বলে গণ্য করে না। জার্মাণ পর্যটকদের অন্য কিছু ভাবে। লোকেরমনের ভেতর প্রবেশ করা চলে না, উপরে উপরেই ধারণাটা পোষণ করে যাচ্ছিলাম।

কতক্ষণ যাবার পরই একটী গ্রাম পেলাম। গ্রামের ভেতরে দিয়েই পথটা চলে গিয়েছে। পথের পাশেই একখানা দুচালা ঘরের

ভেতরে অনেকগুলি লোক কাফি খাচ্ছে দেখে সাইকেল হতে নামলাম এবং সাইকেলখানা ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলাম। ঘরের ভেতরে গিয়ে আমিও একখানা চেয়ার দখল করে কাফি দেবার আদেশ দিলাম। বয় এক কাপ কাফি এনে দিল। আমি মন দিয়েই কাফি খাচ্ছিলাম। কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছিল না কারণ আমার পোষাকে তেমন কিছু বৈচিত্র্য ছিল না। সকলেই হয়ত ভাবছিল একটা জিপসি ছিটকে এসে এদিকে পড়েছে। হঠাৎ একটি লোকের মাথায় নানা রকমের মেডেল পূর্ণ একটা টুপি দেখে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম এই মেডেলগুলির মানে কি ? সে আমার পিজিয়ন্ ইংলিশ এবং সামান্য এস্পেরেন্ত বুঝল এবং বল্ল, সে একজন ভূপর্যটক এবং সে যে সকল দেশে গিয়েছে সেই দেশগুলি হতে এই মেডেলগুলি পেয়েছে। আমি তাকে বল্লাম, এসব মেডেল দিয়ে কি হবে, বই লেখার উপকরণ যোগাড় করাই হল আপনার সর্বপ্রথম দরকার। আমার কথা শুনে সে কি ভাবছিল জানিনা, তবে যারা তার কাছে বসছিল তারাই আমার পরিচয় চাইছিল। আমি তাদের প্রত্যেককে একখানা করে আমার পরিচয় পত্র দিয়েছিলাম। আমার পরিচয় পত্র পড়ে অনেকেই খ হয়ে গিয়েছিল এবং বাইরে এসে আমার সাইকেলখানাও দেখছিল। সাইকেলখানা দেখবার পর আমরা পুনরায় যখন ঘরে প্রবেশ করছিলাম তখন যে লোকটির টুপির উপর অনেকগুলি মেডেল ছিল তাকে অনেকেই হাস্যাস্পদ করে তুলছিল। এই গ্রামেই আর একটা মামুলী কারণে দশ পনর মিনিট কাটিয়ে এগিয়ে চলছিলাম।

ভিয়েনা হতে স্টকারু পর্যন্ত পথটুকুতে চলতে বড়ই আরাম পেয়েছিলাম কারণ তাতে উচুনীচু খুব কমই ছিল। দ্বিতীয়ত পথটাতে এমন সুন্দর করে পিচ দেওয়া হয়েছিল যে সাইকেলখানা যেন আপনি চলছিল।

স্টকারু যাবার বড় পথটার সংগে একটা ছোট পথ মিলেছিল। সেই পথটার এক পাশে একটি খুঁটির উপর একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি দেখে দাঁড়ালাম। আমাদের দেশে পৌত্তলিকতাকে অনেকে ঘৃণা করে, কিন্তু এদিকে যীশু মূর্তিকে কেউ পৌত্তলিকতার ছাপ দেয় না। আমি মূর্তিটি দেখে বেশ আরাম পেয়েছিলাম কারণ তাতে কারুকার্যের বেশ প্রস্ফুটন হয়েছিল। স্টকারুতে যাবার পর কয়েকজন ভদ্রলোকের সংগে যীশু মূর্তির সম্বন্ধে কথা হয়। তারা বলেছিলেন এ অঞ্চলে ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশি, সেজন্যই এসব মূর্তি বেশি দেখা যায়।

স্টকারুতে পৌছবার কয়েক মাইল আগে থেকেই কতকগুলি লোক আমার পেছন নেয়। তারা শুধু আমাকে দেখার জন্যই যে পেছন নিয়েছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না শহরে পৌছাবার পর পথে অনেক লোক জমা হয়েছিল। অত লোক সংগে নিয়ে চলা আমার ভাল লাগছিল না। পথে একটি পুলিশের সংগেও দেখা হচ্ছিল না। অবশেষে যখন শহরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌছলাম তখন একটি পুলিশ দেখতে পেয়ে তার স্মরণাপন্ন হলাম। সে আমাকে একটি হোটেলে নিয়ে গেল এবং একখানা রুমও ভাড়া করে দিল। এদিকের হোটেলগুলি ভিয়েনা অথবা বলকানের মত নয়। দেখলেই মনে হয় যে কতকগুলি চোর অথবা ডাকাতের আড্ডা। নিশ্চিন্ত মনেই সেরূপ হোটেলে প্রবেশ করেছিলাম কারণ পুলিশ আমার সংগে ছিল। দোতালাতে আমাকে একখানা রুম দেওয়া হয়েছিল। রুমখানা দেখতে মোটেই সুন্দর নয়, তবে রুমটি এতই পরিস্কার যে আমার ভয় হচ্ছিল যদি চেয়ারে বসি তবে হয়ত চেয়ারে দাগ পড়বে। বিছানাও সেইরূপ—পালকের লেপ, আর নীচের তোষকখানা দেখে আরও হয়রান হয়েছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল বিকাল বেলা শহরটা একবার দেখে আসি কিন্তু ম্যানেজার এসে বল্লেন,

কয়েকজন লোক আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে চান। তাদের আসতে সম্মতি জানিয়ে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে থাকলাম। কতক্ষণ পর আগন্তুক ভদ্রলোকগণ এসে রুমে বসলেন। সর্বপ্রথম আমরা মামুলী কথা নিয়েই অনেক সময় কাটালাম, তারপর ধীরে ধীরে আসল পলিটিক্সে আসা গেল। সুখের বিষয় তখনও অষ্ট্রিয়ায় নাৎসী-ইজম এসে প্রবেশ করেনি সেজন্য মন খুলে সকলেই কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন লোক বেশ গলা কাটিয়ে বল্লেন, যদি আপনি জার্মাণীতে যান তবে হিটলারকে বলবেন নাৎসী-ইজমের স্থান অষ্ট্রিয়ায় হবে না। ভদ্রলোকের কথাটির জবাব আমি দেইনি কারণ এই রকমের একটি ঘটনা আমার চীনে থাকার সময় ঘটেছিল, তখন চীন ছিল টলটলায়-মান। কতকগুলি চীনা যুবক আমার অটোগ্রাফ খাতায় লিখে দিয়েছিল, জাপানীরা যদি চীনের অন্তস্তলে প্রবেশ করে তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। জাপান চীনের ভেতর প্রবেশ করতে পেরেছিল। ঠিক সেরূপ হুমকী শুনে আমি শুধু মনে মনেই হাসছিলাম। দ্বিতীয় কথা ছিল, অষ্ট্রিয়া নামেতে স্বাধীন ছিল, আসলে অষ্ট্রিয়া বৃটিশ এবং ফরাসীদের তাঁবেদারীই করত। যারাই তাঁবেদার তারাই বেশি কথা বলে এবং বেশ অহংকার দেখায়। এদের কথার সংগে সংগে আমি যা বুঝছিলাম তার সারমর্ম ছিল এই যে হিটলার এবং মুসলিনী বৃটিশ ও ফরাসীদের কলোনিগুলিতে ভাগ বসাতে চান। বৃটিশ এবং ফরাসী তা সহ্য করবে না এবং লড়াই করতে বাধ্য হবে। আমার মন্তব্য শুনে সকলেই সুখী হয়েছিল। সোভিয়েট রুশ সম্বন্ধে কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করেনি কারণ যারা এসেছিল তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। যে পর্যান্ত ঈপ্সিত বিষয় কার্যে পরিণত না হয় সে পর্যন্ত কার্যপদ্ধতি গোপন রাখাই উচিত। আমাদের দেশের লোক অহিংসায় বিশ্বাসী। ইউরোপের লোক মনে

করে অহিংসা বলে কোনও চিন্তাই মানব সমাজে নাই। কিছু পেতে হলেই হিংসা নয় হত্যার দরকার। হিংসা হ'ল প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর হল হত্যা। অষ্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে ছিল বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের চালবাজী। আর বাইরে ছিল নাজিইজম্ যাকে ইম্পিরিয়েলিজমের উগ্র সংস্করণ বলা হয়। এই উভয় শত্রুর মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকে মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে সক্ষম হত না।

স্টকারু বড় শহর নয় সেজন্য পরের দিনই সকাল বেলা রওয়ানা হই এবং একটি ছোট্ট গ্রামে এসে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক বৃদ্ধার দর্শন পাই। বৃদ্ধা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যেমন ঘৃণা করতেন তেমনি হিটলারপন্থীদের ঘৃণা করতেন। শুধু তাই নয় তিনি জার্ম্মাণীর কমিউনিষ্টদের কাপুরুষ এবং বাক্যবাগীশ উপাধি দিয়েছিলেন। বৃদ্ধার সংগে একটি রেস্টোরেণ্টে দেখা হয়। বৃদ্ধা আমাকে বিদেশী জেনেই ইংলিশে কথা বলতে আরম্ভ করেন। আমিও তাঁর কথা শুনে সুখী হই। আমি যখন বিদায় নিতে যাচ্ছি তখন বৃদ্ধা আমাকে বল্লেন, চলুন আমার ঘরে। আমি তাঁর বাড়ীতে গেলাম এবং দেখতে পেলাম বৃদ্ধার ছেলে এবং ছেলেদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে একটা পাড়া গড়ে উঠেছে। বৃদ্ধার সংগে আমাকে দেখা মাত্র লোক জড় হতে লাগল। বৃদ্ধা আমাকে আগন্তুকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি রুম দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, এখানে বিশ্রাম করুন, আমি কারো মারফতে কতকগুলি এমেরিকান সংবাদপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটি যুবতী কতকগুলি এমেরিকান সংবাদপত্র, কতকগুলি সিগারেট এবং এক পেয়ালা কাফি আমার সামনে রেখে চলে গেল। ঘরেতেই জলের পাইপ ছিল। রুম হতে বের হয়ে পাইপে হাতমুখ ধুতে বের হচ্ছি এমন সময় যুবতীটি এক বেসিন জল এনে স্ট্যাণ্ডে রেখে দিয়ে চলে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম, এদিকের যুবতীদের সংগে আমাদের

দেশের যুবতীদের কোনরূপ পার্থক্য নেই। মুখে সকল সময়ই লজ্জার ভাব। মুখ সকল সময়েই নত। অথচ সকল সময়েই সকল বিষয় জানবার আগ্রহ। আমরা বলে থাকি, ইউরোপে কোর্টসিপ করে বিয়ে হয়। কোর্টসিপ করতে হলে সাহসের দরকার। সকল যুবতীর সে সাহস থাকে না। যাদের সে সাহস থাকে না, মনে করতে হবে তারা অন্য রকমের আচার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে বর্দ্ধিত হয়েছে। এই যুবতীটিকে দেখেও আমার তাই মনে হল। বিকাল বেলা যখন বৃদ্ধা আমার রুমে আসলেন, আমি সর্বপ্রথমই যুবতীর পরিচয় চাইলাম এবং বৃদ্ধা কিছু বলবার পূর্বেই বল্লাম, হয়ত এই যুবতী কঠোর শাসনের মধ্য দিয়ে বর্দ্ধিত হয়েছে। বৃদ্ধা আমার কথা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, এবং বল্লেন, এই যুবতীর মা ছোট বেলাতেই মারা যান। সে জন্য তাকে অনেক দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে বড় হতে হয়েছে। যাদের দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ হতে হয় তাদেরই মুখ নত থাকে, তাদের মুখের সংগে আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সাদৃশ্য আছে। লজ্জাশীলতা উভয়ের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। কর্তব্যনিষ্ঠাও উভয়ের মধ্যেই প্রবল। বুঝতে পারলাম আমাদের দেশে যে সকল মেয়ে ধনীর ঘরে জন্মে, তারা যখন বোঝে তাদের ভবিষ্যৎ তাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে তখন তাদের হাসি লোপ পায়, অন্তর শুকিয়ে যায়, আপনি মাথা নত হয়ে আসে।

বিকাল বেলা টিফিন খাবার পর আমরা স্থানীয় বড় এক রেস্তোরাঁয় যাই। রেস্তোরাঁটি দেখতে বড়ই সুন্দর। রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমরা একটি টেবিল দখল করে নানা দেশের কথা বলছিলাম। কতক্ষণ পর শীতের প্রকোপে মাথায় ঠাণ্ডা লাগে এবং ক্রমাগত হাচি বের হতে থাকে। বৃদ্ধাই আমাকে টুপি মাথায় দিয়ে বসতে বল্লেন। যদি তিনি কথাটি না বলতেন তবে ঘরে বসে আমি কখনও সোলা হ্যাট মাথায় দিয়ে

বসতাম না। সোলা হ্যাট মাথায় দিয়ে এক পেয়ালা গরম কাফিতে যখন মুখ দিলাম তখন অন্য আর একজন আমাদের টেবিলে এসে বসল। ইচ্ছা করলে লোকটা অন্য টেবিলে গিয়েও বসতে পারত। চেয়ারে বসেই তার ঠ্যাংখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। এরূপ করে ঠ্যাং বাড়িয়ে দেওয়া সভ্যতা বিরুদ্ধ। আমি এতে লোকটাকে কিছুই বল্লাম না। নিজের ঠ্যাংই আরও সংযত করে রাখলাম। তারপর লোকটা আরও কাছে এসে আমার ডান পায়ের উপর এমন করে চাপ দিতে থাকে যে অন্য লোক হলে নিশ্চয়ই চিৎকার করত। বোধহয় মিনিট খানেক লোকটার আচরণ নিয়ে চিন্তা করলাম তারপর ভাবলাম এরূপ অন্যায় নীরবে সহ্য করা ভাল হবে না। তাই চেয়ার হতে উঠেই লোকটার গালে "বাঙ্গালী চড়" বসিয়ে দিলাম এবং আরও একটা দিলাম। লোকটা ভাবতে পারেনি আমি তাকে এত তাড়াতাড়ি চড় মারব। ইউরোপের কেউ কাউকে চড় মারে না, তারা ঘুসি মারে। আমার চড় খেয়ে ভদ্রলোকের চমক লেগেছিল এবং সে উঠে আমার নাক লক্ষ্য করে ঘুসি মারে। ঘুসিটা আমার টুপিতে লাগে এবং টুপিটা মাথা হতে পড়ে যায়। এদিকে বৃদ্ধা আমার পরিচয় চিৎকার করে বলতে থাকেন। অন্যান্য যারা বসেছিল তারা উঠে এসে আমাদের মাঝে পড়ল এবং আমরা পৃথক হয়ে গেলাম। লোকটা হাত উঠিয়ে অপরাধ স্বীকার করল এবং বল্ল, যদি আমি জানতাম পর্যটক ভারতবাসী তবে আমি এমন কাজ করতাম না। সে ছিল ইটালিয়ান এবং আমাকে সে আবিসিনিয়ার অধিবাসী ভেবে নানারূপ গালও দিয়েছিল। তখন আবিসিনিয়া ইটালিয়ানদের অধিকারে আসতে চলেছিল এবং আবিসিনিয়ানদের সভ্য করার অধিকার ইটালিয়ানদের ছিল। মারামারি করার পর ইটালিয়ান লোকটি আমাকে এবং বৃদ্ধাকে নিয়ে গিয়ে তার টেবিলে

বসিয়ে কাফি এবং নানারূপ পিষ্টক খাওয়ালে এবং আমাকে ইতালীতে যেতে নিষেধ করলে। সে বলেছিল, ইটালীতে যাবার পর হয়ত ভুল করে কেউ আমাকে হত্যা করবে। ভারতবাসী তাতে প্রতিবাদ করবে। বৃটিশ কন্‌সাল হয়ত আপনার মৃত্যুর জন্য খেসারত চাইবে। খেসারত হয়ত পাওয়াও যাবে কিন্তু আপনি ত জীবন ফিরে পাবেন না। ইটালীয়ান্ লোকটির কথার প্রমাণ পরের দিনই পেয়েছিলাম। দুটি ফাশিষ্ট যুবক পরের দিন আমি যে পথে চলছিলাম সে পথে চলছিল এবং আমাকে দেখতে পেয়ে পথে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদের কাছে যাবা মাত্র যুবকদ্বয় আমার পরিচয় চায় এবং আমিও তাদের কাছে আমার পরিচয় পত্র দেই। উভয় যুবকই আমার পরিচয় পেয়ে কেঁপে উঠেছিল। তারা মাটিতে বসে অনেকক্ষণ হাঁপিয়েছিল। তারপর আমাকে বলেছিল, আজ আমরা যে অন্যায় কর্ম করতে এসেছিলাম সে অন্যায় কাজ হতে রক্ষা পেয়েছি, ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন। বুঝতে পারছিলাম তারা কি অন্যায় কাজ করত। আমি কোন কথা না বলেই যখন এগিয়ে যেতে চাইলাম তখন উভয় ইটালীয়ান আমাকে বল্ল, মঁসিয়ে স্টপ, উই গো এহেড এণ্ড টেল হিন্দু টোর দু ... কামিং। মহাশয় দাঁড়ান, এখন রওনা হবেন না। আমরা আগে গিয়ে লোকজনকে সাবধান করব এই বলে যে একজন হিন্দু পর্যটক আসছেন। তারা আমাকে বসিয়ে রেখেই চলে গেল। এদের চলে যাবার এক ঘণ্টা পরে আমি পথ ধরেছিলাম এবং যখন শহরে পৌঁছি তখন অনেক ইটালিয়ান্ যুবককে দেখতে পেয়েছিলাম। তারা আমার কোনও অনিষ্ট করেনি বরং অনেকেই আমার হয়ে ভিক্ষা করেছিল এবং যা পেয়েছিল সবাই আমাকে গুনে দিয়ে তাদের সততার পরিচয় দিয়েছিল।

ছোট গ্রাম হতে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম হোল বার্ণ। হোল বার্ণ

(Hollabrunn) সহরটি যদিও ছোট্ট তবুও শহরটির বিশেষত্ব আছে। এখান হতে রওয়ানা হবার পরই আসে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত। এদিকে সীমান্তে হট্টগোল লেগেই আছে। জার্মান পর্যটকগণ এদিকে যাওয়া আসা করে। জার্মান পর্যটকদের অষ্ট্রিয়ান সরকার যেমন ভয় করে চেকরাও তেমনি ভয় করে। কিন্তু জার্মানরা বীর প্রকৃতির লোক। তারা কাউকে ভয় না করে তাদের গন্তব্যস্থানে যাওয়া আসা করে। তাদের এই বীরভাবকেই সকলে ভয় করত। ছোট্ট শহরটিতে জার্মান পর্যটকদের সংখ্যাই বেশি। বিকালবেলা যখন জার্মান যুবক যুবতীর দল ভিক্ষা পত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষার্থে বের হল তখন অষ্ট্রিয়ান্দের যেন বুক ফাটতে লাগল। অনেকেই অনিচ্ছায় জার্মান পর্যটকদের দান করতে লাগল। এদিকের লোক বড়ই গরীব। তারা অষ্ট্রিয়া সরকারের নির্দ্ধারিত টেক্স দিয়েই রাণ হয়ে পড়ছিল, অন্যদিকে শিক্ষিত ভিখিরী দরজায় দাঁড়ি আছে। যদি ভিক্ষা না দেয় তবে এরাই এক দিন প্রতিশোধ নেবে, সেদিন ত বৃটিশ অথবা ফ্রেঞ্চরা এসে এদের প্রাণ রক্ষা করবে না, তাই হাসিমুখে তাদের ভিক্ষা দিতে হচ্ছিল। শুধু মুখের হাসি দেখে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছিল সেজন্য আমি বাইরে বেশিক্ষণ বেড়ালাম না। রাত কাটিয়ে পরের দিন অতি প্রত্যুষে চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত যখন পার হচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম একদল জার্মান পর্যটক চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে যাচ্ছে। জার্মান পর্যটকদের সংগে বার তের বৎসরের ছেলেমেয়েও ছিল। অষ্ট্রিয়ান্ সীমান্ত গার্ড তাদের অপেক্ষা করতে বলছিল এবং কাছে গিয়ে রুক্ষস্বরে নানা কথা বলে বিদায় করে দিয়েছিল। সীমান্ত রক্ষীর রুক্ষ কথায় ছেলে মেয়েরা দুঃখিত হয়েছিল এবং তাদের গোলাপী গণ্ডদেশে বিষাদের কালিমা

পড়েছিল। জার্মানরা মানুষ এবং ভয়ানক ভা । এরা যখন দেশে গিয়ে অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত রক্ষীর অসৎ ব্যবহা কথা বলবে তখন প্রত্যেকটি জার্মান এর প্রতিশোধ নেবার্ চেষ্টা করবে। শুধু ইয়থ্ লিগ করলেই কাজের শেষ হয় না। ইয়থ্ লিগের স দের বুঝতে হয় গলদ কোথায়? যুবকের দল যেমন করে তাড়াতাড়ি গলদ পরিস্কার করতে পারে অন্যে তেমন পারে না। হিটলার ইয়থ্ গের সভ্যেরা বুঝতে পেরেছিল তারা ঘরে বাইরে সর্বত্র সমান ভাবে নি ত হচ্ছে। যদি এই নির্যাতন হতে রক্ষা পেতে হয় তবে মরণকে বরণ ক হবে, জাতকে বাঁচাতেই হবে। ন্যাসনেলিজম গ্রহণ করতেই হবে। শু এ বিষয়ে কথার শেষ এখানেই হল না। এসম্বন্ধে অন্যত্র অনেক কি বলা হবে।

পথ চলতে চলতে ঘড়িটার দিকে দেখলাম ঠিক দ টা বেজেছে। দুদিকের দৃশ্যাবলী বড়ই সুন্দর। হঠাৎ পথটিরও রকম বদলে গেছে। পিচ দেওয়া পথটিতে সূর্যালোক প শুধু চক্ চক্ করছে না, পিচ এমনই সুন্দর ভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে সা কেল পেচ্ পেচ্ করে চলছিল। সাইকেলের পেচ্ পেচ্ যেমন ভাল লাগছিল তেমনি ভাল লাগছিল অদূরের সীমান্ত রক্ষীদের পোশাক দেখে। ষ্ট্রিয়ার সীমা র ীদের আধ-মরা অবস্থায় দেখে আসছিলাম। চেক সীমান্তে সই চেক্ গার্ডদের হাতে পাসপোর্ট দিলাম। তারা পাসপোর্টে চট করে শিল-মোহর করে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি আনন্দে এগিয়ে চল্লাম। দুদিকে সুন্দর দুর্বাদল মাঠ। মাঠগুলি দেখতে বড়ই সুন্দর। পথে লোক নাই। একা আপন মনে নানা চিন্তা করে চলেছিলাম। মাইল পাঁচ যাবার পর একটি ফার্ম হাউস দেখতে পেয়ে তারই সামনে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখবার জন্য কেউ আসেনি অথচ তখনও দ্বিপ্রহরের অবসাদ কারো শরীরে এসে ধাক্কা দেয়নি। একটু কপেক্ষা

করে আমি নিজেই ফার্মহাউসে গিয়ে উঠেলাম এবং চিৎকার করে বল্লাম, "ক্রোসল স্লেছো" অর্থাৎ "ঘোল"। ঘোল নিয়ে কেউ এল না। বাইরে রক্ষিত চেয়ারে কতক্ষণ বসার পর একটি খুকি এসে কি বল্ল। আমি তাকেও আবার "ক্রোসল স্লেছো" কথাটি বল্লাম। বিষণ্ণ বদনে সেও চলে গেল। অনেক্ষণ বাইরে বসায় পর আর যখন কেউ এল না তখন আবার পথে এলাম। দেখতে দেখতে নজ্‌মো (Znaim) শহরের কাছে এলাম। উপর থেকে দুজন চপ্পল পায়ে দেওয়া জার্মান যুবক ইঙ্গিতে আমাকে দাঁড়াতে বল্ল। আমি দাঁড়ালাম। তারা যখন কাছে আসল তখন দেখলাম তাদের মুখ শুখিয়ে গেছে, শরীর পথের ধুলায় ধুসরিত হয়েছে। তারা ক্লান্তি অনুভব করছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, যাচ্ছ কোথায়? তারা বল্লে, ভিয়েন। আর কোনও কথা হল না, কারণ তাদের কথা আমি মোটেই বুঝতে পারছিলাম না।

নজ্‌মো-তে পৌঁছে একটি স্থান নিলাম। হোটেলের শ্রী ছিল না। আমাকে যে রুমখানা দেওয়া হয়েছিল তার দৈনিক ভাড়া স্থানের অনুপাতে যেন বেশিই নেওয়া হয়েছিল। হোটেলের বিপরীত দিকের ফুটপাথে একজন ইহুদীর দোকান ছিল। দোকানী বড়ই রসিক। সেই আমাকে রুম ঠিক করে দিয়েছিল। রুমে কতক্ষণ বসে বিশ্রাম করে পুনরায় ইহুদী দোকান হতে অষ্ট্রিয়ান শিলিং বদলী করে করোনা নিয়ে আসলাম। করোনাগুলি জার্মান সিলভারের তৈরী এবং দেখতে আমাদের দেশের টাকার দ্বিগুণ বড়। কয়েকটি করোনাতেই আমার মানিব্যাগ ভর্তি হয়েছিল। রসিক ইহুদী আমার মাণিব্যাগটা হাতে নিয়ে বল্লে, এখন আপনি একজন ধনীলোক। এখানে কিন্তু আপনাকে সর্বসাধারণ কিছুই সাহায্য করবে না। এখানকার লোক বড়ই গরিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল এখানে যে সকল জিপসি বাস করে

তাদের আকৃতি অনেকটা আপনারই মত। জিপসীরা বড়ই ঠক এবং মিথ্যাবাদী। তারাও হিন্দুদের মত হাত দেখা বিদ্যায় ওস্তাদ। এখানে আপনার সে বিদ্যাও চলবে না। ইহুদী যুবকের কথা শুনে আমি একটুও দুঃখিত হলাম না, শুধু ভাবলাম স্থানীয় জিপসীদের সংগে একটু দেখা সাক্ষাৎ করা সমূহ কর্তব্য। জিপসী প্রকৃতি আমার জানা ছিল সেজন্য রেস্তোরাঁ হতে কিছু খেয়ে বিকালবেলা শুয়েই কাটানো মনস্থ করলাম।

অষ্টিয়ায় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেজন্য দিনের বেলা আমি বস্ত্র পরিবর্তন করতাম না। ঘুম এসে চোখ জুড়ে বসেছিল। এমননি সময় একটি লোক দরজায় আঘাত করল। দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম একজন যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। মনের অবস্থা এমনি খারাপ ছিল যে যুবতীর হাসি ভরা মুখ দেখেও আমি সুখী হলাম না। রাগের মুখে দরজাটা ঠেলে দেবামাত্র দরজাটা মস্ত বড় একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। যুবতী গেল কি গেল না ফিরে গিয়ে দেখলাম না। কতক্ষণ ঘুমিয়ে উঠলাম।

বিকালবেলা হাতমুখ ধোবার জন্য যখন জলের জন্য বেলে নাড়া দিলাম তখন একটা ছোকরা এসে নাজি প্রথায় নমস্কার করে বল্ল, কি চাই? বেসিনটা দেখিয়ে দিলাম তারপর টাওয়েলটা হাতে নিয়ে সেটা তার হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ছেলেটি টাওয়েলখানা হাতে নিয়ে বেসিনটা নিয়ে বের হয়ে গেল! কতক্ষণ পর সে পুরানো টাওয়েলখানা বদলী করে গরম জল সমেত রুমে প্রবেশ করল। হাত মুখ ধুয়ে আমি জিপসী পাড়ার দিকে রওয়ানা হলাম।

জিপসী পাড়া সহর হতে অনেক দূরে। আমাদের দেশে যেমন হরিজন পাড়াগুলি দূরে অবস্থিত থাকে, ঠিক তেমনি জিপসী পল্লীও শ্বেতকায়দের গ্রাম হতে দূরে অবস্থিত ছিল। গ্রামের কাছে গিয়েই বুঝলাম কোথায় এসেছি। যতদূর দেখতে পেলাম, কোথাও একখানা

টাইলের ঘর দেখলাম না। কাছে গিয়ে দেখলাম ঘরগুলি এলমেলো ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেকটা ঘরের মেজে আমাদের দেশের ঘরগুলির মত মাটি দিয়ে তৈরী। ঘরের প্রত্যেকটি দেওয়ালে মাটি লেপা। ঘরের চাল খড় দিয়ে ছাওয়া। গ্রামে এসে মনে হ'ল আমি কোনও ভারতীয় গ্রামে এসেছি। গ্রামের লোকগুলি আমাকে দেখে বোকা হয়ে গেল। তারা আমাকে জিপসী বলে গ্রহণ করেনি। কি বলে গ্রহণ করেছিল তারাই জানে।

এদিকের জিপসীদের শরীরের রং অনেকটা পরিষ্কার। নাকগুলি নরডিক ধরণের। পোষাকও ইউরোপীয়দের মতই। ঘরের পাক করার জিনিসগুলি কতকটা ইউরোপীয় ধরণের আর কতকটা আমাদের মতই। মাংস সিদ্ধ করার জন্য যে পাত্রটি তা দেখলে আমাদের দেশের "বাটলই"-এর মতই দেখায়। গ্লাসগুলি সবই কাচের নয়, পিতলেরও ছিল। আমি কাউকে কিছু না বলেই একটি ঘরে প্রবেশ করে এসব দেখে এসেছিলাম। ঘরের মালিক আমাকে কিছুই বলেনি অথবা তার স্ত্রীপুত্র কন্যা আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য একটুও দুঃখিত হয়নি। অনেক বয়স্ক লোকের সংগে কথা বল্লাম কিন্তু কোনও জবাব পেলাম না। এতে আমার দুঃখ হল না। শুধু নিজের দেশের কথাই ভাবছিলাম। যারা কথা বলে না, যাদের ঘরে প্রবেশ করলে কিছু বলে না, তাদের বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত না ভেবে, জিপসী গ্রাম হতে চলে এলাম।

ফেরবার পথে দেখা হ'ল কতকগুলি চেকের সংগে। এই চেকরা সোকল (Sokal) দলের সভ্য। জার্মাণীতে যেমন করে হিটলার ইয়ুথ লিগ গড়ে উঠেছিল তেমনি করে এদেরও পত্তন হচ্ছিল। আমি তাদের সংগে কথা বলতে চাইছিলাম না, কারণ এদের প্রতি আমার আপনা থেকেই একটা ঘৃণার ভাব জেগেছিল। যারা পরের দেশের

অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে অপরের সর্বনাশ করতে যায় তাদের প্রতি আমার মন হতে আপনা হতেই সমবেদনা লোপ পেত।

গত মহাযুদ্ধের পর চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্ম হয়। যেদিন চেকদের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং প্রাগে স্বাধীনতা-উৎসবের জয়ডংকা বেজে উঠেছিল সেদিন কিন্তু অনেক চেকই স্বাধীনতার আস্বাদ অনুভব করতে পারে নি। অনেকে সেদিন দৈনন্দিন কাজ ঠিক ঠিক ভাবেই করে যাচ্ছিল। প্রাগে তখনকার দিনে নানা রকমের বিদেশীরাই বেশি বাস করত। চেকরা থাকত ছোট ছোট গ্রামে। সেজন্য চেকদের স্বাধীনতার প্রথম দিবস এক রকম নীরবেই কেটে গিয়েছিল। জয়ডংকার তালে তালে খুব অল্পসংখ্যক লোকের হৃদয়ই সেদিন নৃত্য করছিল। একজন অষ্ট্রিয়ান লোক আমাকে বলেছিলেন, যিনি প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন তিনিও সেদিন ভাল করে মুখ খুলতে সক্ষম হননি।

চেকরা বুঝলে বেশিদিনের পরাধীনতার ফলে তাদের অনেকেরই মাথা নত করে রাখবার অভ্যাস রয়ে গেছে। যাতে সগর্বে উন্নতমস্তকে দাঁড়াতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান— এরাই ছিল চেক স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহায্যকারী, সেইজন্য এদের মতেই কাজ করতে হ'ত চেক সরকারের। সেজন্য লণ্ডন, প্যারি এবং রোমে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতাবলম্বী চেক যাতায়াত করত কিন্তু কি উপায়ে চেকদের প্রাণে উত্তেজনা আনতে হবে তার কিছুই ঠিক করা হয় নি।

সোভিয়েট রুশ তখন সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে গঠনমূলক কাজের দিকেই মন দিয়েছিল। সোভিয়েট রুশ যাতে শক্তিশালী না হতে পারে সেইজন্য নানারূপ চেষ্টা চলছিল। এদিকে জার্মাণীতে সোসিয়েলিষ্টদের ক্ষমতাও বেড়ে চলছিল। জার্মাণীতে যে প্রকারেই হউক সোসিয়েলিজম যাতে কায়েম না হয় সেজন্য বৃটীশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আপ্রাণ

চেষ্টা করছিল কিন্তু কিছুতেই জার্মেণীতে সোসিয়েলিজম যেন লোপ পেতে চাইছিল না। ইউরোপের সম্রাজ্যবাদীরা তাই নিয়ে মহা চিন্তায় পড়ল।

স্থির হ'ল চেকোশ্লোভাকিয়ায় এমন একটা শাসনযন্ত্র গড়ে তুলতে হবে যাতে করে জার্মাণী এবং রুশ সোভিয়েট উভয়কেই দলন করা যেতে পারে। পরীক্ষা আরম্ভ হল। সোকল বলে একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। সোকলদের কাজ চলতে লাগল। সোকলেরা প্রথমত বৈদেশিক সাহায্য পেয়েই মার্কস্‌বাদ সংক্রান্ত সাহিত্য কিনে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে লাগল। শরীরের শক্তি বাড়াবার জন্য ব্যায়াম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং শিশুদের এবং মাতৃজাতির দৈহিক উন্নতির সাধনকল্পে শিশুসদন এবং মাতৃসদন গড়ে উঠতে লাগল। চেক সরকার সেইজন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। ষ্টারলিং এবং ফ্রাংক সর্বত্র দেখা যেতে লাগল। লোকে ভাবল, এ আবার কি? এত টাকা কোথা হতে আসছে? টাকা কিন্তু বেশি দিন আসল না। মার্কস্ সাহিত্য একটু প্রচার হবার পরই দেখা গেল, মাতৃসদনে আর সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না, সদনগুলি কোন মতে বেঁচে থাকল বটে কিন্তু যে সকল জিপ্‌সি শিশু তাতে স্থান পেয়েছিল তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। সোকল দলে অর্থাভাবে ভাঙ্গন এসে দেখা দিল। সোকল দল দুর্ব্বল হয়ে লোপ পেতে বসল।

১৯৩৩ খৃঃ হতে জার্মাণীতে নাজি দল নামে একটি দল হার্ হিটলারের অধীনে গঠিত হইতে লাগল। নাজিদল ১৯৩৫ খৃঃ জার্মাণীতে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ইউরোপে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করল। বৃটিশ দূর থেকে নাজিদের সাহায্য করতে লাগল। ফ্রেঞ্চরা তাই দেখে চেকো-শ্লোভাকিয়ায় পুনরায় সোকলদলের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিল। সেই পুনর্গঠনের পেছনে ছিল নেসনেল সোসিয়েলিজমের ইংগিত।

সেইজন্য আমি এই লোকগুলির সংগে নিজে যেচে কথা বলছিলাম না। কিন্তু এরা যখন এস্‌পেরেন্ত ভাষায় কথা বল্ল তখন আমি ইংলিশে বল্লাম, এস্‌পেরেন্ত তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে কিন্তু আমরা তা শিখতে যাব না। আমরা হয় ফ্রেঞ্চ নয় ইংলিশ ভাষা বিদেশী ভাষা রূপেই শেখব। আমাদের দেশ ইউরোপের সমান। সেখানে সর্বত্র হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচলন আছে অতএব আমাদের পক্ষে যদি এস্‌পেরেন্ত বৈদেশিক ভাষা রূপে গ্রহণ করতে হয় তবে তা হবে বাতুলতা মাত্র। অতএব আমাকে এস্‌পেরেন্ত শেখাবার জন্য চেষ্টা না করে অন্য পথ দেখুন। আর একটা কথা আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, কাছেই জিপসী গ্রাম রয়েছে, তাদের যদি এস্‌পেরেন্ত ভাষা শিক্ষা দেন তবে বড়ই বাধিত হব। তারা হ'ল আপনাদের প্রজা (subject people) তাদের উন্নতির চেষ্টা করলে ভাল হবে। আমার কথা শুনে ওদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

ওরা চলে যাবার পর ইউরোপীয় জাতগুলিকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম, কারণ আমাদের দেশে পথের উপর দাঁড়িয়ে এরূপ কড়া কথা কাউকে যদি বলতাম তবে আমাকে নিশ্চয়ই মার খেতে হ'ত। এটাও হল পরাধীনতার একটি লক্ষণ। যারাই পরাধীন তারাই বর্ব্বর প্রকৃতি আপনা হতেই পেয়ে যায়।

পরের দিন সকাল বেলাই ইগ্‌লোর দিকে রওয়ানা হলাম। পথে অনেক ছোট ছোট গ্রাম পড়েছিল। প্রত্যেক গ্রামেই থেমেছিলাম এবং প্রত্যেক গ্রামেই রেস্তোরাঁগুলিতে কিছু কিছু খেয়েছিলাম। এতে শরীরে বেশ শক্তি হয়েছিল। বেলা দশটার সময় একটি গ্রামে পৌঁছি। গ্রামটা উত্তরে দক্ষিণে লম্বা। উত্তরে দক্ষিণে একটা পথও ছিল। আমি দক্ষিণ দিক থেকে আসছিলাম। গন্তব্য পথ ছিল উত্তর দিকে। গ্রামে প্রবেশ করেই দেখলাম কতকগুলি লোক একত্রিত হয়েছে। তাদের পাশ

কাটাতে হয়েছিল। তারা আমার দিকে চেয়ে থেকে বেশ করে অবহেলার হাসি হাসছিল। আমি তাদের দিকে বেশি তাকালাম না, কারণ আমার মনেও তাদের বিরুদ্ধে একটা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছিল। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা খাবারের দোকানে বসে কিছু খাদ্য আনতে আদেশ দিয়ে একত্রিত লোকগুলি কি করে তাই দেখছিলাম। কতক্ষণ পরে যখন খাদ্য এল তখন খাদ্য খেয়ে আবার রওয়ানা হলাম।

গ্রামটা যদিও ছোট তবুও মনে হচ্ছিল তাতে যেন একটা নূতন উদ্দীপনা এসেছে। সেই উদ্দীপনা কি জন্য তা জানবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু এমন একটি লোক পাইনি যার সঙ্গে মন খুলে দুটা কথা বলতে সক্ষম হই। গ্রাম ছেড়ে পথে এলাম। পথটি উচু নীচু এবং অপরিষ্কার। অনেক স্থানেই ছোট ছোট পাথর বেরিয়ে এসেছিল। কয়েক বার ছোট ছোট পাথরে সাইকেলের টায়ারে ঘর্ষণ হওয়ায় ছোট ছোট পাথরগুলি ছিটকে গিয়ে পথের বাইরে পড়ছিল। আমি প্রায় দশ মাইল চলে যাবার পর দেখলাম একটা মোটরকার হু হু করে আসছে। একটু দূরেই দাঁড়ালাম। তারপর আসল এক দল যুবক। তারা রেসিং সাইকেল নিয়ে হু হু করে চলে গেল। শুধু একটি লোক ধীরে চলে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমার পরিচয় চেয়েছিল। আমি তাকে আমার পরিচয় দিয়েছিলাম এবং লোকটিকে পরিত্যাগ করে যারা আমার আগে চলে গিয়েছিল তাদের সংগে শহরে পৌছানোর জন্য এগিয়ে চলছিলাম।

মাইল দুয়েক যাবার পরই যুবকদের দেখা পেলাম। তাদের অবস্থা তখন কাহিল হয়েছিল। আমি একটি একটি করে যুবকদের পেছনে ফেলে সবাগ্রে গিয়ে দেখলাম কয়টি ছেলে ইংলিশ সাইকেল নিয়ে

দৌড়াচ্ছে। আমিও তাদের সংগ নিলাম। এদিকে প্রায়ই ফ্রেন্‌চ সাইকেল ব্যবহার হয় কারণ ফ্রেন্‌চ সাইকেল সস্তায় বিকায়। ইংলিশ সাইকেলগুলির ফ্রেন্‌চ সাইকেল হতে বেশি দাম। ফ্রেন্‌চ সাইকেলের Workmanship খুবই কম থাকায় কম চলে। মেশিনের উৎকৃষ্টতার জন্যই অগ্রবর্ত্তী ছেলেরা আগে যেতে সক্ষম হয়েছিল। আমার সাইকেল ছিল "থ্রি-গিয়ার" সেজন্য ছোট ছোট পাহাড়ে চড়তেও আমার কষ্ট হচ্ছিল না। বিকালে তিনটার সময় আমি এবং যারা রেস দিচ্ছিল তারা একই সঙ্গে শহরে পৌঁছি। যারা রেস্‌ খেলছিল, তাদের জন্য অনেক লোক অপেক্ষা করছিল। কতকগুলি লোক তাদের এগিয়ে নেবার জন্যও গিয়েছিল। শহরে পৌঁছানোর পর বিজয়ী বীরদের "সোকোল" দলের নেতা হাত উঁচু করে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর পোশাকটি অনেকটা নাৎসীদের মতই ছিল। তিনি যখন চিৎকার করে যুবকদের সম্বোধন করছিলেন তখন কতকগুলি লোক আমার পরিচয় জানবার জন্য পেছন নিয়েছিল। লোক আমার পেছন নিচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি করে একটা প্রকাণ্ড হোটেলের দরজার সামনে সাইকেল রেখে প্রবেশ করি।

ইউরোপের অনেক দেশেই টলস্টয় হোটেল দেখতে পাওয়া যায়। টলষ্টয় হোটেলগুলি একদম নতুন ধরণের হোটেল। টলষ্টয় হোটেলে যাঁরা এসে থাকেন তাঁরা সবই প্রগতিশীল। সাধারণত কমিউনিষ্টরাই এখানে এসে উঠেন। ইগ্‌লো (IGLAW) নামক শহরে এসে আমার অজানাতে টলষ্টয় হোটেলে উঠেছিলাম। বাড়িটা একটা ভাঙ্গা পথের পাশে অবস্থিত ছিল। ১৯১৪ সালের পর হতে এই ছোট শহরটির কোনরূপ উন্নতি হয়নি, এমন কি ভাঙ্গা পথটাকে একটু মেরামত করা যে দরকার তাও যেন কেউ বুঝতে চায় না। পথের অবস্থা দেখে

দুঃখিত হয়েছিলাম।

প্রকাণ্ড ঘরটার বারান্দায় কয়েকজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন এসে আমার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কথা একটাও আমি বুঝতে সক্ষম হইনি। ভদ্রলোক যখন কথা বলছিলেন আমি কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকিনি। সাইকেল ঘরের বারান্দায় উঠিয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়ি। আমি যখন চেয়ারে বসে আরাম করছিলাম, তখন অন্য আর একজন ভদ্রলোক এসে আমার সংগে কথা আরম্ভ করলেন। এই ভদ্রলোক জাতে ইংলিশ। তিনি আমার পরিচয় চাইলেন। আমার পরিচয় দিলাম। আমাকে ভবঘুরে ভেবেই ভদ্রলোক বললেন, এখানে থাকলে অনেক খরচ হবে তা দিতে পারবেন কি? এক দিনে কত খরচ হবে তা জেনে নিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, নিশ্চয়ই তা দিতে পারব। আমি ভাবছিলাম আরও বেশি দিতে হবে। চলুন ত একখানা ঘর দেখিয়ে দিন। ভদ্রলোক আমার সংগে গিয়ে একখানা ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমি ঘরের ভাড়া তাঁরই হাতে দিতে যাচ্ছি তখন তিনি আমাকে বললেন, তিনিও এক জন পর্যটক মাত্র, ভাড়াটা হোটেলের মালিককে দিলেই হবে। হোটেলের মালিক কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং আমাদের কথা শুনছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর হাতেই ভাড়া দিয়ে দিলাম। এত বড় সজ্জিত (furnished) রুমের ভাড়া যা দিয়েছিলাম একস্‌চেঞ্জ হিসাবে আমাদের দেশের মাত্র বারো আনা হয়। ইউরোপে সজ্জিত ঘরের মানেই হল তাতে বিছানা রয়েছে, আলনা আছে। এজন্যই furnished কথাটা ব্যবহার করতে হল।

ইংলিশ ভদ্রলোক বলছিলেন তিনিও একজন পর্যটক। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং

তার খরচই বা কেমন করে চলে ? ভদ্রলোককে এসব কথায় নিরুত্তর দেখে আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল এবং অভদ্র ভাবে তাঁকে কয়েকটি কথা বলতেও কসুর করিনি। এই ভদ্রলোকই প্রাগে যাবার পর পারী হতে প্রকাশিত দৈনিক টেলিগ্রাম নামক একখানা সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারের কাছে আমার বিরুদ্ধে এক বিবৃতি দিয়ে অনেক কথাই বলেছিলেন, তাতে আমার নাম বলেন নি বটে, তবে এক জন উগ্র প্রকৃতির ভারতীয় পর্যটকের কথা বলতে তিনি ভুলেন নি। তিনি নাকি এক জন লর্ড। তাঁর কি খেয়াল চেপেছিল তাই সাইকেলে ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়ে পড়েন। তিনি যে লর্ড, সেকথাটি তাঁর কপালে লেখা ছিল না তাই আমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পার্ননি বলে তিনিও বোধহয় দুঃখিত হয়েছিলেন।

সন্ধ্যার পর কতকগুলি চেক যুবক এসে আমা[illegible] সঙ্গ দেখা করে এবং ভারতে বৃটিশরা কিরূপে রাজত্ব করে তা জানতে চ[illegible] এসব কথা এড়াবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু চেক ছেলেরা [illegible]ড়বার পাত্র নয়। তাদের কাছে মিথ্যা কথা বলাও চলে না[illegible] তাই যতো[illegible] কম কথায় ভারতের দুঃখের কথা বলে শেষ করা যায় তাই করলাম। [illegible]ক ছেলেদের ইংলিশ বলতে দেখে যদিও সুখী হয়েছিলাম তবুও মনে যে[illegible]টা খটকা বেধেছিল। ভাবছিলাম এরা ইংলিশ কেন শিখল ? তাদে[illegible] ফ্রেন্চ শেখা উচিত ছিল। কারণ ফ্রেন্চ হল ইউরোপের সকলে[illegible] ভাষা। কথা প্রসংগে ঐ ছেলেদের আমি বলেছিলাম, তোমরাও নামকা ওয়াস্তেই স্বাধীন, প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্য বাদীরাই তোমাদের ভালমন্দ দেখে থাকে। আমার মুখের কথা শেষ হবার পূর্বেই একজন বলে উঠল, সেজন্য আমাদের দেশে টলষ্টয় হোটেলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, আমরা কমিউনিজম মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছি এবং

আমাদের দেশকে সোভিয়েটে পরিণত করারও চেষ্টা হচ্ছে। এসব কথা নিয়ে কথা বাড়ানো উচিত হবে না বলেই নীরব থাকতে হয়েছিল।

তারপর দিন যখন পথে বের হলাম তখন পূর্বের আকাশটা লাল রংএ ভরে গিয়েছিল। সবুজ গাছের পাতায় লাল রং পড়ে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পথের ফার্মহাউসগুলি থেকে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। পথেরই পাশে ফলের বাগানের মজুরের দল তাদের জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে কাজ করছিল। ছেলেমেয়েরা পথে বেরিয়ে পড়ছিল। তাদের সোণালী চুল গোলাপী গালে পড়ে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি ত তাদের সৌন্দর্য দেখছিলাম, তারা আমার কি দেখছিল? তারা দেখছিল আমার সোলার টুপি যা তা[illegible] দেশে কেউ ব্যবহার করে না, আর দেখছিল আমার মুখের র[illegible]। কেউ কেউ নিগার নিগার বলে চীৎকারও করছিল। যারাই নিগার বলে চিৎকার করছি[illegible] তাদেরই কাছে গিয়ে বলছিলাম, "নাই নিগার, হিন্দুইস্কি"। এর মানে হল, আমি নিগ্রো নই, আমি এক জন হিন্দু। মধ্য ইউরোপে আমাদের হিন্দু বলে। মধ্য ইউরোপের লোক আবার নিগ্রোদের ঘৃণাও করে না। আমাকে যারা নিগার বলছিল তাদের মনে কোনরূপ পাপবুদ্ধি ছিল না। যাদের উপনিবেশ আছে, যারা জাত বিচার করে চলে তাদের মুখ হতে যখন এসব কথা [illegible] হয় তখন মনে করা উচিত যে ঘৃণা করেই কথাগুলি বলছে।

পথটা ছিল বেশ ভাল, তাই পীলগ্রাম (Pilgram) নামক স্থানে পৌঁছতে মোটেই কষ্ট হল না। পীলগ্রামের আশে পাশে অনেকগুলি কারখানা দেখতে পেয়ে ভাবলাম এটাই বোধ হয় বাটার কারখানা (Bata's Workshop) হবে। আমি কিন্তু এ কলকারখানাগুলি বাটার না টাটার, তার সন্ধান করিনি। আমি সন্ধান করেছিলাম

এখানকার মজুরের অবস্থা।

মস্ত বড় কারখানা, হাজার হাজার লোক তাতে কাজ করছে। আমি একটি মজুর নিবাসে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ঘরটার ভাড়া আমাদের দেশের ছয় আনার মত, তবে বেশ সুন্দর। নিকটস্থ খাবারের দোকানে গিয়ে খেয়ে মোটেই তৃপ্তি পাইনি। সেজন্যই আরও একটু ভাল একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেতে বসলাম। এখানে মাখন, কপিসিদ্ধ, ডিমের বড়া যাকে অমলেট বলা হয় তা খেয়ে নিয়ে অন্য একটা দোকান হতে ক্রেসল গ্রেচো (ঘোল) কিনে খেয়েছিলাম।

এ দিকে তিন রকমের ভাষা চলে। জার্মান, ফ্রেন্চ এবং চেক। চেকদের ভাষা অনেকটা রুশ ভাষার মতই। খাবার খেয়ে এসে ভাবছিলাম এখানে রাতটা কাটিয়ে কালই এখান থেকে চলে যাব, হঠাৎ মনে হল একটা ওয়াটার প্রুফ কোট কিনতে হবে। পরের দিনটা এখানে থাকা ঠিক করার পরই বাইরে একটু বেড়িয়ে দেখবার জন্য চলে আসলাম। বেড়াব আর কোথায়? এখানে অনেক কাফি হাউস আছে, নাচবার ঘর আছে—তাতেই বেড়াতে লাগলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম এখানকার মজুররা অতি অল্প মাইনে পায় নতুবা বিয়ারের দাম যা নেওয়া হয় এক্সচেন্জের হিসাবে একটি বড় গ্লাস বিয়ারের দাম মাত্র আমাদের দুই পয়সা হয়। এরূপ এক গ্লাস বিয়ারের দাম আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কমের পক্ষে দুই টাকা হবে। অন্যান্য খাবারের দামও ঠিক সেরূপই।

পরের দিন সকাল বেলা একটি দোকানে গিয়ে একটা ওয়াটর প্রুফ দেখে তা খুলে গায়ে দিলাম। দেখলাম বেশ মানায়। কোটটা আর খুলে রাখলাম না, দোকানীকে তার দাম কত জিজ্ঞাসা করলাম। অবশ্য কথা বলতে হয়েছিল নিজের ভাষায়ই। দোকানী অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে তারপর কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দোকান

হতে ঠেলে বের করে দিল। ওয়াটার প্রুফ কোটের দাম চাইলেই না। আমিও তাই চেয়েছিলুম। ওটা গায়ে দিয়ে ফের সাইকেলে উঠলাম এবং চল্লাম কারখানার দিকে। কারখানার দরজায় দুজন লোক বসেছিল, তারা আমাকে একটু দেখেই পথ ছেড়ে দিল। আমি ভেতরে গিয়ে অনেক্ষণ বেড়ালাম তারপর একটা খোলা ময়দানে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

অনেক্ষণ পরে যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখলাম মজুরের দল আমারই কাছে বসে খাবার খাচ্ছে। এতগুলি লোক খাবার খাচ্ছে অথচ টু শব্দ করছে না দেখে আমার বেশ একটু আনন্দ হয়। মনে হল এখানকার মজুরের আদবকায়দা আমাদের থেকে অনেক উঁচুস্তরের। আমাদের দেশে স্কুলকলেজের ছাত্রেরা যদি কোথাও গিয়ে বনভোজন করে এবং কাছে একটা লোক শুয়ে থাকে তবে সেই লোকটার সম্বন্ধে কত মন্তব্য করে তার ত কথাই নাই উপরন্তু লোকটার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে ছাড়বে না, এরূপ দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখেছি।

এদের খাওয়া হয়ে গেলে আমি তাদের কাছে আমার ভিক্ষাপত্র বিলি করলাম এবং যেখানে শুয়েছিলাম সেখানে ফিরে এসে বস্‌লাম। যারা আমাকে সাহায্য করল তারা আমার দেওয়া ভিক্ষা পত্র আর ফেরত দিল না, আর যারা সাহায্য করল না তারা ভিক্ষাপত্র ফেরত দিয়ে গেল। ইচ্ছা করলেই ভিক্ষাপত্রগুলি ফেরত না দিলেও পারত, কিন্তু ইউরোপের মজুরের সাধারণ জ্ঞান থাকায় অন্যায় কাজ করে না।

সেদিন বিকালে আবার ভিক্ষাপত্র অনেক কাফেতে বিলি করলাম এবং অনেকগুলি করোনা পেলাম। পরের দিন সকালে রওয়ানা হয়ে আর একটি শহরের দিকে এগিয়ে যাবার পথে এসে দেখলাম হঠাৎ পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমিও অপেক্ষা না করে গ্রাম্য পথে প্রাগের

দিকে রওয়ানা হলাম।

পথে এক জন হংগেরীয় লোকের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে একটি গ্রাম্য হোটেলে নিয়ে গেল। তাকে আমি একখানা ভিক্ষাপত্র দিয়েছিলাম। সে ভিক্ষাপত্রখানা পাঠ করেই কি ভাবল, তারপর অন্য একজন লোককে কি বল্‌ল। সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেল। আমি এবং হংগেরীয় লোকটি একজন চাষার ঘরে প্রবেশ করলাম। চাষা তখন ঘরে ছিল না। তার স্ত্রী আমাকে খাবার টেবিলে বসিয়ে একটা বাটী ভর্ত্তি করে পায়স, এক কাঁচের হাঁড়িতে দই এবং রুটি এনে রেখে দিয়ে কফি আনতে গেল। আমি এবং হংগেরীর লোকটি পেট ভরে তাই খেলাম। হংগেরীয় লোকটি আমাদের খাবারের দাম বাবদ হংগেরীয় দুটি পেংগা দিয়েছিল। খাবারের দাম যা নিল তা অতি অল্প। খাবার খেয়ে যখন আমরা সিগারেট ফুঁকছিলাম তখন অন্য লোকটি একখানা লরী নিয়ে এসেছিল। আমরা গিয়ে সেই লরীতে বসলাম। লরীড্রাইভার প্রবল বেগে তার লরীখানা প্রাগের দিকে চালিয়ে দিল।

কি মনে করে এরা আমাকে এত দয়া দেখালে তার কারণ খুঁজে পাইনি। তাদের দয়া দেখাবার যে কোনও কারণই থাক না কেন মোটর লরীতে বেড়ানোটা বেশ আমদপ্রদ হয়েছিল। লরীখানা এঁকেবেঁকে যখন পথ চলছিল তখন ছোট ছোট গ্রামও পথে ... ছিল। মধ্য ইউরোপের গ্রামগুলি বড়ই সুন্দর। গ্রামগুলি কোথাও এলোমেলো ভাবে অবস্থিত আর কোথাও লাইন দেওয়া। গ্রামের সামনে এবং পেছনে কোথাও ফলের গাছ ছিল না। পাইন বৃক্ষরাজিই ছিল গ্রামের শোভা। এরই বা কারণ কি তাই ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ। প্রাগে পৌঁছে একটি শ্লাভনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের বাড়ির পাশে ফলবৃক্ষ

কেন থাকে না। তিনি বলেছিলেন, গ্রামের পাশে ফলের বাগান রাখতে নাই। ফলের বাগানও কৃষির অন্তর্ভুক্ত। গ্রামে যদি কৃষির অন্তর্ভুক্ত ফলের বাগান হয় তবে গ্রামের সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্য থাকে না। ভদ্রলোকের নাম মূলার টড্। নামে ভদ্রলোক জার্মান কিন্তু জাতে একেবারে কট্টর শ্লাভন্। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর লিখিত অনেক বইও ছিল। সেই বইগুলি কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী ছিল না। তিনি ছোট বেলা হতেই উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন, সেজন্য তাঁর ভ্রমণ তিনি উপন্যাসের ভেতর দিয়েই ব্যক্ত করেছিলেন। গ্রীক জাহাজের কর্ম্মচারী হয়ে তিনি একবার ভারতেও এসেছিলেন। ভারত সম্পর্কেও তিনি কিছুটা তাঁর উপন্যাসের ভেতর দিয়ে বলেছেন।

টড্ আমাকে পেয়ে এত সুখী হয়েছিলেন যে তিনি তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কয়েক দিনই খাইয়েছিলেন এবং বম্বে, কলম্বো, কলিকাতা প্রভৃতি বন্দরের কথা ব... আরাম পেয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে টড্ বলেছিলেন প্রাগ এক বিচিত্র শহর। এখানে সকল জাতের লোকের মিলন হয়েছে যেমন জার্মান, ফ্রেন্চ, রুশ, গ্রীক, বুলগার। এদের একের সংগে অন্যের প্রায়ই বিয়ে হয় এবং প্রাগেই এই ধরণের ইন্টারনেসনালিষ্টরা থাকতে ভালবাসে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর নিজের নাম এবং উপাধিটা আমার সামনে ধরে দিয়েছিলেন। মিঃ টড বেশ ধনী লোক। তাঁর বাড়িখানা দেখে আমি সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। তাঁর কয়েকটি রেডিমেড্ সুটের দোকান ছিল। তিনি আমাকে তাঁর গুদামে নিয়ে গিয়ে একটি উত্তম কোট উপহার দেন এবং অন্যান্য কিছুর দরকার মনে করি তবে তাও স্বহস্তে উঠিয়ে নিতে বলেন। আমার একটি কোটের দরকার ছিল, আমি কোটটি পেয়েই সুখী হয়েছিলাম।

প্রাগ

গরমের শেষ হতে চলেছে। উত্তর আকাশে মাঝে মাঝে মেঘমালা ভেসে এসে বিনা বর্ষণেই দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছে। প্রাগের আকাশ পরিষ্কার এবং সুন্দর স্বচ্ছ নীল। দলে দলে লোক এই সুন্দর নীল আকাশের নীচে পথে ঘাটে আনন্দে ভ্রমণ করছে। খাবারের দোকান হতে আরম্ভ করে হাট বাজার সর্বত্র লোক সুখের দিনগুলি গল্প গুজব করেই কাটিয়ে দিচ্ছে। এই সুখের দিনে আবিসিনিয়া যুদ্ধ চরমে উঠেছে। কেউ ভাবছে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ হতেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হবে আর কেউ ভাবছে স্পেনের গণ্ডগোলের ভেতর থেকে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। পথে ঘাটে সর্বত্র যুদ্ধ নিয়েই গবেষণা চলছে।

প্রাগের মজুর গৃহ অন্য ধরণের। এখানের লোক ভিয়েনার লোক হতেও গরীব। সেজন্য গরীব গৃহের খাদ্য অখাদ্য বলেও চলে। আমি গরীব গৃহে থাকা স্থির করলাম বটে কিন্তু খাব না যে এটা মজুর ঘরে প্রবেশ করেই ঠিক করে রেখেছিলাম। এখানেও আমি একটি রুম নিয়েছিলাম। রুমটি প্রত্যহই একটি লোক পরিষ্কার করে দিত। আমার অপরিষ্কার পোশাকও সে ধুয়ে দিত সেজন্য তাকে অ.. মজুরী দিতাম। লোকটির সংগে ইংগিতে কথা বলতে হ'ত। সে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার লোক। ধর্মে ইহুদী, জাতে শ্লাভন্। লোকটি বিবাহিত। স্ত্রী কন্যার খরচ চালাতে পারে না বলে প্রাগে এসেছে। তার আর্থিক দুরবস্থার কথা আমাকে জানিয়েছিল বলেই আমি তাকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রাগে আসার পর সামান্য একটু জ্বরও হয়। ইউরোপের

লোক রোগ হইলে হসপিটালে যায়। আমার সামান্য জ্বর হয়েছিল বলে হসপিটালে যাওয়া দরকার মনে করিনি। যে লোকটি আমার কাপড় ধুয়ে দিত, সেই আমাকে সকল রকমের সাহায্য করেছিল। ইউরোপে অবিবাহিত লোকগুলি লক্ষীছাড়া হয়। আবার বিবাহিত লোকের মধ্যে মায়া দয়া সবই থাকে। সেজন্যই ইউরোপের অবিবাহিত লোককে কেউ ভালবাসে না। এ কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম বলেই যখনই কেউ জিজ্ঞাসা করত তখনই বলতাম আমি বিবাহিত। পাসপোর্টে লেখা অবিবাহিত বলে ছিল। ইউরোপে সে জন্য কিছু আসে যায় না। ইউরোপে অনেকেই নানা রকমে বিয়ে করে। শ্লাভন লোকটি আমাকে আরোগ্য করেই ছেড়ে দেয়নি, দু এক দিন তার আত্মীয়ের বাড়ী হতে লঘুপাক খাদ্যও এনে দিয়েছিল।

প্রাগে পৌঁছানোর পর আমার মাথায় একটি বাতিক চড়েছিল। সেই বাতিকটি হল এখানকার শিক্ষিত লোকের সংগে আমার কথা বলা চাই। সে উদ্দেশ্য নিয়েই আমি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভেবেছিলাম এরা আমাকে কতই আদর যত্ন করবে, আমাদের দেশ সম্বন্ধে কত কিছু জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু কেউ আমাকে পাত্তা দিলে না। আমি মনের দুঃখে প্রাগের সব চেয়ে বড় পথটার একপাশে একখানা বেঞ্চে বসে আমার বিদ্যা বুদ্ধির কথাই চিন্তা করছিলাম। কতক্ষণ পর মজুর গৃহে পরিচিত একটি লোকের সংগে দেখা হল। লোকটি সে পথ দিয়ে চলছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং এদিকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লাম, ভাবছিলাম এখানকার শিক্ষিত লোকের সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারব, কিন্তু ঐ যে দেখছেন বাড়িটা সেখানে গিয়ে কারো সংগে কিছুই বলতে সক্ষম হইনি। এমন কি কেউ আমার দিকে তাকায়ও নি। আমার

সংগে আসুন, বলেই ভদ্রলোক আমার ডান হাতটা তার বগল দাবা করে নিকটস্থ একটা প্রকাণ্ড ঘরে প্রবেশ করে ছাত্রদের উদ্দেশ করে বল্লেন, ইনি এক জন ভারতবাসী, আপনাদের সংগে পরিচিত হতে চান ছাত্রেরা তাদের কাজ পরিত্যাগ করে আমায় কাছে এসে দাঁড়াল আমার বলার মত কিছুই ছিল না এবং তাদের কাছ থেকে জানবারও কিছু ছিল না। রুমটা দেখে মনে হল এখানে কেমিস্ট্রি শিক্ষা দেওয়া হয়।

যে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আমার সমবয়সী। ছাত্রদের সংগে তাঁর বিশেষ পরিচয় না থাকলে ছাত্রেরা তাঁর কথায় আমার কাছে নিশ্চয়ই আসত না। কিন্তু তাঁকে যখনই মজুর গৃহে দেখেছি তখন তাঁর পোশাক চাল চলন সবই মামুলী লোকের মতই দেখেছি। এখানে কিন্তু তাঁর গলার নেকটাই আমার কোটটির দামের সমান ছিল। ছাত্রদের সংগে আমি একটি কথাও বলিনি। ভদ্রলোকই আমার হয়ে কি বলে আমাকে নিয়ে বাহিরে চলে এসে বলেছিলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে আপনার কোনও লাভ হবে না। শহরটি ভাল করে দেখুন এবং পথে যে প্রকারে ভিক্ষা করছিলেন সেই প্রকারে ভিক্ষা করুন তাতে আপনার বেশ জ্ঞান হবে। এই নেন পাঁচটি "করনা", আমি আমার তরফ হতে আপনাকে দিচ্ছি। বিকালের দিকে একটি যুবককে সংগে নিয়ে ভিক্ষার্থে বেরিয়ে পড়বেন। ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু ইংলিশ সভ্যতা তাতে বাদ সেধেছিল।

বিকাল বেলা ভিক্ষায় বের হয়েছিলাম। প্রাগের রেস্তোরাঁগুলি ছোট ছোট। পঞ্চাশ জন লোক একত্রে কোথাও একটি ঘরে বসা দেখিনি। সেজন্য অনেক দূরে দূরে যেতে হত। সেদিন আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহরের উপকণ্ঠে চলে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে

দেখলাম একটা পথের উপর বসে লোকে খাবার খাচ্ছে। পাশেই একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর লোকই পথটার অর্দ্ধেকটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে লোককে খেতে দিচ্ছে। সাথীকে বলে সেখানেই আমরা খেতে বসলাম।

রেস্তোরাঁটি একজন চেক পরিচালনা করত। তার রেঁস্তোরাঁ হতে যে খাদ্য দেওয়া হ'ত তা অবিকল চেক প্রথায় পাক হ'ত এবং পরিবেশনও করা হত। আমরা "ফুল ডিনারের" আদেশ দিয়েছিলাম। ফুল ডিনারে সুপ্, আলুসিদ্ধ এবং মাছ, মাংসভাজা, সবজি সিদ্ধ, পুডিং এবং কাফি ছিল। ভেড়ার মাংস নিয়েছিলাম বলে বেশি দাম দিতে হয়েছিল। শূকর মাংস প্রাগে মহামূল্যবান জিনিস, এমন কি শূকরের তৈলও সকল সময় পাওয়া যেত না বলে বিদেশী বাদামের তেল ব্যবহার হ'ত। আমার যখন খাচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম আমার পূর্ব্বপরিচিত প্রফেসর মহাশয়ও দরিদ্র বেশে আরামের সংগেই খাচ্ছেন। তার সংগে সে সময়ে কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না ভেবে, ঐ সাথীকে জিজ্ঞাসা ক[illegible]াম, ঐ যে লোকটি বসে খাচ্ছে, তাকে আজ পথে কোথাও দেখেছি [illegible] মনে হয়, লোকটার সম্বন্ধে কি ধারণা করেন? আমার সাথী [illegible]ন, লোকটি রাশিয়ান, এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। তিনি হোয়াইট গার্ড নন্।

বেশি কথা না বাড়িয়ে মজুর গৃহে ফিরে এসে কতক্ষণ বসার পরই রাশিয়ান লোকটি মজুর গৃহে প্রবেশ করে আমার পাশের একখানা রুম ভাড়া করেন এবং আমাকে কিছু না বলেই চাবিটি নিয়ে উপরে চলে গেলেন। আমিও কতক্ষণ পর আমার চাবিটি নিয়ে রুমে গেলাম এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম রাশিয়ান প্রফেসর আমার দরজায় ধাক্কা দেন কি না। কতক্ষণ পরই কে দরজায় ধাক্কা দিল এবং দরজা খুলে

দেখলাম রাশিয়ান ভদ্রলোকটিই দরজায় ধাক্কা দিয়েছেন। তাঁকে ঘরে এনে বসলাম। তিনি বল্লেন, যেদিন থেকে আমি প্রাগে এসেছি সেদিন থেকেই তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দিকে যেতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, সেজন্য তিনি পথে আমার সংগে দেখা করেন। তিনি আরও বল্লেন, এদিকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাস্থল বলা হয়। যতক্ষণ ছাত্রেরা ক্লাসে থাকে তখন বিদ্যার্জনের কথাই ভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পলিটিক্স করে বটে কিন্তু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে কিছুই করে না। সবই হয় বাইরে। অতএব স্কুল কলেজে আমার মত পরিব্রাজকের পক্ষে যাওয়া কোনও মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। বাইরে থেকে বাইরের অবস্থা দেখাই ভাল। বাইরে লোক স্বাধীন ভাবে কথা বলে। বিশ্ববিদ্যালয় কেন মামুলী স্কুলেও নিয়ম কানুনের ভেতর দিয়ে চলতে হয়। রাশিয়ান ভদ্রলোকের কথা শুনে সুখী হয়েছিলাম। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে এবং এমেরিকাতেও ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাবেই দেখা করেছিলাম, স্কুল অথবা কলেজের ভেতরে নয়।

রাশিয়ান্ ভদ্রলোক কেন গরিব লোকের পোষাক পরে গরিবদের মধ্যে থাকেন সেকথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমার কথার উত্তরে বলেছিলেন, গরিব সেজে পথে হাঁটতে তাঁর বেশ ভাল লাগে, সেজন্যই তিনি গরিবের পোশাক পড়েন।

পনরটি দিন প্রাগে ছিলাম। ধনী গরীব, সরকারী কর্মচারী ব্যবসায়ী সকলের কাছেই গিয়েছি। প্রায় লোকের সংগেই কথা বলেছি। অনেকে আবার আদর আপ্যায়নও করেছিলেন। যে দিন আমি প্রেসিডেন্ট ব্যনের বাড়িতে যাই সেদিন ভেবেছিলাম হয়ত চেক প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎও হতে পারে। বাড়িটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকটি দেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সুখের বিষয়

সেদিন প্রেসিডেণ্ট বাড়িতে ছিলেন না, প্রেসিডেণ্ট নাকি পর্যটকদের সংগে কথা বলতে বড়ই ভালবাসতেন। আমি ছিলাম তার বিপরীত, কোনও বড় লোকের সংগে কথা বলে নিজেকে দাবিয়ে দেওয়া আমার মোটেই ভাল লাগত না। সেজন্য প্রেসিডেণ্টের সংগে দেখা না হবার জন্য সুখী হয়েছিলাম। চেক প্রেসিডেণ্টের বাড়ি আমাদের দেশের লাট সাহেবদের বাড়ির মত নয়, মানুষের বাড়ির মতই। চেক প্রেসিডেণ্টের বাড়িটি দেখে সুখী হয়েছিলাম।

ফেরবার পথে আমরা একটি অফিসারদের ক্লাবে যাই। অফিসারদের ক্লাবটি কেমন তাই বলছি। পথের পাশে ছোট্ট একটা রেঁস্তোরা। সেরূপ ঘর আমাদের কলকাতার অলিতে গলিতে দেখতে পাওয়া যায়। সামনার দিকে দুটা খিড়কী। প্রত্যেকটাতেই পরদা লাগানো। দরজাতে পর্দা ছিল না। আমরা ঘরে প্রবেশ করেই দেখলাম তিনজন অফিসার চুপচাপ বসে বিয়ার খাচ্ছে। সেদিন ইচ্ছা করেই আমরা দুজনে দুগ্লাস বিয়ার নিলাম এবং দুগ্লাস বিয়ারের দাম বাবদ এক্সচেঞ্জের হিসাবে আমাদের দু আনার মত চেক মাণি দিলাম। আফিসারগণ আমাদের বসতে কোনরূপ বাধা দিল না। সাথীকে বল্লাম, তবে এখানে সকলেই আসতে পারে, এটা ক্লাব নয়। সাথী বল্লে, এটা নিশ্চয়ই ক্লাব। এদেশের অফিসারদের ক্লাবে এবং অন্যান্য দেশের আফিসার ক্লাবে অনেক প্রভেদ। আপনি যখন জার্মাণীতে যাবেন তখন দেখবেন জার্মান আফিসারদের জার্মান সেপাইরা কেমন সতর্ক ভাবে সম্মান দেখায়, এখানের সেপাইরা সেরূপ নয়। সাধারণ কথায় সুপ্রভাত বলেই এখানের সেপাইরা অফিসারদের ক্লাবে এসে প্রবেশ করে। বাস্তবিক পক্ষে চেক সৈন্য এবং আফিসারের মধ্যে পার্থক্য বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। সাথীর কথা শুনে সুখী হয়েছিলাম, এবং অফিসারদের

বোকামীপূর্ণ মুখ দেখে ভেবেছিলাম, তাদের মুখে এখনও হামবড় ভাব এসে দেখা দেয়নি।

বিকালের দিকে অন্য একটা বড় মজুর গৃহে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম এক দল জার্মান জু ঘরটাতে ভর্তি হয়ে আছে। তাদের অনেকেই ইংলিশ জানে। কয়েকখানা রুমও খালি ছিল। সাথীকে সংগে করে পুরাতন মজুর গৃহে এসে তাদের পাওনা মিটিয়ে সেদিন নূতন এবং বড় মজুর ঘরটাতে চলে গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল প্রাগে মাত্র দুই সপ্তাহ থাকি কিন্তু পুরাতন মজুর গৃহে সময় যেন কাটছিল না।

এখানে আসার পরই কতকগুলি জার্মান জুর সংগে পরিচয় হ'ল। তারা কথায় কথায় হিটলারের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করছিল। আমি নীরবে তাদের কথা শুনছিলাম। তাদের কাছে জার্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও শুনছিলাম। একজন জার্মান জু আমার সংগে বেশ খাতির করে নিয়েছিল। সে আমাকে সেদিনই ডেকে নিয়ে একটি পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়। সে আমাকে বলেছিল, হিটলারের বিরুদ্ধে যা শুনতে পাচ্ছি তার সবটাই ঠিক নয়। জার্মাণীতে নাজীইজম বলে যে ইজমটী গড়ে উঠেছে তার প্রবল প্রতাপ এখনও বিকশিত হয়নি, ভবিষ্যতে হয়ত হবে। সুখের বিষয় আপনি জার্মাণীতে যাচ্ছেন, আর আমরা জার্মাণী হতে চলে আসতে সক্ষম হয়েছি। এই বলেই লোকটি কি ভেবে জার্মাণীর সম্বন্ধে হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দিল তারপর আরম্ভ করল পুরাতন ইতিহাস। পুরাতন কথা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার পুরাতন কথা মোটেই ভাল লাগে না। জার্মান জু সেদিনের মত আমাকে বিদায় দিয়েছিল।

নূতন মজুর গৃহটাতে প্রায় পাঁচ শত লোকের খাবার ও থাকার স্থান

ছিল। পাঁচ শত লোকের আসা-যাওয়া, কথাবলা, এবং খাওয়া এক বিরাট ব্যাপার। এই বিরাট ব্যাপারের মধ্যেও আমার উপস্থিতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কতক্ষণ পর জিজ্ঞাসু ইহুদীরা আমার সংগে পরিচিত হয়ে ভারতে এসে কি করে বসবাস করতে পারা যাবে সেকথা জিজ্ঞাসা করছিল। তাদের ধর্মের প্রতি ভারতীয়রা দোষারোপ করবে কি না সে কথাও জানবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিল। ইহুদীগের ধর্ম সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই জানতাম তবুও কিছুই জানি না ভাণ করে কি রকমে তারা জীব হত্যা করে তা জিজ্ঞাসা করলাম। ইহুদী প্রথায় জীব হত্যা করা ইউরোপের কোথাও চলে না। ইহুদীরা জীবের শুধু কণ্টনালীটুকু কেটে ছেড়ে দেয়। এতে জীবের মরতে অনেক সময় লাগে। জার্মাণরা নির্মম বলে পরিচিত কিন্তু মোটেই পছন্দ করে না—পশুর মত পশু হত্যা। জার্মাণ হতে ইহুদী বিতারণ সেও অন্য আর একটি কারণ। ফ্রান্সে এসব ধর্মের বদ্‌খেয়ালি চলে না, সেখানে পৃথক জীব হত্যার স্থান কোথাও কাউকে দেওয়া হয় না, সেজন্য এসব প্রশ্ন ও উঠে না।

আমার পরিচিত জুটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মাণীতে ইহুদীরা অল্পমূল্যে বাড়িঘর কিনছিলই, পরন্তু বড় বড় শহরের ভেতরেও জীব হত্যার স্থান করেছিল। জার্মাণরা সেই স্থানগুলির পাশ দিয়েও যেতনা, এসব সবাকার জন্য শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মাণরা দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং ভালো মানুষে পরিণত হয়। অদূরদর্শি ইহুদীরা ভেবেছিল জার্মাণীর এই দুরবস্থা চিরকাল থাকবে এবং সেজন্য বিদেশীর সাহায্য নিয়ে পরোক্ষ ভাবে জার্মানদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারবে। তারই প্রতিশোধ জার্মাণী হতে জু বিতারণ।

বড় মজুর গৃহে এসে শুধু জার্মাণদের কথাই শুনতে হয়েছিল।

৬

ভাবলাম এখানে এসে ভাল করিনি অতএব অন্যত্র যাওয়ার সত্বর দরকার। পরিচিত জার্মান জুকে সেকথা প্রকাশ্যেই বলে ফেল্লাম। তিনি আমাকে বল্লেন, এখন থেকে আপনি আমার সংগে ভ্রমণ করবেন। জার্মান জুরা আপনাকে কষ্ট দেবে না। আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, তবে আপনি কে? আপনি কি জার্মান জু নন্? তিনি বল্লেন, আপনার কি মনে হয়? আমি বল্লাম, আপনি জার্মান জু নন, আপনি জার্মান জুদের সঙ্গে আত্মগোপন করে আছেন মাত্র। ভদ্রলোক একটু হেসে বল্লেন, অনেকটা তাই।

জার্মান জুদের সংগে আত্মগোপন করে অনেক জার্মান সোসিয়েলিস্ট বিদেশে আসতে সক্ষম হন। এর মধ্যে ইনিও একজন। এতটুকু কথা বলার পর ভদ্রলোক তার নাম আমার কাছে প্রকাশ করেন এবং বলেন তাঁর নাম হার টড্। হার শব্দটি আমাদের দেশে অপরিচিত সেজন্য তাঁকে মিষ্টার টড্ বলেই ভবিষ্যতে বলা হবে।

টডের আমারে সংগে নেবার কারণ কি বুঝতে পারিনি। সেজন্যে চিন্তার বিষয় ছিলনা। আমার মত বিদেশীর কাছে ইউরোপের লোক ভারতের কথাই জানতে চাইত। তাদের দেশের সম্বন্ধে শুধু দুএকটা কথা জিজ্ঞাসা করত, সেজন্যই আমার ভাববারও কিছু ছিল না।

সুডেটেন এলাকা

এই পৃথিবীতে এমন অনেক লতা আছে যার শিকড় থাকে এক স্থানে আর তারই লতা পাতা ক্রমশঃ লম্বা হয়ে বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে চলে গিয়ে অনেকদূরে চলে যায়। জার্মাণ জাতটিও তেমনি করে আসল

জার্মাণী হতে ধীরে ধীরে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। সুডেটেন্ এলাকাটি তারই একটি বড় দৃষ্টান্ত। আমার সংগে মিঃ টড্ প্রথম দিন ভ্রমণের শেষের দিকে বল্লেন—আমরা সুডেটেন এলাকায় এসেছি। ঐ যে দেখছেন সুন্দর ন্যাসপাতির বাগান—এটা হল এক জন জার্মানের। আর ঐ লোকটা দাড়িয়ে আছে—সে হল চেক্। চেক্ মজুর জার্মান্ মালিকের বাগানে কাজ করে; চলুন কটা ফল খেয়ে আসি। আমার তাতে আপত্তি ছিলনা। আমরা গিয়ে ফল চাওয়া মাত্র চেক চাকর দুটা করে ন্যাসপাতি আমাদের হাতে দিয়ে বল্লে, বড়ই টক হবে, এখনও পাকেনি। এবার আমাদের কর্ত্তা "স্প্রে" করেননি বলে ন্যাসপাতি কীট দ্রষ্ট হয়েছে। ফল দুটা আমার খেতে হল না, একটু খেয়েই বুঝলাম ভয়ানক টক। ফল দুটি চাকরের হাতে দিয়ে বল্লাম, "ধন্যবাদ মশাই"। চেক লোকটি আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্লে, "কোন্ দেশের জিপসী হে, অর্দ্ধভুক্ত একটা ফল আমার হাতে ফেরত দিতে সাহস করলে?" টড্ জানিয়ে দিলেন তার সাথী জিপসী নন, ভারতবাসী, আর যেন এরূপ ভাবে কথা না বলে।

নভস্ (Noves) সমতল ভূমিতে অবস্থিত। বাড়িঘরগুলি বড়ই সুন্দর। বিকালের দিকে সাদা মেঘ নভস্ এর উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চেকদের দেশে চলে যাচ্ছিল। পাশের ছোট্ট নদী নালা হতে জল কলকল করে প্রাগের বড় নদীটাতে যাবার জন্য কোথাও উতলা হয়ে আর কোথাও ঝম ঝম করে পড়ছিল। সুডেটেন দেশের গাছগুলি হেলে দুলে তাদের নূতন পাতাগুলি যেন প্রাগের দিকেই ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল। জার্মানরা তা সহ্য করতে পারছিল কি? না, তারা তা সহ্য করতে পারছিল না। তারা চাইছিল দানীয়ুব যেমন মন্থর গতিতে কৃষ্ণ সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে তারাও তেমনি একদিন দানীয়ুবের মত মন্থর গতিতেই কৃষ্ণ

সাগরে পৌঁছবে। এই চলার পথে দাঁড়িয়েছিল বৃটিশ আর ফ্রেঞ্চ। সেজন্য জার্মানরা এই দুটি জাতকে অন্তর থেকে ঘৃণা করত। মিঃ টড্ হোটেলের রুম ঠিক করার সময় সেকথাটাই আমাকে বলে নিজের রুমে বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন। আমার কিন্তু বিশ্রামের সময় ছিল না, জার্মাণী দেখার জন্যে উতলা হয়ে উঠছিলাম। ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। গ্রাম দেখতে বের হলাম। গ্রামের লোক কেমন করে গ্রাম্য জীবন কাটায় তাই ছিল আমার দেখার উদ্দেশ্য। একটি বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বেশ মধু তৈরী হচ্ছে। মধু চাওয়াতে জার্মান মহিলা একটি কাঁচের পাত্রে করে একটু মধু খেতে দিলেন। বেশ সুন্দর সুমিষ্ট মধু। দাম দিতে গেলে তা নিলেন না, 'ধন্যবাদ জানিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। কোথায় ফ্যাসিস্ট জার্মাণী ? এই কি ফ্যাসিষ্টের লক্ষণ ? রুশ রমণী আমার কাছে থেকে দইএর দাম যেমন নেয়নি, জার্মান রমণীও মধু খাইয়ে একটি পয়সাও নেয়নি। ভুল করেছি। এটা জার্মাণী নয়, এটা চেকোশ্লোভাকিয়া।

রাতে একটি পারিবারিক হোটেলে গিয়ে খেলাম। ...সু সিদ্ধের কি সুগন্ধ ! মাখন আর রুটি হতে টাটকা গন্ধ এসে নাকে ... লেগে ক্ষুধা এত বাড়িয়ে দিয়েছিল যে দ্বিগুণ খাদ্য খেয়েও আ... খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। চেকদের মত হজবজ করে খাবার পদ্ধ... এদের নাই। যা খায় তা সবই সুসিদ্ধ এবং পবিত্র। রাত্রের খা...র খেয়ে যখন হাইল হিটলার বলে চলে আসছিলাম তখন পথে দেখা হল একটি লোকের সংগে। লোকটি ছিল হোটেলের মালিক। সে আমার সাথীকে কি বল্লে। সাথী আমাকে জানিয়ে দিলেন যে "হাইল হিটলার" যদি আমার মুখ হতে পুর্ব্বে তিনি শুনতেন তবে অন্য রকমের খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। সাথীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখেরও

পরিবর্তন হয়েছে। সাথী আমাকে বল্লেন হিটলার এবং তার দলের লোক হলেন সোভিয়েটের শত্রু, প্রকৃত পক্ষে হিটলার বৃটিশের সংগে মিলে মিশেই পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ চালাতে চান। এতে আপনাদেরও মঙ্গল হবেনা। এখন থেকে বুঝে চলবেন হাইল হিটলার শব্দটি সর্ব্বনাশা।

ভারতে অভিবাদনের ভেতর দিয়ে যেমন লোকের ধর্ম্মমত বুঝতে পারা যায় এদিকে ঠিক তেমনি অভিবাদনের ভেতর দিয়েই লোকের রাষ্ট্রনৈতিক মত বুঝতে পারা যায়। ঠিক করলাম আর হাইল হিটলার বলব না, এখন থেকে দেশের কথা নমস্কার বলে হাতটা উচু করে দেব, এর বেশি নয়। পরের দিন সকাল বেলা সাথী টড্‌কে যখন নমস্কার বল্লাম তখন টড্ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর মানে? এর মানে আর কিছুই নয়, আমার নিজের দেশের প্রথামতেই বিদেশীকে সম্মান দেখাব, বিদেশে পলিটিক্স করতে আসিনি, বিদেশের পলিটিক্স জানতে এসেছি মাত্র। টড্ একটু হেসে বল্লেন, এতেও ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি রয়েছে। যাক জার্ম্মাণী আর বেশি দূরে নয়, সেখানে গিয়ে কয়দিন আপনার দেশের প্রথা চালিয়ে যদি ভিক্ষা না পান তবে হাইল হিটলারই বলতে থাকবেন। আমি এসম্বন্ধে আর কথা না বলে পথ চলতে আরম্ভ করলাম।

এদিকে পথ ভয়ানক উঁচু নীচু। আল্পস্ পর্ব্বতেরই একটি শাখা পূর্ব্বদিকে রওয়ানা হয়ে কৃষ্ণসাগরে গিয়ে ডুব দিয়েছে। এই পর্বতটা ডিঙিয়ে যেতে পারলেই সর্ব্বত্র ঢালু সমতল ভূমি পাব। এদিকের পথও খারাপ। মরভিয়ার সরকার পথগুলির উপর মোটেই দৃষ্টি রাখছিল না। রাখবেই বা কি করে? সকলেই ভাবছিল একটা পরিবর্তন আসছে, সেই পরিবর্তনের ঠেলায় কে কোন দিকে সরে পড়বে

তার কি ঠিক থাকবে? দুর্গম পথে সারাদিন পেডেল করে (LEIT MERITZ) লেট্-মেরিট নামক শহরে পৌঁছি এবং একটি ছোট্ট হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করে বাইরে যাই এবং সামান্য খাদ্য খেয়ে শুয়ে থাকি। পথে ভয়ানক পরিশ্রম হয়েছিল বলেই উভয়ের একই অবস্থা হয়েছিল।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি শহরটি সৌন্দর্যে ভর্ত্তি। শহরের দুদিকের ফুটপাথে বৃক্ষরাজির পত্রবৃন্ত মৃদুমন্দ বাতাসে সামান্য হেলেদুলে ফের ধীর স্থির হয়ে থাকে। বৃক্ষরাজির নীচে বসে নানা রকমের লোক কাফি, সরবত এবং সুমিষ্ট খাদ্য খায়। সেইরূপ একটি কাফেতে গিয়ে বসলাম। কাফের সামনে দুটি বৃক্ষ একটি বৃক্ষের শাখাগুলি ফরাসী ধরণে ছেঁটে দেওয়া, অপরটির শাখাগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে চলছিল। গাছের নীচে বসে যারা খাবার খাচ্ছিল তারা এ্যাংলো সেকসন সভ্যতা এবং ফরাসী সভ্যতা নিয়ে কথা বলছিল। টডের আদেশে ভিক্ষাপত্রগুলি বিতরণ করে, কে কি দিল তা কুড়িয়ে নেবার সময় হঠাৎ একটি লোক আমার পেছন দিক হতে হাতের পোষ্টকার্ড (ভিক্ষাপত্রগুলি) ছিনিয়ে নিয়ে খণ্ডখণ্ডি করে কি বল্ল। টড্ কাছেই ছিলেন। তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটির মতলব কি? তিনি কাছে এসে বল্লেন, এটা চেকোস্লোভাকিয়া নয়, এটা সুডেটেন। এখানে জার্মান ভাষায় ভিক্ষাপত্র বিলি করতে হবে। তৎক্ষণাৎ তাকে বল্লাম, যদি তার জার্মাণ ভাষায় এত প্রীতি থাকে, তবে সে আমার পোষ্টকার্ডগুলি জার্মাণ ভাষায় ছাপিয়ে দিক না, তবেই সকল গণ্ডগোল হতে আমি রেহাই পাই। টড্ লোকটিকে কি বল্লেন, এতে লোকটি ঘাড় নেড়ে আমার কথায় সম্মতি জানালো। শুধু তাই নয়, পরের দিন এখানে থাকার খরচ বাবদ দশটি 'করোনা'ও দিল।

পরের দিন ঐ লোকটিই আমার ভিক্ষাপত্রগুলি ছাপিয়ে এনে দিয়ে আরও একটি করোনা আমার হাতে দিয়ে হাইল হিটলার বলে বিদায় নিল। আমি লোকটির ব্যবহারে বড়ই সুখী হলাম, কিন্তু আমার সে সুখে টড্ বাদ সাধেন। তিনি আমাকে বলেন, এতেই বুঝতে পেরেছেন, জার্মাণদের ভেতর কত বড় ভাষাগত "ফেনাটিসিজম" প্রবেশ করেছে। মনে করবেন না, লোকটি আপনাকে সাহায্য করেছে। সে সাহায্য করেচে তার ভাষাকে। এর বেশি আপনার কিছুই বুঝতে হবেনা।

এই শহরটিতে কয়েক জন মাত্র চেক বাস করত। যারা ছিল তারা সকলেই ছিল সরকারী কর্ম্মচারী। নিজের দেশে যদি কেউ নিজের ভাষার প্রচলন দেখতে চায় তবে দোষের কিছুই নাই। টডের কথায় আমি বিশেষ মন দেইনি দেখে টড দুঃখিত হন। আমি কিন্তু তাতে মোটেই দুঃখিত হইনি।

পরের দিনটাও আমাদের শহরেই থাকতে হয়েছিল। কোথাও ভিক্ষা করতে না গিয়ে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয় দেখবার জন্য বের হই। সর্বপ্রথমই একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে এক জন শিক্ষকের সংগে দেখা করি। লোকটিকে দেখতেই মনে হয়েছিল সে ভয়ানক প্রকৃতির লোক। তার নীল চোখের চারিদিক ছিল রক্ত রঙীন্ আভা। মুখের গঠনটা অনেকটা সিম্পানজীর মত। কিন্তু যে মুহূর্তে তাকে আমি হাইল হিটলার বলে সম্বোধন করলাম, তখনই তার মুখের আকৃতি অনেক কিছুটা মানুষের মত হ'ল। সে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আমার সংগে করমর্দ্দন করলে এবং প্রত্যেক ক্লাসে আমাকে নিয়ে গিয়ে কি বলতে থাকে। তার আদেশে প্রত্যেকটি ছেলে ফ্যাসিষ্ট প্রথায় এক সংগে হাত বাড়িয়ে দিয়ে "হেইল" বলে চিৎকার করে। তখনও "হেইল হিটলার" চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবর্তিত

হয়নি, শুধু "হেইল" মানে জয় শব্দটিরই প্রবর্ত্তন হয়েছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন পুনরায় ইউরোপে গিয়েছিলাম তখন হেইল শব্দটি লম্বা হয়ে হেইল হিটলারে পরিণত হয়। তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার মরভিয়া এবং বহিমিয়া জার্মান প্রটেক্টোরিয়েটে পরিণত হয় এবং শ্লাভাকিয়া নামত স্বাধীন থাকে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইউরোপে পৌঁছুবার পর সবই নূতন অনুভব করছিলাম কারণ তখন সর্ব্বত্র শান্ত এবং নিস্তব্ধ ছিল। এটাই ছিল যুদ্ধের পূর্ব্ব লক্ষণ। মেমেল তখন দখল হয়নি। তখনও ডেনজিগ পোলরা দখল করে রেখেছিল। তখন ইউরোপের সর্ব্বত্র একটি মাত্র পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল এবং সেটি হল ইহুদী বিতারণ। প্যালেস্টাইন হতে বিতারিত ইহুদীরা ইউরোপে যাবার পর শুধু টাকার খেলাই খেলতে শিখেছিল, জাতের গঠনের দিকে একটুও তাকায় নি।

সেদিন ছিল রবিবার। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি দলে দলে চেক অফিসার গির্জার দিকে চলেছে। সকলের পরনেই সুন্দর পোষাক। জার্মানরা কিন্তু কেউ গির্জার দিকে যাচ্ছিল না। তারা প্রকাশ্যেই বলত, যে ধর্মের মূলে রয়েচে এক জন ইহুদী তার ধর্ম মন্দিরে গিয়ে কি হবে? জার্মানরা যদিও গির্জায় যাচ্ছিল না, তবুও তাদের দোকান পাট বন্ধ ছিল। তারা সকালে উঠেই নানারূপ খাত্য খেয়ে বড় বড় রেস্তরাঁ গুলিতে ভীড় জমাচ্ছিল। বার্লিন হতে রেডিও বেজে উঠছিল। তালে তালে যুবক যুবতী পথে, রেস্তোরাঁয় নাচতে আরম্ভ করছিল। সুযোগ পেয়ে আমিও ভিক্ষাপত্র নিয়ে বের হয়ে পরি। আমারও রবিবারে ভ্রমণ করতে ইচ্ছা হ'ত না। শনিবার রাত্রে ছাপানো পোস্ট-কার্ডগুলি পেয়ে বড়ই সুবিধা হয়।

সুডেটেন্ এলাকায় এসে ভুলে গিয়েছিলাম আমি একজন বিদেশী।

আমাকে সকলেই সাহায্য করছিল এবং যখনই কোনও এক বিষয় জানতে চেয়েছি তখনই বয়স্ক জার্মাণগণ আমাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়ে দিয়ে সুখী করেছিলেন। আমার বিরুদ্ধ মত পোষণ করার অথবা জার্মাণদের ঘৃণা করার মত কিছুই ছিলনা। বরং যখনই চেক অফিসার-দের দেখতাম তখনই নিজের দেশের সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক ঘৃণার ভাব বলবৎ রয়েছে সেই ভাবটি আপনি এসে মনের কোণে আঘাত করত আর চেক অফিসারদের বিরুদ্ধে আপনি ঘৃণার ভাব ফুটে উঠত।

সেদিনটি আরামে কাটিয়ে পরের দিন টড্-কে নিয়ে টেপলিজ (Teplitz) নামক স্থানে যাই। সেদিন আমরা মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার ভ্রমণ করি। পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার ভ্রমণ করতে আমাদের যে কষ্ট হয়েছিল এর আগের দিন তার দ্বিগুণ পথ ভ্রমণ করতে আমাদের তত কষ্ট হয় নি। টেপলিজে এসে আমরা একখানা ছোট জার্মাণ হোটেলে স্থান নিই। টড্ বলেছিলেন—এই স্থানটাও চেকদেরই তবে আমরা তার নাম পরিবর্ত্তন করে টেপলিজ করেছি। টডের কথা শুনে তাকে বল্লাম, এই পৃথিবীটাই পরিবর্তনশীল। আজ যা জার্মাণদের আছে কাল হয়ত থাকবে না, সেজন্য এসব নিয়ে আমি চিন্তা করি না।

চেকোস্লোভাকিয়ার শেষ শহর টেব্লিজে এসে মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এই ভেবে যে আগামী কল্য সকাল বেলা খাস জার্মাণীতে পৌঁছুব। ইউরোপের একটা দেশের ভ্রমণ শেষ হবে, আর অন্য আর একটি দেশের ভ্রমণের হবে আরম্ভ, তা কি কম আনন্দের বিষয়? হের টড্ অর্থাৎ যাকে মিস্টার টড্ বলা হয়েছে এখান থেকেই আমার কাছ থেকে নেবেন বিদায়।

টড্ ছিলেন জার্মাণ সোসিয়েলিস্ট। তাঁর কথা বেশ ভাল লাগত।

তাঁর কথায় দার্শনিক ভাব ছিল, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল। জার্মাণীতে যাবার পর যাদের আমি কমিউনিষ্ট বলে ভুল করতাম, তারাই ছিল সোসিয়েলিস্ট। সোসিয়েলিস্টরাই বৃটিশ, আমেরিকান এবং ফ্যাসিষ্টদের সাহায্য করে হার হিটলারের জন্ম দিয়েছিল। ইংলণ্ডে যাবার পর একজন ইংলিশ কমিউনিস্ট বলেছিলেন, সোসিয়েলিস্টরা কমিউনিস্টদের মুখোস পড়ে কমিউনিস্টদের প্রতি যেমন অত্যাচার করেচে, তেমনটি আর কেউ করেনি। জার্মাণী তার প্রমাণ।

লুসাটিনা

চেকোস্লোভাকিকার সীমান্ত পার হয়ে জার্মান সীমান্তে পৌছলাম। আমার কাছে কতকগুলি চেকোস্লোভাকিয়ার মুদ্রা ছিল। মুদ্রাগুলি বিনিময় (একস্‌চেন্‌জ্) করার জন্যে এক জন জার্মান একস্‌চেন্‌জারের কাছে যাবার পর লোকটি বললে ওদিকে অর্থাৎ চেকোস্লোভাকিয়ার বিনিময়কারীর কাছে যদি করোনা (Corona) গুলি দেন ত বেশী জার্মান মার্কস পাবেন, আমি আপনাকে জার্মান মার্কস কম দেব। জার্মান অর্থবিনিময়কারীর কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না, তবুও ওদিকে গেলাম। চেকোস্লোভাকিয়ার দিকের মুদ্রাবিনিময়কারী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সে করনার দাম জার্মান এলাকা হতে বেশি দেবে। তৎক্ষণাৎ করোনাগুলি পরিবর্তন করলাম এবং জার্মান সীমান্তে ফিরে এলাম। বৃটিশ, জাপানী, আমেরিকান, ফরাসী এমন কি ঘরের

পাশের আফগানদের মধ্যেও কিন্তু এরূপ উপদেশ পাওয়া যায় না। জার্মান তরফের লোকটির এরূপ উপদেশ দেবার একটি কারণ ছিল। যে লোকটি অর্থবিনিময়ের কাজ করত সে জার্মান ছিল না, সে ছিল লুসিটানিয়ান্, জার্মানদের পরম শত্রু। জার্মানীর সংগে শত্রুতা করার তার কারণও ছিল।

করোনাগুলি বদ্‌লি করে পুনরায় যখন জার্মান সীমান্তে গিয়ে ম্যাপের নির্দেশ মতে পথ ধরলাম তখন এক জন জার্মান পুলিশ এসে আমাকে থামাল এবং জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় যেতে চাই, তাকে বল্লাম, আমার গন্তব্য স্থান ড্রেসডেন। লোকটি একটি পথ দেখিয়ে বলল, এই পথে সাইকেল পেডেল করতে হবেনা, একেবারে উৎরাই। তার কথায় আস্থা স্থাপন করে এগিয়ে চল্‌লাম। দেখলাম লোকটি যা বলেছে তা আমার উপকারের জন্যই। পথ সবটাই উৎরাই। পেডেল মোটেই করতে হয়নি।

পথে কয়টি শ্রীহীন গ্রাম দেখতে পেলাম। গ্রামগুলি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। গ্রামের চারদিকে পাইন গাছের বন। ঘরগুলির দরজা বন্ধ। শিশু অথবা কিশোর একটিও বাইরে খেলছিল না। দিনও তত ঠাণ্ডা ছিল না যাতে সকলেই ঘরের ভেতর থাকতে বাধ্য হয়। প্রথম গ্রামে কয়েকজন ধূর্ত প্রকৃতির পুলিশ দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে ভাবছিলাম হয়ত এরা এখানে কিছু অনুসন্ধান করছে। সেখানে ইচ্ছা করেই দাঁড়ালাম এবং একটি ঘরের দরজা ঠেলে প্রবেশ করলাম। হেইল হিট্‌লার বলে একখানা চেয়ারে বসে কাফি আনতে বল্‌লাম। আমার হেইল হিটলার সম্বোধনে কেউ জবাব দিলনা। একজন প্রৌঢ় মহিলা কাফির পরিবর্ত্তে এক গ্লাস বিয়ার এনে টেবিলে রাখলেন। বিয়ার খাওয়া আমি পছন্দ করতাম না। বিয়ার খেলে শরীর সবল না হয়ে

দুর্বল হ'ত! সেজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, কাফি নাই কি? স্ত্রীলোকটি বললেন, দুধ নাই সেজন্য কাফি দেননি। বাইরে দুজন পুলিস আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। এদের ধূর্ত মনোবৃত্তি আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়াই ভাল মনে করলাম।

কতক্ষণ যাবার পর একটি খালের কাছে পৌঁছি। খালের উপর সেতু ছিল। সেতুটি লোহার তৈরী। ইচ্ছা হল নিরিবিলি স্থানে বসে একটু বিশ্রাম করি। পাইন বৃক্ষরাজি এত ঘন ছিল যে সূর্যালোক একটুও খালের উপর পড়ছিল না। আমি যখন বিশ্রাম করছিলাম তখন দেখতে পেলাম একজন লোক খালে সিমেণ্ট দিয়ে পাটাতনের মত কিছু করছে যাতে খালে জল না জমতে পারে। এটা হল পার্বত্য খাল, এটাকে বাঁধিয়ে ফেলা হচ্ছে দেখে আপনা হতেই নিজের দেশের খালের কথা মনে পড়ল। আমরা কাদায় জন্মি কাদাতেই মরি। আমরা সিমেণ্ট চোখেও দেখি না সেজন্য আমরা এবং আমাদের সভ্যতা দায়ী না শাসক শ্রেণী দায়ী তাই ভাবছিলাম। এমনি সময় লোকটি কাজ পরিত্যাগ করে আমার কাছে এল এবং আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আমি তাকে আমার একখানা জার্মাণ ভাষায় লিখিত পরিচয় পত্র দিলাম। সে পরিচয় পত্র হাতে নিয়ে একটু দেখে বলল যে জার্মাণ ভাষা জানে না, জাতে সে চেক, যদি চেক ভাষায় কোন কিছু থাকে তবে তা সাদরে গ্রহণ করবে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম আমি যে এলাকায় বসে আছি এই এলাকার বাসিন্দা সবাই চেক্। তারা বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তাদের কি যে কষ্ট তা জিজ্ঞাসা করিনি। পিঠঝোলা হতে চেক ভাষায় ছাপানো একখানা পরিচয় পত্র তার হাতে দিয়ে স্থান ত্যাগ করি। লোকটা ইংলিশ জানত। এর পরেও আরও দুটি গ্রাম পথে পড়েছিল। সে গ্রামদুটির অবস্থাও খারাপ বলেই মনে

হচ্ছিল। কারো মুখে হাসি ছিল না। সকলেই আপন আপন কাজ করছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না এই গ্রামবাসিদের এরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থা কেন? তারপরই সমতল ভূমি। পথ প্রশস্ত। জার্মান গ্রাম পথে এল। গ্রামে সজীবতা বিরাজমান। এদের সজীবতা দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কে থাকতে চায় এই মৃতদের গ্রামে। কিন্তু পরে জেনেছিলাম এরা স্বইচ্ছায় মরার মত থাকছে না। জার্মাণ রাজশক্তি এদের আধমরা করে রেখেছে। আঘাতের পর আঘাত চলছে। এদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বাস করতে দেওয়া হচ্ছে।

মানুষ পশুভাব ধারণ করে যখন সে সর্বত্র নির্য্যাতিত হয়। অষ্ট্রিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার সর্বত্র জার্মাণদের নানা রকমে নির্যাতন করা হ'ত। চোকোস্লোভাকিয়ার সুডেটেন এলাকায় জার্মাণদের যদিও সংখ্যাধিক্য ছিল তবু তাদের চেক অফিসারদের অনর্থক হাকমি ভুমকি শুনতে হ'ত। তারই প্রায়শ্চিত্ত এই ছোট্ট গ্রামবাসীরা করছিল। এই কখানা গ্রামের লোক নাকি চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা জানিয়েছিল, এবং তারা জাতেও নাকি চেকই ছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্রশক্তির কর্মবীরগণ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন। প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করার কারণও ছিল—চেকোস্লোভাকিয়া এই ক্ষুদ্র এলাকাটিকে রক্ষা করতে পারবে না। ধরিবাজ সাম্রাজ্যবাদিরা চেকোস্লোভাকিয়াকে স্বাধীন করেও নিশ্চিন্ত ছিল না, তারা জানত, জার্মাণ জাতকে কষ্টের ভেতর দিয়ে পশুভাবাপন্ন করে একদিন ওদের সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে হবে। চেকোস্লোভাকিয়া যেদিন জার্মাণরা দখল করে সেদিন জার্মাণীর মামুলী লোক ফ্রেন্চ অথবা বৃটিশদের সামনে দেখতে পাইনি, তারা চেকদেরই সামনে দেখতে পেয়েছিল এবং প্রতিশোধও চেকেদের উপরই নিয়েছিল। এমনও এক সময় চলে গেছে যখন লুসাটিনার লোক

জার্মানদের প্রতি সদয় ব্যবহার করত এবং নিজেদের জার্মাণ বলে পরিচয় দিত, কিন্তু বৈদেশিক আবহাওয়া পরিবর্তন হওয়াতে জার্মানরাও লুসাটিনা-বাসীদের প্রতি কুব্যবহারই করতে শুরু করে দিয়েছিল। লুসাটিনা-বাসীদের বদান্যতা জার্মাণরা ভুলে গিয়েছিল।

পথ চলার সময় ভাবছিলাম, এর প্রতিকার কেমন করে হয়! প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু কে কার কথা শুনে। লুসাটিনার সংগে আমাদের কোন জনপদের সাদৃশ্য আছে কি না তাও ভাবছিলাম। অতীত চিন্তা করে উত্তর পেয়েছিলাম, ভারতবর্ষে একটিও লুসাটিনা নাই। লুসাটিনার হয়ত ভারতে জন্ম হবে, কিন্তু তার জীবন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা স্বাধীন ভারতের আভ্যন্তরিক পুঁজিবাদ লোপ পাবার সংগে সংগেই ভারতীয় নব নির্মিত লুসাটিনার মৃত্যু হবে।

লুসাটিনাদের কি সুন্দর শরীরের গঠন, এরা কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তবুও এদের সুখ শান্তি নেই কারণ এরা বৃন্তচ্যুত হয়ে কণ্টকে পড়েছে। কণ্টক যখনই সুবিধা পাচ্ছে তখনই এদের হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে ধ্বংস করছে।

বর্তমানে ভারতে সংবাদ এসেছে, লুসাটিনার অধিবাসীকে হার হিটলার অন্যত্র স্থানান্তরিত করছেন। অনেক শিশুকে Experiment House এ নিয়ে গিয়ে নাকি হত্যা করাও হচ্ছে। এক পশু শক্তি যখন অন্য পশু শক্তির সংগে প্রাধান্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে তখন এমনি হয়ে থাকে। নূতন তাতে কিছুই নেই। সেখানে শিশু হত্যা হয়, বৃদ্ধকে ঠেসে মেরে ফেলা হয় এবং নারীর নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয় সেখানে পশুভাব ছাড়া আর কি থাকতে পারে? সাম্রাজ্যবাদ তা অম্লান বদনে আস্কারা দেয় এবং কার্য্যসিদ্ধি করতে বদ্ধপরিকার হয়।

ড্রেসডেন

বিকালে ড্রেসডেন পৌঁছি। ড্রেসডেন মস্তবড় সহর। এত বড় সহর প্রথম দিনই বেড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে হল না। থাকবার স্থানই খুঁজে বের করা দরকার মনে করলাম। অনেকগুলি হোটেলে গিয়ে সস্তায় কোথাও রুম পেলাম না। অবশেষে একজন পুলিশের স্মরণাপন্ন হলাম। সে আমাকে হিটলার ইয়থ লিগের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছে পরিচয় করে দিল। সেক্রেটারি বেশ ভাল ইংলিশ বলতে পারতেন। তিনি আমাকে পর্য্যটক রূপেই গ্রহণ করেন।

কতক্ষণ চিন্তা করে এমেরিকানদের ধরণে আঙ্গুলে তুড়ি দিয়ে বল্লেন, ঠিক হয়েছে। স্থান দিতে পারব কিন্তু আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে, পারবে ত? জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের নিয়ম কি বলুন? তিনি বল্লেন, দিনে ঘুমাতে পারবেন না। রুম হতে সকাল নটার সময় বেড়িয়ে যাবেন আর বিকেল সাতটার সময় রুমে প্রবেশ করতে পারবেন। সিগারেট খেতে পারবেন না। কারো সংগে কোনরূপ মেয়েলোক সম্পর্কিত কথা বলতে পারবে না, "You know what I mean" বলেই চোখের ইংগিতে কথা শেষ করলেন। সেক্রেটারী মহাশয়কে অতি ভদ্র এবং অতি নম্রভাবে বল্লাম, আমি আপনাদের এখান থেকে দুদিন পরই চলে যাব। আমার শরীর দুর্ব্বল। আপনার শেষোক্ত আদেশই শুধু পালন করতে পারব, অন্যগুলি পালন করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। সেক্রেটারী কি চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা তাই হবে, বলেই আমাকে নিয়ে রুমের দরজা খুলে দিলেন।

রুমের দরজা খুলে দেবার পর দেখতে পেলাম, রুমটাতে এক শত কুড়ি জন লোকের শোবার বন্দোবস্ত রয়েছে। ভদ্রলোককে আর কোন কথা না বলেই, সাইকেল নিয়ে রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার প্রচলিত নিয়ম মতে গা হতে জামা খুলে বেশ করে মাসাজ করলাম তারপর কয়েকটা বৈঠক করে একটি বিছানায় শুয়ে থাকলাম।

তখনও অনেক বেলা ছিল। বিশ্রাম করে বাইরে এসে হিটলার ইয়থ লিগের বাড়িটি দেখতে আরম্ভ করলাম। আমাকে যে রুমটি দেওয়া হয়েছিল সেরূপ একশটি রুম সেই বাড়িটিতে ছিল। স্নানাগার এবং পাইখানার ব্যবস্থা সে অনুপাতেই ছিল। পাচকদের রুমটি বেশ বড়। সেখানে চার জন পাচক চার রকমের খাদ্য তৈরী করছে। সুপ, মাংস ভাজা, এবং প্রচুর পরিমাণে রুটি-মাখন জমা ছিল। এক দিকে একটা প্রকাণ্ড কাঁচের হাড়িতে কাফি সিদ্ধ হচ্ছিল।

তারপর গেলাম খাবারের ঘরে। সেখানে একটি তের চৌদ্দ বৎসরের ছেলে রুটি মাখন এবং সুপ খাচ্ছিল। পাশেই এক পেয়ালা দুগ্ধ বিহীন কাফিও ছিল। ছেলেটিকে দেখে তার প্রতি আমার স্নেহ হয়। সে ছিল দুর্ব্বল। তার সাদা হাতে নীল বর্ণের নাড়ীগুলি ভেসে উঠছিল। ছেলেটি নীরবে খাচ্ছিল এবং আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তার দিকে বেশিক্ষণ না তাকিয়ে বাইরে গেলাম এবং একটি বসবার স্থানে বসে ভাবতে লাগলাম, ইউরোপে এরূপ হচ্ছে কেন?

সাতটা বেজে গেছে। দলে দলে কিশোর এবং যুবক হিটলার ইয়থ লিগে ফিরতে আরম্ভ করেছে। তারা সবাই পরিশ্রান্ত এবং অভুক্ত। এদের মলিন মুখ দেখে প্রাণে বেশ আঘাত লাগছিল। বেশিক্ষণ বাইরে বসে থাকতে ভাল লাগল না, রুমে ফেরার পথে দেখা হল সেক্রেটারির

সংগে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখলেন?

ক্লান্ত কিশোর এবং যুবকের দল ফিরে আসছে। তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, তারা খাদ্য চায়, তাদের জন্য কি খাবার তৈরী হয়েছে? তারা কি পেট ভরে খেতে পাবে?

পেট ভরে খেতে না পাক, কিছুটা পাবে, শোবার উত্তম বিছানা পাবে, এর বেশি আর কি?

আপনাদের দেশ এত দরিদ্র কেন?

আপনাদের প্রভুদের অনুগ্রহে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ধন্যবাদ বলে অন্য কথার অবতারণা করলাম। কথার মোড় ফেরাতে দেখে সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ কথার মোড় ফেরালেন যে?" আমি নিরুপায় হয়ে তখন বললাম, "আপনি বৃটিশ স্পাইও হতে পারেন, বৃটিশ সম্রাজ্যবাদীরা আমাদের বন্ধু নয় এটা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, এখন দেখছি আপনিও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষেই কথা বলছেন।"

সেক্রেটারী বললেন, সাধে কি আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। জগতের যত ভাল ভাল জিনিস তৈরী করব আমরা আর বিক্রি করবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী। আমাদের তৈরী মাল দেড়া দামে বিক্রি করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ফেঁপে উঠেছে, আর আমাদের দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে।

সেক্রেটারী মনের দুঃখে আধমরা হয়ে ছেলেদের খাবারের ঘরে গেলেন। আমিও তার সংগে গেলাম। দেখলাম হাজারো ছেলে একত্রে বসে খাচ্ছে কিন্তু একটু শব্দ হচ্ছে না। ছেলেদের উদেশ্য করে সেক্রেটারী গোনার দশটি শব্দ উচ্চারণ করে হেইল হিটলার বলে বিদায় নিলেন। আমি বিদায় না নিয়ে ছেলেদের সংগে বসে খেলাম

এবং পেট ভরা খাদ্যের জন্য অর্দ্ধ মার্ক দিলাম। এখানে "টিপ" দেওয়া নিষেধ সেজন্য "টিপ" দেইনি। আধমার্ক দিয়ে যে খাবারটুকু পেয়েছিলাম, বাইরে কোনও রেস্তোরাঁয় তত সস্তা খাদ্য পাবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা।

সকলের খাওয়া আটটার মধ্যেই শেষ হয়। খাবার শেষ করে ছেলেরা যাকেই সামনে পেল তাকেই হেইল হিটলার বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত সাড়ে নটার মধ্যে বাড়িটা নিস্তব্ধ হল। দেশলাই জ্বালালে পাছে পাশের রুমের ছেলেদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেজন্য আমি একটা সিগারেটের আগুন দিয়ে অন্য সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম, তারপর কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। মন দিয়ে লিখছিলাম। রাত্র গভীর, হঠাৎ দরজায় কে টোকা দিল। যে অবস্থায় আমি লিখছিলাম সেই অবস্থায় কাগজগুলি রেখে দরজা খুলে দিলাম। সেক্রেটারী চোরের মত রুমে প্রবেশ করে বললেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার কাছ থেকে কটি কথা জিজ্ঞাসা করতে আসছি। প্রশ্নগুলির জবাব দু এক কথার মধ্যে দেবেন। আমাদের পুলিশ বিভাগ আপনার কাছ থেকে সেই প্রশ্ন গুলি জিজ্ঞাসা করে আজই তাদের জানিয়ে দিতে বলছে।

প্রথম প্রশ্ন :—জার্মেনীতে প্রবেশ করার সময় আপনার কাছে কত মার্ক ছিল এবং এখন কত আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন :—আপনার ভিক্ষা পত্রে যে সকল দেশ ভ্রমণ করেছেন—সেই দেশগুলিতে যে গিয়েছেন এবং ভ্রমণ করেছেন তার অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না? তৃতীয় প্রশ্ন :—আপনার ভ্রমণের খরচ কোথা হতে পান?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—চৌদ্দ মার্ক, এক পাউণ্ডের চার খানা নোট। তিনটি অষ্ট্রিয়ান্ শিলিং, দুটি হংগেরীর পেংগো, পাঁচ রিয়েয়েলের এক

খানা ইরানী নোট, দশ ডলারের একখানা চীনা নোট, ভারতীয় একটি চার আনার শিকি, সিংগাপুরের এক ডলারের একখানা নোট এবং জারের আমলের এক শত রুবুলের একখানা নোট।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—অটোগ্রাফ বই এবং প্রেস কাটিং।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—ভিক্ষা।

অটোগ্রাফ বইখানা সেক্রেটারী মহাশয় অনেকক্ষণ দেখে মন্তব্য করলেন—এতে একটিও বড় লোকের অটোগ্রাফ নাই, এমন কি ভারতের নেতা মহাত্মা গান্ধিরও অটোগ্রাফ নাই। মন্তব্যের উত্তর আমি দেই নি। তারপরই সেক্রেটারী আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, ফুরারের অটোগ্রাফ পাবার জন্য বোধহয় চেষ্টা করবেন?—না মহাশয়, আমি কোনও বড় লোকের অটোগ্রাফ নেবার জন্য সময় নষ্ট করি না। বড় লোকের কাজ দেখে যাওয়া পছন্দ করি। আমার কথা শুনে সেক্রেটারী মহাশয় কি ভেবেছিলেন তা জানি না, শেষটায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কমিউনিষ্টদের মত পোষণ করেন? চটপট করে জবাব দিলাম, এ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। সেক্রেটারী মহাশয় উত্তর শুনে সুখী হলেন।

পরের দিন সকাল বেলা, কুড়ি লক্ষ নরনারীর অধ্যুষিত ড্রেসডেন নগর ভ্রমণে বের হলাম। একজন নাজি অফিসার আমাকে শহর দেখাতে বের হয়েছিল। অনেক বড় বড় গির্জা এবং বিল্ডিং দেখালেন। একটি গির্জা অথবা বিল্ডিংয়ের ভেতর গেলাম না। শহর গঠনের পরিপাট্য দেখেই সুখী হলাম। দুপুর বেলা আমরা একটি বাগিচায় আসি। বাগিচায় অনেক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা আরাম কেদারায় বসে কাফি খাচ্ছিলেন। বৃদ্ধারা ধীরে গল্প করছিলেন বটে কিন্তু তাদের হাতে উলের সুতা ছিল এবং তাঁরা কিছু কিছু বুনছিলেন। আমাকে দেখা

মাত্র সকলেই আমার দিকে তাকালেন। আমার পরিচয় পত্র সকলকে দিলাম। প্রত্যেকেই আমাকে কিছু দান করলেন। দানের অর্থে দুটা পকেট ভরে গেল। অনেকগুলি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা আমার সংগে কথা বলতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ইংলিশ জানতেন না সেজন্য তাদের সামনে সামান্য হেসে এবং কেশেই বিদায় নিতে হল। ভাবছিলাম হয়ত সংগের নাজী সেপাই আমার কাছে কিছু চাইবে কিন্তু ইয়থ লিগের সামনে এসে, সেই প্রথম আমাকে হেইল হিটলার বলে বিদায় নেয়। অন্যান্য দেশে কিন্তু সেরূপ দেখতে পাইনি। যেই আমাকে সাহায্য করেছে সেই আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়েছে।

অনেকগুলি জার্মাণ মুদ্রা হাতে পেয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। বাইরে গিয়ে খেয়ে এলাম। ফেরার পথে অনেকগুলি ইংলিশ ছেলের সংগে দেখা হয়। আমি যে এক জন ভারতবাসী ইংলিশ ছেলেরা জানত না। তাদের সংগে একটি দক্ষিণ আফ্রিকার ছেলে ছিল। সেই ইংলিশ ছেলেদের জানিয়ে দেয় আমি ভারতবাসী। ইংলিশ ছেলেদের ধারণা ছিল ভারতবাসীরা ধনী এবং দাতা। আমার কাছে কিছু চাইলেই পাবে। ইংলিশ ছেলেরা আমার কাছে শুধু হাত পাতল না, রাত্রে কোথায় থাকবে তার ব্যবস্থা করতেও প্রার্থনা করল। ইংলিশ ছেলেদের মুখপাত্র হয়ে যে ছেলেটি কথা বলছিল সে 'স্যার' অথবা 'প্লিজ' দুটি কথা বাদ দিয়ে কথা বলছিল। তার ভাষার অভদ্রতা দেখে বললাম, "আগে ভদ্রতা শিখে বিদেশী লোকের কাছে সাহায্য পাবার জন্য আবেদন নিবেদন করো, বুঝলে, এখন পথ দেখ।

আমার কথা শুনে নিকটে দাঁড়ানো অন্য ছেলেরা কাছে এসে বললে, স্যার, এই ছেলেটা দক্ষিণ আফ্রিকাতে জন্মেছে, ভদ্রতা এখনও

শিখেনি ওকে ক্ষমা করবেন। অন্যান্য ছেলেদের সংগে একটি ডেনিশ ছেলেও ছিল। সে বললে, দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আসার পর ওর হুস্ হয়নি সে ইউরোপে এসেছে। খরচ চালাচ্ছে ভিক্ষা করে আর স্বপ্ন দেখছে হীরা মুক্তার।

ইংলিশ এবং ডেনিশ ছেলেটির কথায় রাগ উপশম হল। তাদের আমার অনুসরণ করতে বলায় তারা আমার সংগে এসে হিটলার ইয়থ লিগের সামনে দাঁড়াল। ভেতরে গিয়ে ইয়থ লিগের সেক্রেটারীকে ডেকে আনলাম এবং কুড়িজন নবযুবকের থাকবার স্থান করে দিতে বল্লাম। সেক্রেটারী প্রথমে আপত্তি করলেন এই বলে যে, এরা ভাল ছেলে নয়, সিগারেট এবং বিয়ার খায়। এদের কি গরীব ছেলেদের সংগে থাকা সম্ভব হবে? সেক্রেটারীর কাছে এদের স্বভাব ভাল থাকবে বলে আমি জামিন হবার পর, আমার রুমেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

ছেলেরা প্রত্যেকে তাদের নাম ধাম এবং জাত লিখিয়ে দিয়ে বিশ্রামার্থ যখন রুমের দিকে রওয়ানা হল তখন সেক্রেটারী আমাকে বললেন, এত ছোট রুমটা'তে যদি সকলে মিলে সিগারেট খেতে আরম্ভ করে তবে সমস্ত বাড়িটাই বিষাক্ত হয়ে যাবে। আপনাকে সিগারেট খাবার অধিকার পূর্বেই দিয়েছি এবার আর তিনটি যুবককে সিগারেট ব্যবহার করার অধিকার দিচ্ছি। যাদের সিগারেট খাবার অধিকার দেওয়া হল তাদের দেখিয়ে দিলেন। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, ভাবছিলাম বিশেষ অধিকার পেয়ে এরা সুখী হবে, কিন্তু হ'ল বিপরীত। একটু পরেই তিনটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদের মুখ শুকিয়ে যাবার কারণ কি? তিনটি ছেলেই বল্লে, তারা হ'ল ইংলিশ জু। সেজন্যই সিগারেট খাবার অধিকার

পেয়েছে। অনিষ্টকারী সিগারেট ইংলিশরা যদি খায় তবে এংলো সেক্‌সন জাতের ক্ষতি হবে, ইহুদীরা এই বিষাক্ত জিনিস খেয়ে যদি মরে তবে দুঃখ করার কিছুই নেই। হিটলার ইয়থ লীগের সেক্রেটারী মহাশয়ের বৃহত্তর জাতীয় ভাবের পরিচয় পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম।

ইয়থ লীগে থাকা আমার পক্ষে পোষাচ্ছিল না। থাকার কথা যেমন তেমন, খাওয়াটাই একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেজন্য সেক্রেটারী মহাশয়কে অন্য সুবন্দোবস্ত করতে বললাম। সেক্রেটারী মহাশয়ও আমার কথায় রাজি হলেন। যুবকগণ বিদায় নেবার পর সেক্রেটারী মশায়কে সেকথাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বল্লেন, আগামী কাল সে বিষয়ে তিনি একটা হেস্তনেস্ত করবেন।

সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খাবারের ঘরে এসে দেখি কুড়িজন যুবকই খেতে বসেছে। আমিও তাদের কাছে বসে কিছু খেলাম। কিন্তু তাদের মত আকণ্ঠ আলু সিদ্ধ খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। সামান্য মাখন রুটি এবং এক গ্লাস গরম দুধ খেয়েই সন্তুষ্ট হই।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুবকটি ইংলণ্ডে এসে ইংলিশ যুবকদের সংগে ইউরোপে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিল। তারা সকলেই ভিক্ষা করত। তাদের কাছে ফিরে যাবার মত অর্থ ছিল, কিন্তু খেয়ে এবং শুয়ে থাকবার মত অর্থ ছিল না। এদের আর্থিক দুর্দ্দশা দেখে তাদের সংগে ইংলেণ্ডের আর্থিক অবস্থার কথা, হোটেল ভাড়া এবং খাবারের দামের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং আরও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জার্মাণীর মত তাদের দেশেও পর্যটককে তারা আর্থিক সাহায্য করে কি না। প্রত্যেকটি যুবক আমার প্রশ্নের উত্তরে "না"-ই বলেছিল। শুধু ডেনিশ যুবকটি বলেছিল, মহাশয়, আমি ইংলিশ নই, আমি জাতে ডেনিস্। আমাদের

দেশে যদি আপনি যান তবে অর্থের অভাব হবে না। বৃটেনে আমি গিয়েছিলাম, দেখেছি সেখানে কেউ কারোকে ভিক্ষা দেয় না। যদি ভিক্ষা পেতে হয় তবে সময়ের অপব্যবহার যথেষ্ট করতে হয়। ছয় পেনী ভিক্ষা পেতে হলে ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। যুবকটির কথা শুনে আমার জিহ্বা শুকিয়ে গিয়েছিল।

রাত হয়ে গেছে। আমাদের রুমের সকলেই এসে গেছে। আমি তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে কি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল সিগারেট খাবার কথা। দেখলাম সকলেই সিগারেট ফুকছে আর নানা রূপ গল্প করছে। বাতি তখনও জলছিল। হঠাৎ দরজায় এসে কে বেশ জোরের সহিত আঘাত করল। যাদের সিগারেট ব্যবহারের কথা ছিল না তারা সকলেই সিগারেট নিবিয়ে অর্দ্ধভুক্ত সিগারেটের টুকরা লুকিয়ে রাখল। আমরা চারজন সিগারেট ফেলিনি। অন্য এক জন গিয়ে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দেওয়া মাত্র দুজন জার্মান বক রুমে প্রবেশ করল। দক্ষিণ আফ্রিকার যুবকটি জার্মান ভাষা বেশ বলতে পারত। সেই জিজ্ঞাসা করল যুবকদ্বয় কি চায়। জার্মাণ যুবকদ্বয় রুমে সিগারেটের এত ধুঁয়া হবার কারণ জিজ্ঞাসা করল। ইতিমধ্যে একজন ইংলিশ যুবকের লুকায়িত সিগারেটের টুকরা হতে পালকের লেপে আগুন ধরে গিয়েছিল, যুবক লাফিয়ে উঠল। জার্মাণ যুবকদ্বয় তাড়াতাড়ি করে আগুন নিবিয়ে দিয়ে সেই যুবকটিকে বেশ করে কয়েকটা ঘুসি মেরে রুম থেকে সরিয়ে দিল। প্রহৃত যুবক কতক্ষণ পর ফিরে এসে বল্ল তাকে আগামীকল্যই জার্মাণি ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করায় সবাইকে বল্ল চেকোস্লোভাকিয়াই এখন তার গন্তব্য স্থান। সেখানে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

এই যুবকদের নিজের রুমে স্থান দিয়ে লজ্জিত হতে হয়েছিল। সেইজন্য আগামীকল্যই স্থান ত্যাগ করা ভাল হবে বলে ইয়থ্ লিগের সেক্রেটারীর সঙ্গে পুনরায় অসময়ে দেখা করলাম। সেক্রেটারী বল্লেন, দৈনিক যদি তিন মার্ক করে দিতে রাজি হই তবে তিনি সহরের মধ্যস্থলে কোনও প্রুশিয়ান রমণীর গৃহে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি তাতেই রাজি হলাম।

পরদিন সকালবেলা ইয়থ্ লিগের সেক্রেটারীর একখানা চিঠি নিয়ে প্রুশিয়ান্ রমণীর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। তখনকার দিনে ড্রেস্‌ডেনে কুড়ি লক্ষ লোক বাস করত। এতেই বুঝতে পারা যায় ড্রেস্‌ডেন্ একটি বৃহৎ নগরী, এত বড় নগরীতে বাড়ি খুজে বের করা সহজ কাজ ছিলনা। তবুও দুপুরের পূর্ব্বেই যথাস্থানে পৌঁছুতে পেরেছিলাম।

প্রশস্ত রাজপথের একপাশে প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়ির মালিক হলেন সেই প্রুশিয়ান্ মহিলা, তাকে খুজে বার করতে হয়নি। নিচেই বসে ছিলেন। চিঠিখানা তার হাতে দেওয়ামাত্র পত্রখানা ভাল করে পড়ে আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন এবং সুন্দর ও সজ্জিত একটি রুমের দরজা খুলে দিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন, তুমি এ ঘরে থাকবে—বুঝলে?

—হাঁ মেম্, আপনার কথা বুঝতে পেরেছি।

—না বুঝ নাই, বলে আবার মহিলা আমার কাছে বল্লেন, বস ত এই চেয়ারে? চেয়ারে বসবার পর একটু চেয়ে বল্লেন, তোমার দেশ কোথায়?

—ইণ্ডিয়াতে, মেম।

—হাঁ তাই বল, তুমি ইন্দোএরিয়ান্, বস, তোমার জন্য কিছু খাবার

নিয়ে আসি। এই বলেই মহিলা চলে গেলেন। ইতিমধ্যে তার ঘর খানা ভাল করে দেখে নিলাম। মহিলা আমার জন্য এক পেয়ালা কাফি, কিছু রুটি এবং মার্গেরেন (চর্ব্বি) নিয়ে আসলেন। অন্যান্য খাবার খেলাম কিন্তু মার্গেরেণ খেলাম না।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, মার্গেরেণ খেলেনা যে?

—মার্গেরেণ আমরা খাইনা, আমরা মাখন খাই, মেম।

—মাখনের অভাবে কি কখনও মার্গেরণ খাও না?

—কখনই না, মেম। এটা আমাদের অখাদ্য।

—তুমি কি বলতে চাও মার্গেরেণ খাওয়া তোমাদের ধর্ম্মমতে নিষিদ্ধ?

—না মেম, তবে কখনও খাইনি এবং বোধহয় কোনদিন খাবও না।

—সে জন্যই তোমার স্থান এখানে হয়েছে, আচ্ছা এর পরে কি খাবে?

—এই রুটি, মাখন, সব্জি, ভেড়ার মাংস এসব।

—ভেড়ার মাংস বলছ না?

—হাঁ মেম্।

—কেন গোমাংস খেলে ক্ষতি আছে?

—কোন ক্ষতি নাই। তবে অভ্যাস নাই মেম।

—হাঁ বুঝতে পেরেছি, দ্রাবিড় রক্ত শরীরে রয়েছে, সে জন্যই গোমাংস খাবার অভ্যাস নাই। যাকগে তোমার জন্য কোন মাংসেরই ব্যবস্থা করব না।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন, একজন জার্মাণ মহিলা আপনাকে তাচ্ছিল্য করে কথা বললে, আর আপনি নীরবে সহ্য করলেন? কথাটার উত্তরে বলছি, মায়ের জাত, যে কোন জাতের হউক, তাদের তাচ্ছিল্য সূচক কথাও নীরবে সহ্য করি।

মহিলা চলে গেলে একটি সুন্দর ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ল। ছবিটি ছিল একজন যুবতীর। যুবতী ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। তার গলার মুক্তার হার কয়েক লক্ষ টাকার হবে মনে হ'ল। অনেকক্ষণ ছবিটি দেখে শুয়ে পড়লাম। দ্বিপ্রহরে প্রৌঢ়া এসে আমাকে জাগালেন। সেদিন আমার স্নানের দিন ছিল, সেজন্য প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্নান করতে পারব কি?—কেন পারবে না, বাথ রুমে গিয়ে স্নান করে এস, কিন্তু মনে রেখো স্নানের পর স্নানের টাবটি তোমাকেই পরিস্কার করতে হবে, খবরদার কখনও অপরিস্কার রেখে এস না।—না মেম্ তা কি কখনও হয়, বলেই স্নানাগারে প্রবেশ করলাম। পৃথিবীর অনেক স্থানেই অনেক রকমের স্নানাগার দেখেছি কিন্তু প্রশিয়ান্‌দের মত সুন্দর স্নানাগার আর কোথাও দেখিনি। স্নান করে বেশ আরাম পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু স্নানাগার পরিস্কার করে রেখে আসতে ঘাম বের হয়েছিল।

স্নান করে এসেই বেশ করে খেয়ে গিয়ে বের হতে যাব এমন সময় প্রৌঢ়া এসে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। প্রৌঢ়া বল্লেন তিনি জাতে প্রশিয়ান্, জার্মাণদের মত ছোট লোক নন, হিটলার তাঁর যথা সর্বস্ব হরণ করেছে। আজ তিনি আমার পরিত্যক্ত নোংড়া বাসনগুলি পরিস্কার করেছেন। তাঁদের বংশের কেউ নাকি এমন ছোট কাজ করেনি। তাঁর ব্যাঙ্কে একাউন্ট মস্ত বড় ছিল। টাঙ্গানো ছবিটা দেখিয়ে বল্লেন এটা তাঁরই ছবি। তাঁর গলার হার নাৎসীরা কেড়ে নিয়েছে। ঐ যে এত বড় বাড়িটা এটাও তাঁরই। নাৎসীরা বাড়ি ভাড়া আদায় করে তাঁরই নামে ব্যাঙ্কে ভাড়া জমা দেয় বটে কিন্তু তাঁকে এক পয়সা উঠাতে দেয় না। মহিলা চিৎকার করে বল্লেন, কতবড় অন্যায়। তারপরই আবার বলতে আরম্ভ করলেন, আর অন্যায়ই বা

বলি কি করে? পূর্বদিকে বলসেভিকরা জার্মাণী আক্রমণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং পশ্চিমদিকে বৃটিশ এবং ফরাসীরা আমাদের রক্ত মাংস চুষে খাচ্ছে। আমার ইচ্ছে ছিল এমেরিকায় গিয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেই, কিন্তু এখন আর সে সুযোগ পাব না। চারদিকে অরাজকতা আরম্ভ হয়েছে। সেক্‌সনী, চেক্ এবং অন্যান্য জাতের লোককে পিষে মারবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। তারপরই প্রৌঢ়া একদম সিংহীরূপ ধারণ করে বল্লেন, এসব অপকর্মের পেছনে রয়েছে বৃটিশ। বৃটিশের সাহায্য পেয়েই হিটলার এত বড় হতে পেরেছে। আমার শরীরেও ইংলিশ রক্ত রয়েছে, কিন্তু তা হলে কি হয়, ইংলিশ জার্মেনীর শত্রু পূর্বেও ছিল এখনও আছে। বৃদ্ধা আর কিছু না বলেই ঘর হতে বের হয়ে ফের এসে বল্লেন, শোন, যখনই আমি তোমার ঘরে আসব তখনই তুমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বুঝলে, নতুবা আমার দুঃখ হবে। আমি প্রুশিয়ান্ ঘরের মেয়ে হয়ে একটা বৃটিশ প্রজার নোংড়া বাসন পরিস্কার করছি, সে আমাকে সম্মান দেখাবে না ত কে আমাকে সম্মান দেখাবে? বুঝলে, বুঝলে ত?—হাঁ, মেম, বুঝতে পেরেছি।

স্ত্রীলোকটির মানষিক অবস্থা দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার মত কিছু ছিল না। তাঁর ঘরে আরও দুটা দিন ছিলাম। দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে সম্মান দেখাতাম আর সেই সম্মানিত মহিলা সকালবেলা এসে যখন রাত্রের পরিত্যক্ত মূত্র পরিস্কার করতেন তখন মুখ ফিরিয়ে হাসতাম। লণ্ডনে পৌছানোর পর বুঝতে পেরেছিলাম, আমার পক্ষে এরূপ ভাবে হাসা অন্যায় হয়েছিল। প্রুসিয়ান মহিলার উদ্ধত ভাবের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিল প্রাশিয়ান সভ্যতা। আমাদের দেশেও সেরূপ উদ্ধতভাব দেখা যায় এবং আমরা তা সহ্য করি।

ড্রেসডেন সেকসনীরই একটা অংশ। ড্রেসডেন হতে সেকস্‌নীদের

প্রকৃত পক্ষে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে জার্মান কলোনী তৈরী হচ্ছিল। সেকসনী, চেক্ এবং অন্যান্য জাতের লোক যখনই ড্রেসডেনে আসত তখনই তারা মনে করত এটা তাদের পক্ষে বিদেশ কারণ তাদের নিজের জাতের লোককে ড্রেসডেন হতে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ড্রেসডেন্ ছাড়বার সময় হয়ে এসেছিল। যে সকল ইংলিশ যুবক আমার সাহায্যে হিটলার ইয়্থ লীগে স্থান পেয়েছিল তারা এসে আমার সংগে কথা বলত। বাস্তবিকই আমাকে আপন জন ভাবত। সন্ধ্যার সময় আমার রুমে এসে আমার শরীর ডলে দিত, পায়ে সাদা ক্রিম মাখিয়ে দিয়ে বলত, এখন পায়ের শক্তি বেড়েছে কি? আমি তাদের ধন্যবাদ দিতাম। মাত্র চারদিনই ড্রেসডেনে ছিলাম। চারদিন শহর বেড়ানোই কাজ ছিল। ইচ্ছা ছিল এখানকার সো[illegible]লিষ্টরা কি করে লোপ পেল তার একটু সন্ধান করি, কিন্তু সুযো[illegible] হয়ে উঠেনি। একদিন একটি ইংলিশ যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, অহে বলতে পার, এদেশের কমিউনিষ্টরা কি করে বিলোপ হ'ল? যুবক একটু হাসল তারপর বল্ল, জার্মাণীর কমিউনিস্ট পা[illegible]র লোপ [illegible]বার নানা কারণ ছিল। যে সকল লোক এখনও কমিউনিস্ট বলে [illegible]চয় দেয় তারা হ'ল সোসিয়েলিস্ট। প্রায়ই ব্যবসায়ী এবং [illegible]বিত্ত ঘরের লোক। মজুর এবং কৃষকের সংগে এদের কোন সংস্র[illegible] নাই। ইংলিশ যুবকের কথায় যদিও হাঁ, হাঁ করলাম বিষয়টা কিন্তু ভাল করে কিছুই বুঝলাম না।

ড্রেসডেন্ হতে রওয়ানা হবার দিন ইংলিশ যুবকগণ আমাকে এসে বিদায় দিল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার্লিনের দিকেই সুন্দর পথটি ধরে অগ্রসর হলাম। বাস্তবিকই বার্লিন যেন আমাকে

টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। হিটলার অথবা কাইজারের রাজধানী আমাকে টানছিল না। রাজা এবং বড়লোকদের প্রতি আমার কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বার্লিনের জনসাধারণ।

বার্লিন হতে প্রাগ পর্যন্ত রুট নম্বর ৯৬ (ছিয়ানব্বই) চলবার পক্ষে উৎকৃষ্ট ছিল। সে পথে চলতে কেউ আমাকে বলে দেয়নি। অটোমোবিল কোম্পানীগুলির মানচিত্র দেখেই পথের নির্দেশ ঠিক করেছিলাম। ড্রেসডেন্ হতে ৯৬ নম্বর পথ বার্লিনের দিকে ক্রমশ ঢালু। এতে পথ চলতে বেশ আরাম। শুধু তাই নয়, পথে কোথাও কংক্রিট, কোথাও পিচ দেওয়া ছিল। এমন সুন্দর ভাবে কংক্রিট অথবা পিচ দেওয়া পথ পৃথিবীর কোথাও দেখিনি। এমন কি আমেরিকাতে‌ও না। এই বড় বড় পথগুলি হিটলার নাকি তৈরী করেছিলেন। পূর্বে এই পথগুলির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এমন সুন্দর এবং মজবুত করে গড়া ছিল না। যে দেশে পথে বাইসাইকেল চালাতে আরাম সেদেশের পথনির্মাতা সরকারের প্রতি আপনা হতেই শ্রদ্ধা আসে। আমারও হিটলারের প্রতি আপনা হতেই শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। কিন্তু হঠাৎ ভারতের তাজমহল, সেকেন্দ্রা, মতিমসজিদ এসবের কথা মনে হওয়ার মনে হল, হয় ত এই সুন্দর পথের পেছনেও মস্তবড় একটা মতলব আছে।

প্রাচ্য দেশের হাইওয়ে বড়ই খারাপ। বলকানে ভ্রমণের সময়ও ভাল হাইওয়ে সর্বত্র পাইনি। জার্মাণীতে আসার পর সুন্দর পথ পেয়ে কয়েক ঘণ্টা মাত্র নাৎসীদ্রোহী চিন্তা মনে স্থান পেয়েছিল। তারপরই সব চলে যায়। সাইকেল যেন আপনি চলছিল। ঘণ্টায় সাত হতে আট কিলোমিটার আরাম করে চলছিলাম। পথের পাশে অনেক গোলাবাড়ী। সাইকেল থামিয়ে গোলাবাড়ীতে প্রবেশ করে

ঘোল, মধু এবং প্রাণ মাতানো জার্মান রুটি বিনি পয়সায় খেয়ে আসতাম। আমাকে জার্মানরা যেন আপনা হতেই ভালবাসত। অনেকে আবার খাবারের পর দক্ষিণাও দিত। লক্ষ্য করছিলাম এদিকের জার্মানরা হেইল হিটলার কথাটা পছন্দ করে না, "গুড্ মরগেন্"-ই তারা পছন্দ করে। অনেকে আবার হেইল হিটলার বল্লে রাগ করত এবং ভাল রুটি না দিয়ে খারাপ রুটি দিত। এতে আমার এক মহা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। নাৎসী ভাবাপন্ন পরিবারের লোক কিন্তু হাইল হিটলার না বল্লে কিছুই দিত না। ভাবছিলাম এখানেও বন্দেমাতরম শব্দের প্রচলন করব। কিন্তু বিকাল বেলা যখন শহরে পৌঁছলাম তখন দেখলাম হেইল হিটলার ছাড়া সাহায্য পাবার অন্য উপায় নাই।

রেডবার্গ (RADEBURG) একটি ছোট্ট শহর। লোক সংখ্যা কত হবে বুঝতে সক্ষম হইনি। শহরে পৌঁছেই একটা হোটেলের অনুসন্ধানে চলেছি এমনি সময় একটি নারী আমাকে থামিয়ে বল্লে, ঐ যে ঘরটা দেখছেন সেখানে আমার একটি ভাই বসে মদ খাচ্ছে, তাকে ডেকে এনে দিতে পারেন? নারীর এই অপ্রত্যাশিত আদেশ সহ্য করতে না পেরে বল্লাম, আপনি নিজেই যান না। আমি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারব না। কথাটি বলেই শহরের মধ্যে চলে গিয়ে একটি হোটেলে দৈনিক এক মার্কে একখানা রুম ভাড়া করলাম।

বিকাল বেলা। মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। ঠাণ্ডা বাতাস বইবে বলে মনে হচ্ছিল। শহরের লোক যেন কোথায় লুকিয়ে গিয়েছিল। দোকানীরা তাদের দোকানের বড় দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছোট্ট দরজাটি খুলে গ্রাহকের প্রতীক্ষা করছিল। রেস্টোরেণ্ট হতে

ফিরে আসবার পথে শহরের জনমানবহীন দৃশ্যটি দেখে আমিও তাড়াতাড়ি করে রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মুরগীর পালকের লেপ গায়ে দিয়ে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলাম না। শরীরটা গরম হয়ে উঠল। সাইকেল নিয়ে শহরে ভিক্ষার্থে বেড়িয়ে পড়লাম। পূর্বেই বলেছি শহরটি খুবই ছোট। কোথাও সোয়াস্তিকা চিহ্নিত কোন পতাকা দেখতে না পেয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় একটি বিয়ারের দোকানে প্রবেশ করলাম। যদিও বিজলী বাতি প্রজ্জ্বলিত ছিল তবুও মনে হচ্ছিল অন্ধকার যেন বিজলী বাতিগুলিকে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করছে। বিয়ারের দোকানে প্রবেশ করেই হেইল হিটলার বলে সকলকে সম্বোধন করলাম, এতে সকলেই সাড়া দিল। প্রত্যেকের কাছে এক এক খানা করে ভিক্ষাপত্র দিলাম। প্রত্যেকে তা পড়ল, তারপর সকলেই কিছু কিছু দান করল। দাতাদের মধ্যে একজন লোক আমাকে এক গ্লাস বিয়ার দিয়ে বল্লে, হেইল হিটলার বলাতে এখানে যেমন করে সাড়া পাচ্ছেন এই ধরনের কথায় অন্য কোথাও কি সাড়া পেয়েছেন?—নিশ্চয়ই পেয়েছি বন্ধু, আমাদের দেশে মুসলমান সমাজে গিয়ে যদি সেলাম আলীকুম বলেন তবে তেমনি সাড়া পাবেন। তারা হল দরিদ্র, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা পাবার আশা করা যায় না। ভদ্রলোক বল্লেন, তারা শুধু দরিদ্র নয় অশিক্ষিতও নয় কি?—নিশ্চয়ই মশিয়ে। এর পরই ভদ্রলোক আমার হাতে পুনরায় বিয়ারের গ্লাসটি উঠিয়ে দিয়ে বল্লেন আবার, হেইল হিটলার। আমি গ্লাসে মুখ দিলাম না, শুধু হেইল হিটলার বলেই চুপ করে থাকলাম। ভদ্রলোক বল্লেন, আপনি বিয়ার খান না?—না মঁশিয়ে, বলে যেই তার কারণ বলতে যাচ্ছি অমনি তিনি আমার হাত ধরে বাইরে এসে বল্লেন, এরূপ ভাবে আর কখনও বিয়ার না খেয়ে চুপ করে থাকবেন না এটা শুধু নিয়ম বিরুদ্ধ নয়, রীতি

মত একজনকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভদ্রলোককে বল্লাম এখন থেকে আর বিয়ারের দোকানে গিয়ে ভিক্ষা করব না। বিয়ার খেলে অনিষ্ট করে। ভদ্রলোক বললেন, তাই করবেন।

ভাবছিলাম ভদ্রলোক এই মামুলী কথাটি বলেই বিদায় নেবেন, কিন্তু তা না করে তিনি হোটেলে এলেন এবং রুমে এসে অটোগ্রাফ বই ভাল করে পরীক্ষা করে বল্লেন, তবে আপনি পলিটিকেল পর্যটক নন। কথাটা শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল কারণ আমাদের দেশেরই অন্য আর একজন পর্যটক রুশিয়া হতে ... পোলাণ্ডের সীমানায় পদার্পণ করেন সেদিনই তাকে এমনি নির্মম ভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল যাতে তার জীবন প্রদীপ নিবু নিবু হয়েছিল এবং লণ্ডন পৌঁছানোর পর তাকে পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হয়েছিল। তখনকার দিনে সোভিয়েট রুশিয়া হতে যে সকল দরিদ্র লোক পর্যটন করে পোলাণ্ডের ভেতর দিয়ে ইংলণ্ডের দিকে পদব্রজে রওয়ানা হত তাদের পোল্-রা যমের বাড়ি না পাঠিয়ে আধমরা করে ছেড়ে দিত। জার্মাণরা সেই আধমরা পর্যটকদের হাতে পেলে বাকি কর্মটুকু সেরে ডিমোক্রেটিক দেশ ফ্রান্স অথবা বৃটেনে চালান দিত। সেরূপ কিছু না ঘটে সেজন্য আমি সকল সময়ই সন্ত্রস্ত থাকতাম এবং তথা কথিত জার্মাণ কামউনিস্ট এবং অপর নামে পরিচিত নেসনেলিস্টদের থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতাম। প্রকৃত পক্ষে জার্মাণীতে কমিউনিস্ট ছিল না, সোসিয়েলিষ্টরাই নিজেদের কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দিত।

নবপরিচিত ভদ্রলোক কি প্রকারের লোব হবেন তা চিন্তা করে পাচ্ছিলাম না। অটোগ্রাফ বই দেখা হয়ে গেল, রুম হতে বের হয়ে বসার ঘরে আসলাম। হোটেলওয়ালা নবপরিচিত লোকটিকে দেখে ভীত হল। নবপরিচিত ভদ্রলোক হোটেলের বসবার ঘরে বসেই

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জার্মানীতে আসার কারণ কি মঁশিয়ে? কোনরূপ চিন্তা না করেই বল্লাম, বার্লিন, প্যারী এবং লণ্ডন এই তিনটি শহর আমাকে চুম্বকের মত টানছে। কিসের জন্য বার্লিন যাচ্ছি তা বলতে পারব না।—ভয়ানক ভাবপ্রবণ দেখছি, আচ্ছা এখন যাই, বলেই নবপরিচিত ভদ্রলোক চলে গেলেন। হোটেলওয়ালা বল্লে কমিউনিস্ট কাউণ্টার স্পাই। দুটি শব্দই যথেষ্ট। ইউরোপের লোক বেশি কথা বলে না। আমিও এই দুটি শব্দের বিশদ অর্থ করব না। এই দুটি শব্দের বিশেষ অর্থ বলতে গেলে সময়ের অপব্যবহার হবে।

চুপ করে বসে থাকবার লোক ছিলাম না। শরীরে যখন শক্তি থাকে মন তখন কোনও রকমেই ভীত হয় না। একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম এবং হেইল হিটলার চিৎকার দিয়ে পুনরায় ভিক্ষাপত্র বিতরণ করলাম। অনেকেই আমাকে ভিক্ষা দিল কিন্তু কারোর কোন কথা বলার মত মনের গতি দেখলাম না। ভিক্ষা করে যা পেলাম, রেস্তোরাঁয় বসেই তার সৎব্যবহার করলাম।

হোটেলে ফিরে আসার পর হোটেলের মালিক আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লেন, এদেশে খুব সাবধান হয়ে চলবেন। অনেক কিছু জানবার এবং শিখবার আছে। বল্লাম, আমি মামুলী লোক, জানবার এবং শেখবার জন্যই পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছি, দয়া করে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। ভদ্রলোক বল্লেন, কয়েক মাস হয় তিনি ইংলিশ ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছেন, ইংলিশ ভাষা বর্ত্তমানে জার্মেণীতে "রিভলিউসনারী" ভাষাতে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি আমার পথের নির্দেশ পান তবে আমাকে উপদেশ দিতে পারেন। ফ্রেঞ্চ রেডিও নাকি মিথ্যা কথা বলে আর ইংলিশ রেডিও সত্যকথা বলে। ভদ্রলোকের কথায় কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করে শুধু পরিচয় পত্রখানার জন্য ঔৎসুক্য

৮

দেখাতে লাগলাম। এতে ভদ্রলোক সুখী হলেন এবং এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পরিচয় পত্র দিলেন।

পরের দিন প্রত্যুষেই রওনা হলাম। পথ বড়ই সুন্দর এবং পরিষ্কার। পথের দুদিকের দৃশ্যাবলী একই ধরণের। দেখবার মত কিছুই ছিল না। পথে দেখার মত যখন কিছুই থাকে না তখন শুধু পথ ধরে চলতেই ইচ্ছা করে। বিকালের দিকে অন্য আর একটি বড় শহরে পৌঁছুলাম। শহরটির নাম এলস্টারওয়ের (Elsterwerda)। শহরটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। অনেকগুলি পুরাতন তোরণ দ্বার ভগ্নাবস্থায় ছিল। পথগুলিও আঁকাবাঁকা। আঁকাবাঁকা পথ ধরে শহরের ভেতর পৌঁছে একটি হোটেলে গেলাম। হোটেলের মালিক স্ত্রীলোক। হোটেলের বোর্ডে লেখা ছিল দৈনিক এক মার্ক দিলেই একখানা রুম পাওয়া যায়। হোটেলওয়ালী আমার কাছে দেড় মার্ক চেয়ে বসল। দেড় মার্ক দিতে রাজি না হয়ে নিকটস্থ পুলিশ স্টেসনে গেলাম এবং হোটেলওয়ালীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলাম। একজন পুলিশ এসে হোটেলওয়ালীকে দেড় মার্ক চেয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করল। হোটেল-ওয়ালী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, কালো লোকের জন্য সে হোটেল খুলেনি। পুলিশটি মাথা নত করে আমাকে নিয়ে একটি পারিবারিক হোটেলে নিয়ে চল্ল। পারিবারিক হোটেল বড়ই সুন্দর। অবশ্য সেজন্য দেড় মার্ক করে থাকবার জন্য দৈনিক দিতে হয়। আমি তাতেই রাজি হলাম।

এই হোটেলে যারা বাস করেন তারা সকলেই নাৎসী। তাদের আচার ব্যবহার কিন্তু নাৎসীদের মত নয়। নম্র এবং বিনয়ী। বিদেশীর প্রতি অত্যাচার তাদের প্রাণে যেন চাইত না। তাদের হোটেলে খেতেও দেওয়া হত। প্রত্যেক মিলের জন্য দেড় মার্ক চার্জ করা হ'ত।

ভাবলাম, আজ এদের বাড়িতেই খাওয়া যাক। সেজন্য বাইরে কোথাও না গিয়ে দৈনিক ইংলিশ পত্রিকা লণ্ডন টাইম্‌স আরাম কেদারায় বসে পড়তে মন দিলাম। হোটেলের মালিক বড়ই ভাল মানুষ। তিনি আমার কাছে এসে বসলেন এবং বন্ধু বলে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, জার্মাণী কেমন লাগছে? বল্লাম, পৃথিবীতে যতগুলি দেশ দেখেছি তার মধ্যে জার্মাণী সব চেয়ে ভাল। জার্মাণীর হাইওয়ের মত সুন্দর হাইওয়ে কোথাও দেখিনি। জার্মাণীর লোক যেমন পরিস্কার থাকতে পারে তেমনটি আর কেউ পারে না। অবশ্য তখনও আমার অনেক দেশ দেখবারই বাকি ছিল। এর পরেই তিনি হার হিটলারের কথা উঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন হিটলার সম্বন্ধে ভারতের লোকের কি ধারণা? পর্যটক এ হিসেবে বড়ই চালাক। বল্লাম, ভারতের এমন লোক নাই যে হিটলারের নাম না শুনেছে। সকলেই চায় হিটলার শক্তিশালী হয়ে উঠুন, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধংশ করুন। আমার কথা শুনে হোটেলওয়ালার মনের পরিবর্তন হ'ল। তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন এবং কতক্ষণ পর একটি লোক পাঠালেন। সে এসেই বল্লে "ওয়াসার" অর্থাৎ "স্নান করুন"। স্নান করতে রাজি হলাম। তৎক্ষণাৎ লোকটি একটি স্নানাগারে আমাকে নিয়ে গিয়ে স্নানাগারের মেজে পরিস্কার করে দিল। স্নান করা মাত্র সে স্নানাগারে প্রবেশ করে আবার স্নানাগার পরিস্কার করল। এসব কাজ হয়ে গেলে আমার পিঠ-ঝোলাটা নিজেই খুলে যত অপরিস্কার কাপড় ছিল সব বের করে লনড্রীতে দিয়ে আসল। তারপর খেতে বসে দেখলাম নানা রকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে। খাওয়া প্রচুর হল। খাবার খেয়ে যখন একাকী কি ভাবছিলাম তখন আবার হোটেলওয়ালা রুমে প্রবেশ করে বলতে লাগলেন, যদি কেউ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করতে অগ্রসর

হয় তবে তারা কি আপনাদের শত্রু হবে না? বল্লাম, নিশ্চই শত্রু হবে। কিন্তু মনের কোণে সোভিয়েট রুশের মানচিত্র ভেসে উঠল। সোভিয়েট রক্ষার্থে পরাধীন দেশগুলি সবই দিতে প্রস্তুত সেকথা আর প্রকাশ করলাম না। জার্মানীর নাৎসীবাদ আর বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদে বড় বেশী তফাৎ ছিল না। নাৎসীরা ইহুদীদের জেলে রেখে পলে পলে শুকিয়ে হত্যা করে; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রজাদের রোগে ভুগিয়ে, খাওয়া কম দিয়ে, বেকার রেখে, পলে পলে মারে। প্রভেদ কোথায়?

যুদ্ধ আরম্ভ হবার আর মাত্র তিন বৎসর বাকি। তখনও জার্মাণীর অন্তস্থলে বসে কেউ ধারণা করতে পারত না, জার্মানী যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হচ্ছে। আমিও সেই পথ অবলম্বন করে হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে যুদ্ধ করতে পারবেন? হোটেলওয়ালা বল্লেন, এখনও সেরূপ কিছুই সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে কিনা, আমরা বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছি। পোল, চেক্, ফরাসী এরা সবাই বৃ[illegible]র তাঁবেদারী করছে, আমরাও সেরূপই। এই বিপদ হতে কখন [illegible]াই পাওয়া যাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন। বল্লাম, "ঈশ্বর" শ[illegible] এ বিষয়ে শুনতে ভাল শুনায় না, আমরা ত মশাই এসব বিশ্বাস ক[illegible]। বৌদ্ধ ধর্ম্মে ঈশ্বর বলে কিছুই স্বীকার করা হয়নি [illegible] আর্য স[illegible]্যতার মধ্যেও সেরূপ কিছু পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহুদীরাই সর্বপ্রথম ঈশ্বর বলে একটা শব্দ আবিস্কার করে। দ্রাবিড় এবং অষ্ট্রিয়ান সভ্যতা বহুপূর্বে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিল যার অপর নাম "ভগবান"। হোটেলওয়ালা কতক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে আবার বাইরে চলে গিয়ে তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে এসে একত্রে সমস্বরে চিৎকার করে বল্লে "হেইল হিটলার"। আমিও তাদেরই অনুরূপ চিৎকার করলাম।

তারপর আরম্ভ হ'ল করমর্দ্দন। কালো হাতের সংগে সাদা হাতের মিলন বড়ই দুঃখের তবুও মনের মিল থাকাতে মিলনটা ভাল করেই হয়।

পরের দিনটাও হোটেলওয়ালার ঘরে থাকলাম কারণ তখনও আমার কাপড় লণ্ড্রী হতে ফিরে আসেনি। পরের দিন সকাল বেলা পরিষ্কার কাপড়গুলি পিঠ-ঝোলায় বিন্যাস করে রেখে আবার উন্মুক্ত পথে এসে হাঁপ ছেড়ে এগিয়ে চল্‌লাম। মনের ভাব গোপন করে বেশিক্ষণ থাকার মত লোক আমি নই। যারা বেশি সময় মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে পারে তাদের মনের শক্তি বেশি। চীনা এবং রুশ দেশীয় লোক মনের ভাব অনেকক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে।

গ্রো-বেনহেন্ (Gro-Benhain) আমার গন্তব্য স্থল। পাহাড়ে পথ। পথের দুদিকে কোথাও পাইন বৃক্ষরাজি আর কোথাও ফলের বাগান। পথের দুদিকের সৌন্দর্য বড় আরামদায়ক। একটি ফাঁকা যায়গায় কতকগুলি গরু ঘাস খাচ্ছিল। গরুগুলি অতীব সুন্দর গরুর রং সাদা এবং কালো। সাদা রংটা যেমন ধবধবে, কালো র ‌ ও তেমনি মিশমিশে। পথের উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গরুগুলি দে ‌ বেশ আনন্দ হল। পথে দুএক স্থানে থেমেছিলাম। হিটলার ই ‌ লীগের অনেক যুবক যুবতীর সংগে দেখা হয়। অনেকে আমাকে ‌ান দেখিয়ে হেইল হিটলার বলে। আমিও তাদের হেইল হিটলার ব ‌ সম্মান দেখাই।

আমাদের দেশের লোক যুবক যুবতী একত্রে দেখলেই আমাদের মন তিড়িং বিড়িং করে উঠে। আমারও সেরূপ মনের ভাব এক দিন ছিল কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ করার পর সেই তিড়িং বিড়িং ভাবটা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম সেটা আমার একটা মস্তবড় দোষ। এক দিন জার্মানীর কোনও পল্লীগ্রামের পাশে

কতকগুলি যুবক যুবতীকে একত্রে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে সিমেটিক্ ভাবটা জেগে উঠেছিল। কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যখন তাদের মুখের দিকে তাকালাম তখন দেখলাম তাদের নিদ্রিত মুখের ওপর শান্তির আভা এসে পড়েছে। তারা পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়েছে। তারা ছিল গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তারাও আমার মতই গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বেড়াচ্ছিল এবং হার হিটলারের আদেশ নতমস্তকে মেনে চলছিল।

বিকালে গ্রামে পৌঁছলাম। তখন দলে দলে চাষার দল গ্রামে ফিরছিল। অনেকেই বিয়ারের দোকানে গিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে ঘরে যাচ্ছিল। চাষাদের ঘরে ফেরার অবস্থাটা বাস্তবিকই উপভোগ্য। যার মুখে এক ফোটাও বিয়ার পড়েনি সেও গুণ গুণ করে গান গেয়ে তার ঘরের দিকে চলছিল। সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য চাষারা যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। তবুও তাদের সরল মুখের প্রাণ মাতানো হাসি গ্রাম্য পথের শ্রীবৃদ্ধি করছিল। চাষারা দলে দলে আপন ঘরে যাচ্ছিল। একটি বিয়ার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের পথ চলা দেখ্ছিলাম। কতক্ষণ পর যখন চাষার দল ঘরে চলে গেল তখন একটি বিয়ার দোকানে উপর তলায় অবস্থিত হোটেলে থাকার ঠিক করলাম।

ইউরোপের সর্বত্র আইন মতে বারবনিতাবৃত্তি অচল। আইনের চক্ষে ধুলি দিয়ে এ সব কাজ শুধু জার্মানীতে নয় ইউরোপের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল কিন্তু হিটলার শক্তি হাতে নেবার পর হতে বারবনিতা বৃত্তি লোপ পায়। সেজন্য বারবনিতা বৃত্তির জন্য সংরক্ষিত ঘরগুলি খালি পড়ে রয়েছিল। প্রত্যেকটি রুমে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা ছিল। সারাদিনের পরিশ্রমের গ্লানি অপসারণের জন্য ঠাণ্ডা জল দিয়েই শরীরটাকে মুছে নিয়ে ফের রুম হতে বের হয়ে পড়লাম। তখন

রাজপথে আর লোক ছিল না। পথে যে দু'চার জন লোক দেখা যাচ্ছিল তাদের বস্ত্র অন্য রকমের। তারা পুলিশের লোক। জার্মানীর পুলিশের লোক বড়ই খড় এবং রক্ত চক্ষু। তাদের সংগে প্রেম করা চলে না। গ্রামের পুরুষ রমণী সকলেই তাদের ভয় করে চলে এমন কি বিয়ারের দোকানের লোকটাও পুলিশ দেখলেই আপন কাজে নূতন করে মন দিতে বাধ্য হয়।

বিয়ারের দোকান হতে বের হয়ে আসলাম। একটা পুলিশ পথে দাঁড়িয়েছিল। সে আমার পাসপোর্ট চাইল। তৎক্ষণাৎ পাসপোর্ট তার হাতে দিয়ে হাইল হিটলার বল্লাম। পুলিশ পাসপোর্টের ভেতরের পাত-গুলি না দেখে একটু হাসল তারপর পাসপোর্ট আমার হাতে দিয়ে হাইল হিটলার বলে বিপরীত দিকে চলে গেল। আমিও খাবারের দোকানের দিকে রওনা হলাম। একটু দূরে গিয়েই একটা প্রকাণ্ড রেস্তোরাঁ দেখতে পেলাম। সেখানে অনেক লোক বসে খাচ্ছিল। আমিও সেখানে গিয়ে একটি চেয়ার দখল করে বয় আসার অপেক্ষায় থাকলাম। বয় আসল এবং প্লেটের পর অন্য প্লেট দিতে লাগল। খাওয়া বেশ ভালই হল। সর্বশেষে এক পেয়ালা দুগ্ধ বিহীন কাফি দিয়ে বিল হাজির করল। বিলে লেখা ছিল পঁয়ষট্টি সেণ্ট। এরূপ রেস্তোরাঁয়ই পেট চুক্তি খেতে দেওয়া হয়। পেট চুক্তি খাওয়াটা মজুর মহলেই দেখতে পাওয়া যায়।

পরের দিন সকালে (Elsterwarda) এলস্টারের দিকে রওয়ানা হলাম। পথটা উঁচু নীচু থাকায় চলতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু সর্বত্র পাহাড় চুয়ানো জল খেয়ে বেশ আনন্দ অনুভব করলাম। এখানে ভুল করে হিটলার ইয়থ লিগের যুবতীদের বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করি। ভাবছিলাম, এটা হবে ছেলেদের থাকবার হোস্টেল। মেয়েদের ইয়থ্ লিগের মস্ত বড়

দেওয়াল, যেন আমাদের দেশের জেলখানা। আঙ্গিনায় পৌঁছা মাত্র কয়েকজন স্ত্রীলোক এসে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু তাদের কোন কথা বুঝতে সক্ষম হলাম না। অবশেষে একখানা ভিক্ষাপত্র তাদের পড়তে দিলাম। ভিক্ষাপত্র পড়েই একজন স্ত্রীলোক কাকে ফোন করলেন। মিনিট দুয়েক পরই একটি যুবক আসল এবং আমাকে নিয়ে তাদের বাসস্থানে গেল।

বিকালের দিকে মস্তবড় একটা প্যারেড দেখলাম। যে সকল যুবক প্যারেড করছিল তাদের মুখ দেখলেই মনে হয় তারা মরবার জন্য তৈরী হচ্ছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে তারা চলছিল এবং তাদের সাদা মুখে লাল রং আপনি ফুটে উঠছিল। যারা পথে চলছিল তারা ছিল নাজি যাকে ইংলিসে বলা হয় নাৎসী। তখনও নাৎসীরা বিদেশীর চক্ষে ঘৃণ্য ছিল কিন্তু আমাদের চক্ষে বেশ ভাল লাগছিল। সেজন্যই বোধ হয় আমার দুটা চোখ এদের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছিল। যখন তারা চলে গিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল এইত আর একটি ঢেউ। এই ঢেউ পৃথিবীর বুকে আর একটা আঘাত দেবে। সে আঘাতে অনেক অনুন্নত জার্মাণরা ভাববে তাদের নিজের জাতের উন্নতি করছে, কিন্তু তারা জানে না তাদের উন্নতির পেছনে আর একটা উন্নতি লুকিয়ে আছে।

প্যারেড দেখার পর যখন ঘরে ফিরলুম তখন কয়েকটি যুবক আমাকে তাদের কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করল। তাদের প্যারেডের অত্যন্ত প্রশংসা করলাম। আমার প্রশংসা শুনে এরা কি ভেবেছিল তারাই জানে, তবে এটা মনে হয়েছিল যুবকগণ সত্যিই জার্মাণীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল।

আটটা বাজবামাত্র করুণ মধুর স্বরে ঘন্টি বেজে উঠল। পাঁচ মিনিট

পর আলোগুলি আপনি নিবে গেল। আমিও বিছানাতে শুয়ে পড়লাম তারপর নানা বিষয়ে একটার পর আর একটা চিন্তা আসতে লাগল। অনেক্ষণ চিন্তা করেছিলাম তারপর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ছয়টায় পুনরায় ঘণ্টা বেজে উঠল। গভীর নিদ্রায় যারা নিদ্রিত ছিল—তারা সকলেই উঠল। আমিও উঠলাম। সাইকেলের পেছনে পিঠ ঝোলা বেঁধে যখন বাইরের দিকে চলছিলাম তখন ইয়থ্ লিগের সেক্রেটারীর সংগে দেখা হয়। উভয়েই হাইল্ হিটলার বলে দক্ষিণ হাত আগের দিকে প্রসারণ করে দিলাম। তারপর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে পুনরায় হাইল হিটলার বলে রওয়ানা হলাম।

পথে এসে উন্মুক্ত বাতাসে বেশ আরাম বোধ করলাম। চারিদিকের দৃশ্যাবলী বেশ আনন্দ দিতে লাগল। সাইকেল বেশ জোরেই চল্ল। তারপর কতদূর এসে পথের পাশে একটা খাবারের দোকান পেলাম। এই খাবারের দোকান দেখেই আমাদের দেশের দুর্গন্ধপূর্ণ খাবারের দোকানের কথা মনে হয়েছিল এবং শরীরটা শিহরে উঠেছিল। এখানে তার উল্টা। খাবারের দোকানের ঘরে বাইরে সাজানো চেয়ার টেবিল। টেবিলের উপর পরিষ্কার টেবিল ক্লথ বিছানো। কোন কোন টেবিলে পরিষ্কার গ্লাসে শীতল জল ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছে। পথিক এসেই যেন জল খেতে পায়। আমিও সর্ব্বপ্রথমই এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে রুটি মাখন এবং একটি মাত্র সিদ্ধ ডিম খেয়ে কাফি খেলাম। আর নিজের দেশের পথের পাশের যে সকল দোকান আছে সেই দোকানগুলি কখন এখানকার খাবারের দোকানের মত হবে তাই চিন্তা করছিলাম। অনেকে বলবেন ভারতবাসী গরিব সেজন্যই এরূপ হয়। আমি বলছি যারা গরিব তারা পরিষ্কার থাকতে পারে না, পারে কাল্‌চারের অভাব কথাটা স্বীকার করতে দোষ কি? কাল্‌চারের অভাব স্বীকার করতে

প্রাণে বড়ই লাগে। তারই ফলে আমাদের এই দুর্দ্দশা।

হিটলার ইয়ুথ লিগের দলে দশ বৎসরের ছেলে মেয়েও থাকত। তারা যাতে পথের মাঝে কিছু খেতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই এই পথের পাশের খাবারের দোকান খোলা হয়। শুধু তাই নয় যদি কোনও পর্যটকের দল গভীর রাত্রে এই খাবারের দোকানে আসে তবে তাঁদের শোবার বন্দোবস্ত করা ছিল। হিটলার ইয়ুথ লিগের পাকা বাড়িতে যেরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল এখানে সেরূপ কিছুই ছিল না। "কোন মতে" রাত কাটাবার বন্দোবস্ত ছিল মাত্র। একখানা ক্যাম্প কট, তার উপর একটা মোটা গদি, গায়ে দেবার জন্য একখানা পালকের লেপ। বিছানার চাদর অথবা বালিশের বন্দোবস্ত ছিল না। খাবারের দোকানে যারা কাজ করছিল তারা সকলেই যুবতী। তাদের কয়েকজন সাহায্যকারী ছিল, তারা সকলেই যুবক। এই যুবক যুবতীরা নব বিবাহিত। হার হিটলারের প্ল্যান মতেই এদের বিবাহ হয়েছে। যুবকগণ যুবতীদের ডবল মাইনে পেত। যুবতীগণ শনি এবং রবিবারে কোনও কাজ করত না। তারা শহরে গিয়ে আনন্দ করে সোমবারে ফিরে আসত। এতে তাদের স্বামীরা মোটেই আপত্তি করত না। এসব ব্যবস্থার কথা পরে শুনেছিলাম।

পথ বড়ই সুন্দর। দুদিকে সারি দিয়ে বৃক্ষশ্রেণী। বৃক্ষশ্রেণী পাইন জাতীয়, তবে তার মধ্যেও শ্রেণীভেদ ছিল। বৃক্ষ শ্রেণীকে বেশ মন দিয়ে দেখছিলাম এবং বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম। বৃক্ষলতা পরিষ্কার ছিল। কোনও বৃক্ষেরই শাখা প্রশাখা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল না। বাস্তবিকই এটাকে সাজানো অরণ্য বলা যেতে পারে। অরণ্যের প্রত্যেকটি বৃক্ষে নম্বর দেওয়া ছিল। দূর থেকে সেই নম্বর দেওয়া বৃক্ষের ক্ষতস্থানটুকু পথিকের মনাকর্ষণ করছিল। আমি দু একটা নম্বর মনে রেখে তা নোট

বইএ লিখেছিলাম যেমন বিশ হাজার তিন। তিন লক্ষ পাঁচ।

বৃক্ষরাজি পরিশোভিত পথ শেষ হবার পর প্রকাণ্ড একটি বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িখানা যেন একটি দুর্গ। এই বাড়ি জমিদারের। জমিদারের বাড়ির সামনে একটু দাঁড়ালাম এবং দেখলাম, যেই জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে সেই জমিদারের দ্বারওয়ানই বোধহয় হবে তাকে হাইল হিটলার বলে ডান হাত উঁচু করে নামিয়ে নিয়ে নিজ নিজ পথ চলছে। জমিদার বাড়ির দ্বারওয়ানই বল আর কোনও উচ্চ কর্ম্ম-চারীই বল, পূর্বে সে সকলের কাছ থেকেই সম্মান পেত এবং এখনও সে তাই পায়। পূর্বে সাধারণ লোক সম্মান দেখাবার সময় টুপি উঠাত এখন তা না করে হাইল হিটলার বলে। আসলে কিন্তু জমিদারের সম্মান পাবার দিক দিয়ে একটুও ব্যতিক্রম হয়নি বরং বেড়েছে। অনেকে পূর্বে সম্মান না দেখিয়ে চলে যেতে পারত, হিটলারের রাজত্ব আরম্ভ হবার পর তা হতে পারে না। জার্মাণ সরকারের কড়া আদেশ, নেসনেল সোসিয়েলিষ্ট সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মান দেখাতে হবেই। জমিদার, ভন্ উপাধিধারী এবং অন্যান্য ধনীরা রাতারাতি নেসনেল সোসিয়েলিজম্ গ্রহণ করে পার্টির উচ্চপদগুলি অধিকার করেছিল।

কতকগুলি দুর্দ্দান্ত যুবকের সংগে আমার প্রায়ই দেখা হ'ত। তারা কাউকে সম্মান দেখাত না এবং সংযত ভাবে থাকত। অনেক সময় তাদের নাকে মুখে জার্মাণ বিদ্বেষের ভাবও ফুটে উঠত। এরা যে কমিউনিষ্ট নয় তাও বুঝতাম। বার্লিনে যাবার পর এদের সম্বন্ধে অনু-সন্ধান করে জেনেছিলাম, তারা ছিল স্থানভ্রষ্ট চেক্, ময়ভিয়ান্, পোল্স এবং অন্যান্য জাতের লোক। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে পৌঁছানোর পর জানতে পেরেছিলাম এসব লোককে সৈন্যদল হতে তাড়িয়ে দেওয়া

হয়েছে এবং এদের অনেকেই বিদেশে চলে গেছে। যারা বিদেশে যায়নি তাদের কন্‌সেনট্রেসন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল।

হিটলার ইয়থ লিগে সকলেই যোগ দিয়েছিল। অনুপাতে মজুর এবং চাষার ছেলেরাই ছিল বেশি। কৃষক এবং মজুর শ্রেণীর লোকের পুরাতন দাসভাব ছিল। তাদের ছেলে মেয়ে তাদের পিতৃপুরুষ হতে প্রাপ্ত দাসভাব হতে রেহাই পায়নি। হার হিটলার সে সংবাদ রাখতেন কিন্তু তা লোপ করবার জন্য চেষ্টা করেন নি। যাদের দাসভাব থাকে তাদের হিংসা বুদ্ধি বেশি হয় সেজন্যই হিটলার ইয়থ লিগের লোক বড়ই হিংসুক ছিল। তারা বিদেশীকে ঘৃণা করত। আমাকেও বাদ দিত না।

এক দিন খেতে বসে একটি জার্মাণ যুবকের কাছে তার পাশের গ্লাসটি চেয়েছিলাম। সে আমাকে গ্লাসটি ত দিলই না, উপরন্তু "ইণ্ট হিদেন্" বলে তিরস্কার করেছিল। তার কথাটা বুঝিনি বলেই ভান করেছিলাম। পরে ঐ কথাটা নিয়ে যখন আবার কথা উঠল তখন একজন সহরবাসী ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে লোকটি আপনাকে "ইণ্ট হিদেন্" বলেছিল, সে ছিল প্রাসিয়ার চাষার ছেলে। প্রাসিয়ার চাষার ছেলেরা এখনও রাজভক্ত এবং হিটলার ভক্ত। তারা এখনও নেসনেল সোসিয়েলিজমের মানে কি হয় তার ধার ধারে না। তারা শুধু জানে আদেশ প্রতিপালন করতে।

কে প্রাসিয়াবাসী আর কে দক্ষিণ জার্মাণীর বাসিন্দা জানবার শক্তি আমার ছিল না। যে ভদ্রলোক আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তাকে বলেছিলাম, সেজন্যই বোধহয় প্রাসিয়ার লোক এত ভীরু হয়। রুশদের সংগে প্রাশিয়ানরা প্রত্যেকবারের যুদ্ধে হেরেছে। রুশদের দ্বারা প্রত্যেক-বারেই প্রাশিয়ানরা নির্যাতীত হয়েছিল। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কেমন তাই নয় কি ? জার্মাণ ভদ্রলোক আমার কথার জবাব দেন নি।

আসল কথা হ'ল, হিটলারের অভ্যুত্থানের পর থেকে জার্মাণ জাতের মধ্যে বড় হবার এবং শক্তি অর্জন করার প্রবৃত্তি এসেছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি লোপ অথবা অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির চেষ্টা হয় নি। জাতীয় ভাব উদ্দীপনা আনে জাতের সম্মান বাড়াবার জন্য, অপরকে নির্যাতন করার জন্য নয়। তখন জার্মাণীতে যে জাতীয় ভাব এসেছিল, তার পেছনে ছিল বিজয় ডংকার ঐক্যতান। সেই বিজয় ডংকার ঐক্যতান শুনে আশপাশের লোকগুলি কেঁপে উঠেছিল। অপরের বিজয় ডংকা শুনে অপরের প্রাণে প্রাণ আসে যদি সেই প্রতিবাসী সজ্জন হয়, দয়ালু হয়। কিন্তু জার্মাণ জাতের মধ্যে অন্য জাতের প্রতি হিংসার অনল প্রজ্জলিত হয়েছিল।

সেদিনই পথে কতকগুলি বয়েজ স্কাউটের সংগে দেখা হয়। তারাও সাইকেলে করে অষ্ট্রিয়ার দিকে যাচ্ছিল। তাদের প্রত্যেকের পরনে উত্তম বস্ত্র, পিঠে ঝোলা এবং সাইকেলে পাহাড়ে উঠার জন্য এক রকমের "থ্রি-স্পিড" ছিল। এরূপ থ্রি-স্পিডের বাইসাইকেল চীন এবং জাপানে অনেক স্থানে দেখেছিলাম কিন্তু ব্যবহার করার সুযোগ পাই নি। আজ সেই পুরাতন ধরনের বাইসাইকেল এবং বয়েজ স্কাউট সাজে সজ্জিত জার্মাণদের দেখে মনে হঠাৎ পরিবর্তন আসল। সাইকেল হতে নেমে পড়লাম। তারাও নামল। তারাই প্রথম আমার সংগে কথা বল্ল। কিন্তু কথা বুঝতে সক্ষম হলাম না। তাদের ইংলিশে কথা বলতে বল্লাম। তারা ইংলিশে কথা না বলে ফরাসীতে কথা বলতে লাগল।

বড়ই দুঃখিত মহাশয়গণ, আপনাদের কথা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না। দয়া করে যদি ইংলিশ বলেন তবে বাধিত হব।

এক জন জার্মাণ যুবক বিশুদ্ধ ইংলিশে বল্‌ল, আমরা ইংলিশ বলতে ঘৃণা করি, কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে সেই ঘৃণীত ভাষা মহাশয়ের কাছে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি।

কথাটা বড়ই সুন্দর। আমরাও ইংলিশ বলতে ঘৃণাই করি, কিন্তু ইউরোপের অনেকগুলি ভাষা শিখবার সময় এবং অর্থ খরচ করার সাধ্য অনেকেরই নাই, সেজন্য বাধ্য হয়ে ইউরোপের একটা ভাষা আয়ত্ব করতে পারলে যথেষ্ট হয়েছে মনে করি। এখন বলুন ত আপনারা বিডন্ পওয়েলী পোষাক পরে, বিডন পাওয়েলী আচার ব্যবহার গ্রহণ করবার মতলব কি? আপনারা অসভ্যও নন্ বর্ব্বরও নন্। আমি জানতাম বয়েজ-স্কাউট-ইজম বৃটিশ ইম্‌পিরীয়েলিজমের একটি অংশ বিশেষ।

—জিনিসটা যাই হ'ক না কেন, এটা অভ্যাস করাও আমাদের দরকার। আমরা হয়ত একদিন আমাদের কলনী ফিরে পাব, হয়ত নূতন কলনীও পাওয়া যাবে, তখন আমাদেরও বৃটিশদের মতই বয়েজ-স্কাউট-ইজম চালাতে হবে। আমাদের দুর্দ্দিন আর বেশি দিন থাকবে না। আমরা শুধু নিজেই মুক্তি পাব না, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে বৃটিশ এবং ফ্রেঞ্চ ইম্‌পিরীয়েলিজম হতে মুক্ত করব আর সেই দেশগুলিতে নেসনেল সোসিয়েলিজম চালাবার চেষ্টা করব।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। জিজ্ঞাসা করলাম তারা আমার সংগে বসে কিছু খাবে কি না?

আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বয়েজ স্কাউটের সর্দ্দার হুইসেল বাজাল এবং তার সংগের অন্য দুজন লোক তাদের সাইকেল কাত করে রেখে পিঠ ঝোলা খুলে নিজ নিজ খাবারের জিনিস বের করে পথেরই পাশে বসল। আমার সাইকেলে স্টেণ্ড ছিল সেজন্য সাইকেল কাত

করে রাখতে হয় নি। আমার সংগে প্রচুর রুটি, মধু এবং পনীর ছিল। তাই খুলে তাদের সামনে রাখলাম এবং তাদের এসবের সৎ ব্যবহার করতে বল্লাম। আমি কিন্তু তাদের দেওয়া ক্রেমল স্লেচো অর্থাৎ ঘোল খেয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে জার্মাণ যুবকগণ জিজ্ঞাসা করল আজ আমি কোথায় বিশ্রাম করব? তাদের বল্লাম, আজ নিকটস্থ সহর অথবা গ্রামেই থাকব, বেশি আর অগ্রসর হব না। যুবকদের কাছে জার্ম্মাণীর প্রকাণ্ড একখানা মানচিত্র ছিল। মানচিত্র বের করে বল্ল, আপনি ছিয়ানব্বই নম্বর পথ ধরে চলেছেন। আজ লাকেন্ ওয়েভেল গিয়ে থাকলেই চলবে। আমি বল্লাম তাই হবে।

আমার দৃষ্টি তাদের মানচিত্রের উপর দৃঢ় ভাবে পড়েছিল। পলকে বুঝে নিয়েছিলাম হিটলার ইউরোপে কি চান। আমি বয়েজ স্কাউটের লিডারকে বল্লাম, এই ত বোধ হয় ভবিষ্যতের জার্মাণীর মানচিত্র?

—কি করে বুঝলেন মসিয়ে?

—ডেন্‌জিগ একেবারে নিয়ে যেতে চান, এতে যে পোলন্দের সাগরে যাবার পথও থাকবে না?

দলপতি আমার দিকে চেয়ে বল্লে, এই মানচিত্র কি আপনি পছন্দ করেন না? এটাই হল আমাদের ভবিষ্যতের জার্মাণী। আমরা এর জন্যে সবই দিতে প্রস্তুত। আপনি মানচিত্র বেশ ভাল বুঝেন দেখছি?

—হাঁ, নিশ্চয়ই আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে বলছি আপনাদের মানচিত্র খানা দেখে বড়ই সুখী হলাম। আমার ভ্রমণ সার্থক হয়েছে। এরূপ একখানা মানচিত্র কোথায় পাই বলুন ত?

কেন সর্বত্রই পাবেন। আমরা ত আমাদের মনের কথা লুকিয়ে রাখিনি। পৃথিবীর লোককে জানাবার জন্য আমরা মানচিত্র তৈরী

করেছি এবং বিনা মূল্যে বিতরণও করেছি। এই মানচিত্র আপনি নিয়ে যান। পথ থেকে আর একখানা মানচিত্র আমরা নিয়ে নিব।

তাদের দান গ্রহণ করে, তাড়াতাড়ি করে পথ চলতে লাগলাম। এক মাত্র উদ্দেশ্য মানচিত্রখানা আরও ভাল করে দেখা।

ক্রমাগত ভ্রমণ করা যেমন আরামদায়ক নয় তেমনি ক্রমাগত গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করাও ভাল লাগে না। ইউরোপীয় তুর্কীতে প্রবেশ করে একই রকমের গ্রাম আর একই রকমের শহর দেখতে আরম্ভ করেছিলাম তা আমার কাছে আর ভাল লাগছিল না। নূতন কিছু দেখার প্রবৃত্তি জেগেছিল। কিন্তু ইউরোপের গৃহ গঠন প্রণালী একই ধরণের বলে নূতন বলে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সবই আমার কাছে পুরাতন ঠেকছিল। খাদ্যের দিক দিয়েও নূতন কিছুই পাচ্ছিলাম না। ইন্দো-ইউরোপিয়ান খাদ্য আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না। তিক্ত, ঝাল ইত্যাদি খাবার খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সে খাদ্য ইউরোপের কোথাও পাওয়া যায় না। স্পেনিশ এবং গ্রীক খাদ্যে ঝাল থাকে বটে কিন্তু তিক্ত হয় না। ইন্দো-ইউরোপীয় খাদ্যে টক আছে বটে, কিন্তু সে টক অন্য ধরণের। ঘোলের সংগে নুন্ ব্যবহার করে না। মাংস আছে বটে কিন্তু সে মাংসে কোনরূপ মসলা ব্যবহার করে না। মন এবং শরীর যদি সতেজ না থাকে তবে নূতন কিছু দেখবার শক্তিও থাকে না। আমার শক্তি কমে যাচ্ছিল। মন দুর্বল হয়ে আসছিল। শুধু বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

বার্লিনে পৌঁছানোর জন্য মনটা আইঢাই করছিল। পথ যেন কমছিল না। সাইকেলে পেডেল করলেও সাইকেল যেন চলত না। শরীরে কোনরূপ রোগ ছিল না, খাওয়াও কম খেতাম না। সকাল থেকে আরম্ভ করে শোবার পূর্ব পর্যন্ত কমের পক্ষে দুসের দুধ, একটা বড় রুটি,

ছটা ডিম, দশ বার কাপ কাফি, মধু, মাংস ইত্যাদি খেতাম, তবুও মনে হ'ত যেন কিছুই খাইনি। এক দিন একজন ডাক্তার দিয়ে শরীর পরীক্ষা করলাম। তিনি আমার দেশের খাদ্য কি তাই জানতে চাইলেন। তাকে জানালাম আমার দেশের খাদ্য হ'ল ডাল ভাত ইত্যাদি। ডাক্তার বল্লেন দেশের খাদ্য খেলেই সকল অবসাদ দূর হবে। শরীরে কোনও রোগই নাই। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বার্লিনের দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম কিন্তু বার্লিন আরও তিন দিনের পথ।

আর তিন দিন পর বার্লিন পৌছুব। এটা কি কম আনন্দ? পথের দুটা শহরে কিছুই দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু পথ ত আমাকে ছাড়ে না। পথের দুপাশের দৃশ্যাবলী দেখতে হয়ই। তখনও বার্লিন হতে এক শত কিলোমিটার দূরে ছিলাম। পথে চলার সময় পথের পাশেই বসে খেতাম। সেদিনও পথে খেতে বসেছি, এমনি সময় পাইন বন হতে একটি প্রৌঢ় কাছে এসে বসল। তার পরনে ছেঁড়া কাপড়, শরীরে দুর্গন্ধ, মাথায় উকুন। দেখলেই মনে হয় লোকটি দরিদ্র এবং কর্মে অক্ষম। আমার যা দরকার তাই রেখে বাকি খাদ্যগুলি লোকটিকে দিয়ে দিলাম। লোকটি তৃপ্তির সহিত আমার দেওয়া খাদ্য খেল কিন্তু একটাও কথা বল্ল না। উঠে আসার সময় তাকে হাইল হিটলার বলতে ভুলিনি। লোকটা কিন্তু তারও কোন জবাব দেয়নি। ভাবলাম হয়ত লোকটা কানে শুনে না। এই ধারণা আমার পরবর্ত্তী শহরে না পৌছানো পর্যন্ত ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী শহরে এসে শুনলাম এরাই হল পলাতক কমিউনিস্ট। এদের কোনও কাজ দেওয়া হ'ত না। সক্ষম কমিউনিস্টরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিল আর অক্ষম কমিউনিস্টরা পথে অথবা বনে জংগলে জীবন কাটাচ্ছিল। শহরের লোকের কথা আমার বিশ্বাস হয়নি, বার্লিনে গিয়েও এ সম্বন্ধে কোনও সন্ধান নিতে

পারিনি কিন্তু হেনোভারে পৌঁছে এ বিষয়টার একটি মনমত জবাব পেয়েছিলাম।

হেনোভারে যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে বসে গল্প গুজব করতেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, জার্মাণীতে যে সকল বিদেশী পায়ে হেটে অথবা অন্য কোনও প্রকারে এসে পড়েছে অথচ তাদের খাদ্যের কোনও সংস্থান নাই তারাই আজকাল এদেশে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। নাৎসী ভাবাপন্ন লোক এদের সাহায্য করতে রাজি হয় না এমন কি এসব লোককে মরতে দেখলেও দুঃখ প্রকাশ করে না। আমি ঐ ভদ্রলোককেই, বলেছিলাম, আমাকে কিন্তু নাজীরা ভাল ব্যবহারই দেখিয়েছে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আপনি হলেন পর্যটক। জার্মাণ জাত পর্যটকের মূল্য বেশ বুঝে। দেশে যখন যাবেন তখন জার্মাণ জাতের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবে, তখন যদি আপনি ক্রমাগত জার্মাণদের বিরুদ্ধে বলেন তার কুফলই হবে। আপনি যখন ইংলণ্ডে যাবেন, দেখবেন ইংলিশরা আপনার দিকে তাকাচ্ছেও না কারণ ইংলিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদ আপনাদের দেশে চিরস্থায়ী করেছে। জার্মাণদের জার্মাণীর বাইরে কিছুই নেই, এরূপ অবস্থায় যদি আপনার মত একটি পর্যটককে ক্ষেপিয়ে তোলা হয় তবে আপনি আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই কিছুটা ছাই ঢেলে দেবেন। এই ভদ্রলোকই হেনোভার হতে বিদায়ের সময় আমাকে তাঁর নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন। অ.নক পথ আমার সংগে হেটে আমস্টারডমের দিকে এসেছিলেন। ।কন্তু যখন পৃথিবী ভ্রমণ করে দেশে ফিরলাম তখন দেখলাম তাঁর ঠিকানাযুক্ত কাগজখানা হারিয়ে গেছে। সেই কাগজখানা হারাবার জন্য আমার বেশ দুঃখ হয়েছিল। যদিও ভদ্রলোকের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিলাম তবুও তাঁর মুখ এখনও আমার মনে বেশ একটা ছাপ মেরে রেখেছে।

ইয়থ্ লিগ্

শহরে গ্রামে সর্বত্র ইয়থ লিগ্। এটা গ্রাম। এই গ্রাম আমাদের দেশের গ্রাম নয়। গ্রাম উন্নত। গ্রামের ঘরের সংখ্যা হবে দুশ মাত্র। কোনও ঘর এক তলা, আর কচিৎ দু একখানা ঘর দুতলা। গ্রামে গৃহপালিত পশু নেই। গ্রাম এত পরিষ্কার যে সেরূপ গ্রাম সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজলে একখানাও পাওয়া যাবে না। এরূপ সুন্দর গ্রামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেজন্য পথ ছেড়ে গ্রামে গেলাম। ভুল করে একটি ক্লাবে গিয়ে উঠলাম। ক্লাবের লোক তখন উচ্চস্তরের পলিটিক্স চর্চা করছিল। কয়েকজন ইহুদীও সেখানে ছিল। ইহুদীরা নানা ভাষায় অভিজ্ঞ। আমার সংগে তারা ইংলিশে কথা বলল। তাদের কাছে আমার পরিচয় দেই। আমার পরিচয় পেয়ে ক্লাবের সকলেই সুখী হয়েছিল কিন্তু যখন আমি মন খুলে কথা বললাম তখন তারা দুঃখিত হয়। এদের ছেড়ে দিয়ে অন্য আর একটি ক্লাবে যাই। এখানের লোকগুলির কথাবার্তা বেখাপ্পা শুনাচ্ছিল। কখন পুরুষ স্বরে আর কখন বা স্ত্রীস্বরে কথা বলছিল। প্রকৃত পক্ষে এরা আত্মগোপন করার চেষ্টা করছিল। দ্বিতীয় ক্লাবে বেশিক্ষণ না বসে পূর্বের ক্লাবেই ফিরে আসি। তারপর আবার মন খুলে কথা। এই ক্লাবটি হিটলার ইয়থ্ লিগ্ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল না। এটা ছিল সাধারণ ক্লাব। যে কেউ এখানে সভ্য হয়ে সন্তরণ, হাইকিং, বাইকিং ব্যায়াম করতে পারত। তবে সকলকেই নেসনেল সোশিয়েলিষ্ট মত মেনে চলতে হত। আমি তখনও নেসনেল সোসিয়েলিজম কাকে বলে জানতাম না। এখানে এসেই নেসনেল সোসিয়েলিজম কাকে বলে জানতে পেরেছিলাম। নেসনেল সোসিয়ে-

লিজমের মানে বড়ই সুন্দর এবং আমাদের দেশের মহাভারতীয় যুগের সংগে বেশ খাপ খায়। অবশ্য একথাটা আমার নিজের মত ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাঘিনী উপযুক্ত ভক্ষ্য জীব মেরে গর্তে নিয়ে আসার পর তার শিশু শাবকদের খেতে দেয়। হরিণের যে প্রাণ গেল সেজন্য ব্যাঘ্র শাবক অথবা বাঘিনী একটুও চিন্তা করে না। কিন্তু আমরা মানুষ। আমরা বাঘ নই। আমাদের সমাজ আছে। আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান আছে। আমাদের দয়া মায়া আছে। আমরা সমাজের ভেতর স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে বাস করি। আমরা একের দুঃখে অন্যের কাছে প্রকাশ করি। আমাদের যদি বাঘিনীর মত হয়ে জীবন কাটাতে হয় তবে চলবে কেন, আমরা যে পশুই হয়ে যাব।

নেসনেল সোসিয়েলিজম হল, এক জাতের লোক অন্য জাতকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তাদের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিজের জাতের লোকের কাছে বণ্টন করে বিলিয়ে দিতে চায়। এখানে সাম্রাজ্যবাদের কথা না বলে নেসনেল সোসিয়েলিজমের কথাই শুধু বলছি।

অন্য আর একটি জাতকে যদি লুটতে হয় তবে নিজেরও শক্তি অর্জন করতে হয়। সেই শক্তি অর্জনের জন্যই জার্মানীতে ইয়থ্ লীগ্ গুলির জন্ম হচ্ছিল। অনেক দেশেই ইয়থ্ লীগের জন্ম হয়। কিন্তু কোথাও টিকে থাকতে পারে না, তার একমাত্র কারণ হল, তারা গভর্ণমেণ্টের কোনও প্রকার সাহায্য পায় না। অনেক সময় দেখা যায় ইয়থ লীগগুলিকে গভর্ণমেণ্ট ভয় করে। জার্মানীতে তার বিপরীত ছিল। প্রত্যেকটি ইয়থ লীগকে গভর্ণমেণ্ট নানা প্রকারে সাহায্য করত এবং এতেই জার্মানীর ইয়থ লীগ তাড়াতাড়ি গড়ে উঠছিল।

জার্মানীর চাষারা বড়ই নিরীহ লোক। তারা আমাদের দেশের

চাষা হতেও নিরীহ। আমাদের দেশের যে সকল চাষার জমি নাই, তাদের মাথা গুজবার একখানা ঘর আছে। চাষের কাজ ছাড়াও আমাদের চাষারা ভিক্ষা, সামান্য দ্রব্য নিয়ে ফেরী করা ইত্যাদি ত করেই উপরন্তু প্রকৃতির কাছ থেকেও নানারূপ সাহায্য পায়। সেজন্যই আমাদের চাষা বৎসরের কিছুদিন ক্ষেতের কাজ না করেও বাঁচতে পারে। কিন্তু জার্মানীতে তা হবার সুযোগ এবং সুবিধা তখনও ছিল না, এখনও নাই এবং যতদিন প্রলিটরিয়েট সোসিয়েলিজম্ না হবে ততদিন তাদের নিরীহ ভাবেই জীবন যাপন করতে হবে।

জার্মানীর কৃষক মজুর প্রত্যেক সপ্তা ঘর ভাড়া দেয়। দৈনিক মজুরী না পেয়ে প্রত্যেক শনিবারে মজুরী পায়। প্রত্যেক শনিবারে জার্মাণ কৃষক মজুরকে ঘরভাড়া না দিলে রবিবার সকালে ঘর পরিত্যাগ করতে হয় এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে পথে দাঁড়াতে হয়। এই যাদের জীবন তারা চাষার আদেশ মাথা পেতে মানবে না ত কি করবে? এরূপ নিঃস্ব লোকের মধ্যে কমিউনিজম্ প্রচার করা সহজ বটে কিন্তু শ্রমসাধ্য কাজ। কমিউনিজম্ প্রচার করার পূর্বে কি করে কৃষক মজুরগণ তা গ্রহণ করবে তাই ভাবা কর্তব্য, কিন্তু জার্মাণ কমিউনিষ্টেরা সে সময় পায়নি।

হিটলার সর্বপ্রথমই চাষার ঘাড়ে চাপলেন অথবা চাষারা তার সহায়তা পেল তাও বলা যেতে পারে। কৃষক মজুরদের কাজে উৎসাহী করা হল এবং তাদের ছেলে মেয়েরা যাতে হিটলার ইয়থ লীগে যোগ দেয় তারও বন্দোবস্ত করা হল। চাষা এবং কৃষক মজুরদের মাঝে অল্পক্ষণেই বিদ্রোহ ভাব লোপ পেল এবং কমিউনিষ্টদের দ্বারা বিদ্রোহ ভাব বন্ধুভাবে পরিণত হল। এই গ্রামে এসে তাই দেখলাম। যে দিন থেকে চাষা এবং কৃষক মজুরের মাঝে সখ্যভাব হয়েছিল, সেদিন থেকেই

চাষারা আট ঘণ্টার বদলে দশ ঘণ্টা করে কাজ করতে আরম্ভ করল। হিটলারকে পিতা স্বীকার করে নিয়ে সময়ে অসময়ে হাইল হিটলার বলে আনন্দ করছিল। হিটলার ছিলেন মানুষ, কৃষক মজুরের কল্যাণে হয়ে গেলেন দেবতা। রাতারাতি হিটলারের দেবতারূপে পরিণত হবার একমাত্র কারণ ছিল—চাষারা যেমন হিটলারকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছিল তাদের ভৃত্যও তেমনি করে হিটলারকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছিল।

পূর্বে কৃষকমজুরদের ছেলে বাঁচল কি মরল সে সংবাদ চাষা যেমন নিত না, অন্যান্য লোকও তেমনি নিত না। কৃষকমজুরদের শিশু মরলে চাষাদের আনন্দ হত, হিটলারের সময় তা হবার উপায় ছিল না। চাষা নিজে এসে হস্‌পিটালে রোগী দেখে যেত, পুলিশ ডাক্তারের কাজ কর্মের উপর লক্ষ্য রাখত। লোকে বুঝতে পারত এবার তাদের সুদিন এসেছে। হিটলার বাস্তবিকই তাদের পিতা। সেজন্য তারা তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পর্যন্ত ইয়থ লিগের সভ্য করতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করত না।

ইয়থ লিগের কাজকর্ম কেমন চলছে তা দেখার জন্য বিদেশ হতে লোকও আসত। এতে ইয়থ লিগের পাণ্ডাদের কর্মপ্রেরণা আরও বেড়ে যেত। বৃটিশ ধনীরা লোক পাঠাত। তারা হিটলার ইয়থ লিগের পাণ্ডাদের সংগে মিশত এবং যাতে তাদের রাতারাতি উন্নতি হয় তারই জন্য উপদেশ দিত। ফ্রেঞ্চরা কিন্তু ইয়থ লিগের লোককে ভাল চক্ষে দেখত না এবং ফ্রান্সে যে সকল ইয়থ লিগের লোক বেড়াতে যেত তাদের ভিক্ষাও দিত না। এক দিন একজন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক আমাকে কতকগুলি ফ্রাংক দিয়ে বলছিলেন, আপনাদের দেশ হতে এবৎসর কতজন পর্যটক বের হয়েছে? আমি বলছিলাম, একজনও বোধহয়

বের হয়নি। তিনি বলছিলেন, দেখুন ত মশাই, এত বড় ইণ্ডিয়া হতে একজনও পর্যটক বের হয় না অথচ এক জার্মানী হতেই লক্ষ লক্ষ পর্যটক বের হচ্ছে, তার কারণ কি? আমি তার জবাব দেইনি।

বিকালে দেখলাম অনেক জমিবিহীন চাষা কাজ থেকে ফিরে আসার সময় নানারূপ গান গেয়ে বিয়ারের দোকানে প্রবেশ করছে। তাদের প্রত্যেককে যেমন লক্ষ্য করছিলাম, তারাও তেমনি আমাকে লক্ষ্য করছিল। এই চাষাদের মধ্যে একজন লোক পূর্ব আফ্রিকার টাংগানিয়াকা দেশের ফেরতা ছিল। সে আমার কাছে এসেই বল্ল—তবে তুমি নিগ্রো নও?

—না।

—কোন দেশে তোমার বাড়ি?

—ইণ্ডিয়া।

—বেশ ভাল কথা। আমরা ইণ্ডিয়ানদেরে বড়ই ভালবাসি। তুমি বেনে না মুসলমান? প্রত্যুত্তরে বললাম, আমি বেনেও নই মুসলমানও নই, আমি বাঙ্গালী, আমার দেশ কলকাতায়। বেনে এবং মুসলমান শিখলে কোথায়? তুমি কি কখনও আফ্রিকাতে ছিলে?

—হাঁ ছিলাম কমরেড। আমি টাংগানিয়াকা দেশের একজন "বানা সাউরী" ছিলাম। নানা ভাষায় কথা বলতে পারি। এই নেও বিয়ার। লোকটির হাত হতে বিয়ারের গ্লাসটা নিয়ে একটু একটু করে খেতে আরম্ভ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম—

—বানাসাউরী মানে কি?

—বানাসাউরী মানে হল মাজিষ্ট্রেট্।

টাংগানিয়াকার একজন মাজিষ্ট্রেটকে মজুর চাষারূপে দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। তার দেওয়া বিয়ারের গ্লাসটা নিঃশেষ করে বললাম,

এখন বিদায় ম্যাজিষ্ট্রেট, আমাকে বার্লিনে যেতে হবে। সে আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিল।

পথে এসে আর অপেক্ষা করলাম না। প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই LUCKEN-WALDE নামে একটি ছোট্ট সহরে পৌঁছলাম। সর্বত্রই টাইলের ছানি দেওয়া ঘর। গ্রামের পাশেই কতকগুলি ফ্যাক্টরী। ফ্যাক্টরীর চিমনীগুলি দিয়ে প্রবল বেগে কালো ধোঁয়া বের হয়ে উর্দ্ধাকাশে গিয়ে বিলীন হচ্ছিল। দলে দলে লোক কেউ বা ফ্যাক্টরীতে কাজে যাচ্ছিল আর কেউ বা দিনের খাটুনী খেটে ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে ফিরছিল। যারা কাজে যাচ্ছিল তাদের মুখও মলিন ছিল, আর যারা ফ্যাক্টরী হতে বের হয়ে আসছিল তাদের দিকে চাইতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না।

ছোট্ট শহরের মুখের কাছেই একটি দুধের কেনটিন। সেখানে গিয়ে পেট ভরে দুধ খেয়ে হোটেলের দিকে যাচ্ছি এমনি সময় কতকগুলি সাইকেলওয়ালা যুবকের সংগে দেখা হ'ল। তারা জিজ্ঞাসা করল আমি আবিসিনিয়ার লোক কি না? যখন জানল আমি ভারতবাসী তখন সকলেই আমার প্রতি একটু আগ্রহ করে চাইল এবং নিকটস্থ সর্ববৃহৎ হোটেলে নিয়ে গেল। সর্ববৃহৎ হোটেলের দৈনিক ভাড়া এক মার্ক পঞ্চাশ সেণ্ট। মজুর পল্লীর হোটেল এর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে? হোটেলে পৌঁছে যুবকদের আমিই আপ্যায়ন করলাম। যুবকগণ বেশ আনন্দের সহিত আমার সংগে কথা বল্‌ল কিন্তু হঠাৎ তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল এবং মুখের রং বদলে গেল। একে একে সবাই চলে গেল। ব্যাপারখানা জানবার জন্য একটু অপেক্ষা করলাম। কতক্ষণ পর একজন লোক আসল এবং আমার সংগে বিশুদ্ধ ইংলিশে কথা আরম্ভ করল। বুঝলাম তিনি পুলিশের লোক। লোকটি এস্ এস্

বাহিনীর হোক আর যে কোনও বাহিনীর হোক ভয়ের কারণ ছিল না। ভয় ত খনই হয় যখন শরীর দুর্বল থাকে।

অপ্রিয় কাজ করা পর্যটকের পক্ষে উচিৎ নয় উপরন্তু আমি ছিলাম পরাধীন দেশের লোক। পরাধীন দেশের পক্ষে ভবঘুরে বৃত্তি বড়ই অন্যায় কাজ। সেকথাটা জানতাম বলেই বড় বড় কথা কখনও বলতাম না। এই নবাগত লোকটির সংগেও বেশ ভদ্রভাবেই কথা বল্লাম। পুলিশের লোক স্পষ্ট কথায় আমাকে জানিয়ে দিলেন তিনি গুপ্ত পুলিশের লোক, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তাই দেখতে এসেছেন। আমিও স্পস্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম, কষ্ট আমার হবে না। সর্বত্র আমি সাহায্য পেয়ে এসেছি, এখানেও তাই পাব এই ধারণাই আমার আছে। পুলিশ কথা প্রসংগে বেখাপ্পা ভাবে আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—

—আপনি কি রুশিয়ায় গিয়েছিলেন ?

—না।

—যাবার ইচ্ছা আছে ?

—সাইকেলে করে যাব না।

—কেন ?

—রুশিয়ার পথ এখনও বাইসাইকেল চালাবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। মোটরকার, মোটর সাইকেল চালানো যেতে পারে বটে তাও বৎসরের সকল সময় নয়। আমার সে ভৌগলিক জ্ঞান আছে।

—কমিউনিজম সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

—এখনও কোনও ধারণা করিনি। এখন শুধু ভ্রমণের ধারণাই করি। এই ধরুন আপনাদের দেশে এসেছি, শুধু পথের সন্ধানই নেই,

জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

হার হিটলার কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন এসবের সন্ধান আমি নেই না। পথের লোক পথ চলতে পারলেই হল।

—এখন আপনি কোথায় যাবেন?

—বার্লিন।

—সেখান থেকে?

—আমস্টার্ডম।

—তারপর?

—প্যারী হয়ে লণ্ডন।

—মাদরীদ্ যাবেন না?

—না?

—কেন?

—দরকার মনে করি না।

—বেশ ভাল কথা। আপনি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য পাবেন। আপনি আপনার ভাবে পথ চলবেন। বার্লিনে গিয়ে যেখানেই থাকুন না কেন, একবার আল্‌হাম্ব্রা সিনেমাতে যাবেন। সেখানে গেলে সিনেমা ম্যানেজার আপনাকে একটা বড় স্টুডিওতে নিয়ে যাবেন। সেখানে আপনার চিত্র উঠান হবে। এতে আপনার বেশ নাম হবে। আচ্ছা এখন বিদায়, হাইল হিটলার।

—হাইল হিটলার।

তারপর হোটেলের উপরে গিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। বুঝলাম বাতাস কোন দিকে বইছে। এদিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন চলছে, অন্যদিকে সোভিয়েট রুশের প্রতি এত সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে যাতে বুঝা যায় এক দিন কিছু ঘটবেই। ঘটেও ছিল। যা ঘটেছিল তারই ফলে আজ হিটলার নিহত আর জার্মাণী পদানত।

পদানত সাময়িক। জার্মাণী আবার উঠবে। কিন্তু মত ও পথ বদলিয়ে আবার সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাসের কারণ হবে।

পরের দিন সকাল বেলাই পথে বের হয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম আজই বার্লিন পৌঁছব। পথ আগিয়ে যেতে লাগলাম কিন্তু বড় বড় শহরের গন্ধ যেমন দূর থেকেই পাওয়া যায় তেমন গন্ধ পাচ্ছিলাম না। বেলা তখন এগারটা হবে। পথের পাশেই একটু বিশ্রাম করলাম তারপর কয়েক কিলোমিটার চলার পরই ট্রাফিক বাড়তে লাগল। "কিপ টু দি রাইট" বড় বড় অক্ষরে পথের পাশে লেখা রয়েছে দেখতে পেলাম। নানা রকমের মোটরকার, বাইসাইকেল, মোটর ট্রাক ক্রমাগত চলছিল এবং এরপর কতক্ষণ চলার পরই ফুটপাথের দেখা পেলাম। আমি ভাবছিলাম বোধহয় এবার বার্লিনে এসে পড়েছি। পাশের পথটার দিকে চেয়ে পকেটে বার্লিনের মানচিত্রের কথা মনে হ'ল। সাইকেল হতে নেমে পকেট হতে মানচিত্রখানা বের করে উলেন্ ত্রাসে কোথায় হবে তাই দেখছিলাম। ঠিক সেই সময় কতকগুলি যুবক এসে দাঁড়াল। তাদের ইংগিতে উলেন ত্রাসে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, স্থানটা কোথায় হবে? তারাও ইংগিতে তাদের সংগ নিতে বল্ল। যুবকের দল শহরে দুধ নিয়ে যাচ্ছিল। তা বলে তাদের যেন গোয়ালা ভাবা না হয়। আমাদের দেশে যারা দুধ বিক্রি করে অথবা সেই জাতীয় কাজ করে তাদের আমরা গোয়ালা বলি, কত অবজ্ঞা করি, কিন্তু তারা সেরূপ নয়, তারা সকলেই জার্মাণ। তাদের দেশে জাতিভেদ নাই। অনেক বিলাত ফেরতা ইংলণ্ডে জাতিভেদ আছে বলেন শুনেছি, এসব অশিক্ষিত লোকের কথা কানে নেওয়া বড়ই অন্যায়। আমাদের দেশের জাতিভেদের মত জাতিভেদ নর সমাজে কোথাও প্রচলিত নেই। ইউরোপে আজ যে লোকটি দুধ বিক্রি করছে

আগামী কল্য সে পত্রিকার সম্পাদকও হতে পারে। তার নামের পেছনে গোপ অথবা গয়লা বলে কোনও উপাধি থাকেনা।

দুধ বিক্রেতা যুবকদের সংগে অন্ততপক্ষে দ্বাদশ কিলোমিটার পথ চলে যখন উলেনত্রাসে এলাম তখনও তারা আমাকে পরিত্যাগ করল না। ইণ্ডিয়ান্ হোস্টেলের কাছে এনে ইংগিতেই জিজ্ঞাসা করল, এটাই কি সেই স্থান"? তাদের ধন্যবাদ দিলাম এবং একটু জলযোগ করে যেতে অনুরোধ করলাম কিন্তু তারা তাতে রাজি হল না। তারা "কর্ত্তব্য করেছে" বলে হাসি মুখে বিদায় নিয়েছিল। এরূপ কর্তব্যপরায়নতা আমাদের দেশেও দেখেছি, তবে তা খুবই কম। ১৯৩৩ সালে যখন চীন জাপান ভ্রমণ করার পর দেশে এসেছিলাম তখন এরূপ বদান্যতা ইন্টার্ণড অথবা এক্স্টার্ণড দেশপ্রেমিকদের মধ্যেই দেখতে পেতাম। বাস্তবিক স্বাধীন চিন্তাধারা স্বাধীনতা প্রিয় লোকের মাঝেই আসে এবং তাদের মনও রাতারাতি উদার হয়ে যায়।

যে সকল যুবক, আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছিল, তারা হল কৃষক মজুর। তারা তাদের নিজেদের ঘর হতে দুধ এনে বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিল না; তারা ডেয়ারী ফার্মে চাকুরি করত। যাদের কাছে চাকুরি করত তারাই দুধ বিক্রি করতে শহরে পাঠিয়েছিল। দিনের কাজ সমাপন করে তারাও ইয়থ লিগের ক্লাবে গিয়ে আমোদ প্রমোদ করত।

কাফেতে লোকে লোকারণ্য। হোটেলগুলি সকল সময়ই পারপূর্ণ। ফুটপাথে লোক অনবরত চলছে। কাবেরেতে বিদেশীরা নৃত্য করছে। বার্লিন যা হবার তাই বাহ্যত দেখাচ্ছে শুধু দু এক জন লোক দেখা যাচ্ছে যাদের দেখা মাত্র লোক পথ ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সিনেমা, থিয়েটার সর্বত্র লোকে আমোদ করছে। ছোট

ছোট ক্লাবগুলিতে লোকে মামুলী খাবার খেয়ে মনে প্রাণে যা বলছে তা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না বটে তবে এটা বুঝতাম, তারা চায় সমুদয় জার্মাণ জাতটাকে একত্রিত করতে। অষ্ট্রিয়াকে তারা চাইছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা তাতে বাদ সাধছিল। তারা চাইছিল সুডেটেন, ডেনজিং এবং আরও অনেক স্থান, যে স্থানগুলিতে জার্মাণরা বাস করত। কিন্তু চাইলে ত হয় না, চাওয়ার মত শক্তি অর্জন করতে হয়। শক্তি নানা রকমের। হাতিয়ার দিয়ে যদি মানুষকে জয় করা যেত তবে পৃথিবী একটি রাজ্যে পরিণত হ'ত। মানুষকে হাতিয়ারের সাহায্যে জয় করা যায় না, সেজন্য ছোট ছোট ক্লাবগুলিতে "কালচারের" চেষ্টা হত। লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত আমরা জার্মান, আমাদের জাতভাইদের একত্রিত করতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে? কিন্তু এই কথাটার ভেতরেই এমন একটি টান থাকত যাতে লোক উত্তেজিত হতে বাধ্য হত। লোক উত্তেজিত হলেই প্রপেগেণ্ডা সার্থক। "কালচারেল এসোসিয়েসন" গুলিই সেই উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারছিল।

বার্লিনে অতিথি হয়েছিলাম মিঃ গুপ্তের হোস্টেলে। খাওয়া থাকা মুফত পেতাম। গুপ্ত আমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন। তাঁর সে দয়ার কথা এখনও ভুলিনি, কিন্তু আর কিছু দেন নি। গুপ্ত বুঝেছিলেন আমি বাস্তবিকই একজন নিরীহ ভবঘুরে, খাওয়া থাকা ছাড়া আমাকে দেবার মত তাঁর আর কিছুই ছিল না। এতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। বাইরের লোকের সংগে মিশতাম আর ডাইরী লিখতাম। ডাইরীতে অনেক কথা লিখতাম।

ঘুম থেকে যখন উঠতাম তখন মনে হ'ত বার্লিনে গতরাত্র কাটিয়েছি। এই শহরটি দেখার জন্য কত রকমের উদ্যম করে, তাতে কেউ কৃতকার্য হয় আর অনেকেই অকৃতকার্য হয়। আমি সেই বার্লিনে বেড়াচ্ছি

অথচ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হিটলার বার্লিন ছেড়ে ব্যভেরিয়ায় গেছেন। তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ কোথায় কে জানে। এখানেই ত রাইখস্টেগ স্থানটি, দেখলে হয় না? হঠাৎ মনে হল, এসব স্থানে গিয়ে লাভ কি? একটা পুরাতন বাড়ি মাত্র। এই বাড়িটার সংগে মানুষের যতটুকু সম্বন্ধ ততটুকু শেষ হয়ে গেছে। সেই আগুন দেখতে পাব না, আর সেই সেপাইদের হাল্লা গোল্লাও শুনতে পাবনা। আজ বার্লিনে কমিউনিষ্ট নেই, সবাই আজ উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। নাজী অথবা ফ্যাসিস্ত শব্দগুলি ব্যবহার করলাম না, কারণ এতে লোকের ধাঁধা লাগে।

বার্লিনে পৌছানোর দ্বিতীয় দিন আলহাম্‌রা নামক একটি ষ্টুডিওতে যাবার পথে একটি কালচারেল এসোসিয়েসনের দরজায় এসে দাঁড়াতেই এক জন লোক আমাকে ডাকলেন, এটা যে কালচারেল এসোসিয়েসন তা আমার জানা ছিল না। লোকটি বেশ ভদ্র এবং বেশি সাদা। সাধারণতই শ্বেতকায়দের মুখ একটু রক্তাভ থাকে কিন্তু যে লোকটি আমাকে ডেকেছিলেন তার মুখ এতই সাদা যে দেখলেই মনে হয় লোকটি রোগা। আসলে কিন্তু তা নয় তিনি রোগী ছিলেন না। তিনি বল্‌লেন তাঁর রংটাই বেশি সাদা। তিনি ইংলিশ ভাষায় সুপণ্ডিত। আমাদের দেশে বড় বড় শব্দ ব্যবহার করে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা হয়, ইউরোপে তার বিপরীত। ছোট ছোট কথায় এবং কম শব্দে মনের ভাব যারাই প্রকাশ করতে পারে তারাই ভাষার দিক হতে পণ্ডিত। নাম উচ্চারণ করতে পারছিলাম না অবশেষে বাধ্য হয়ে বল্‌লাম, আপনার নাম উচ্চারণ করতে আমার বড়ই বেগ পেতে হয় সেজন্য আপনাকে কি বলব বলুন ত? ভদ্রলোক একটু আমতা আমতা করে বল্লেন, "স্কাণ্ডেনেভিয়ান্" বলে ডাকলে আপত্তি করব না। আপনার দেশ বুঝি স্কাণ্ডেনেভিয়াতে? কথাটা বলেই লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তৎক্ষণাৎ

ভদ্রলোক বল্লেন তাঁর দেশ সুইডেন্, জাতে নরউইজিয়ান্। উত্তরে তাঁর দেশ। জার্মানীতে বেড়াতে এসেছেন। উৎসাহভরে বল্লাম, নরওয়েতে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু সাইকেল নিয়ে সেখানে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে না। এদিকে শীতও এসে পড়ল নতুবা যেতাম নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক আমার পরিচয় চাইলেন। পরিচয় দেবার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কালচারেল এসোসিয়েসনের মানে কি বলতে পারেন?

বল্লাম, যেখানে বসে লোক সমাজের হিত এবং অহিত বিষয়-গুলির আলোচনা করে এবং কি করে সমাজের অহিত জনক আচার ব্যবহার দূর হয় তারই উপায় ঠিক করে তাকেই কালচারেল এসোসিয়েসান বলে মনে হয়, তবে আজকাল রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরী করার জন্য এই কথাটির বড়ই অপব্যবহার হচ্ছে।

ভদ্রলোক লাফ দিয়ে উঠে বল্লেন, আপনি আমার মনের কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন, আমিও কালচারেল এসেসিয়েসানকে সেরূপই ভাবি কিন্তু জার্মানীতে আসার পর দেখতে পাচ্ছি, এখানকার লোক বিষয়টাকে অন্য ছাপ দিয়েছে। তারা শুধু তাদের জাতীয় গৌরবের বিষয়ই চিন্তা করে। তারা ভাবে তারাই শুধু নরডিক। নরডিকরা এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব করবে। বৃটিশদেরও এরা নরডিক্ বলে এবং বৃটিশদের এরাই চোখ রাঙ্গিয়ে বলতে আরম্ভ করেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে জার্মানদেরও ভাগ দিতে হবে; এটা কি সম্ভবপর? আপনি ত বৃটিশ প্রজা, কেমন নয় কি? যদি পারেন তবে কি আপনারা স্বাধীন হতে চেষ্টা করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু এরা চাচ্ছে বৃটিশদের ঘাড় মটকিয়ে তাদের রাজ্য দখল করে মনিব হতে। এর কি কোনও মানে হয়? আমি বল্লাম, এর মানে হয় ততদিনই যতদিন আমরা মানুষ না হব।

কালচারেল এসোসিয়েসনে জার্মেণীতে নারীর প্রবেশ নিষেধ। বিষয়টা আমার মোটেই ভাল লাগল না। যেখানে নারীর প্রবেশ নিষেধ সেখানে কোনও ভাল বিষয় চর্চ্চাই করা যেতে পারে না। এদিকে নূতন "ডিক্রি" করে আরবদের সংগে জার্মাণ স্ত্রীলোকের বিয়ে হবে না এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক আরবগণ মুসলমান এবং তাদের মতে চারটা স্ত্রী একই ঘরে রাখা যায়, কিন্তু যদি কোনও আরব খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে, একটি বিয়ে করে জার্মাণীতেই বাস করে তবে ক্ষতি কি? অনেক ইহুদী পরিবার তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি নাক সিটকানো হয় কেন? এসব নূতন কথা শুনে মনটা কেমন করতে লাগল।

ঘরের ভেতর কয়জন গম্ভীর হয়ে বসেছিল। আমি ছিলাম বাইরে দাঁড়িয়ে। বাইরে দাঁড়াতে ভাল লাগল না। ঘরের ভেতর গিয়ে কাফি দিতে বল্লাম। আমি যে টেবিলের কাছে বসেছিলাম সে টেবিলে এক জন জার্মাণও বসাছিল। সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর স্কেণ্ডেনেভিয়ান ভদ্রলোককে কি বল্ল।

ভদ্রলোক আমার কাছে এসে বল্লেন, আপনার নাক দেখে মনে হচ্ছে, আপনার শরীরে বেশ ইহুদী রক্ত আছে?

—নিশ্চয় আমার শরীরে ইহুদী রক্ত আছে। শুধু ইহুদী রক্ত নয়, দ্রাবিড় এবং মংগল রক্তেরও অভাব নেই। বুঝলেন, আমি তিলে খচ্চর। তাতে দোষের কিছুই নেই। আমিও একজন সভ্য লোক। আমার মধ্যে সমাজধ্বংসী দোষগুলি শিক্ষার প্রভাবে লোপ পেয়েছে। শরীরের রক্ত দিয়ে বিদ্যা বুদ্ধি এবং সভ্যতার পরিচয় দেওয়া চলে না। বুঝিয়ে দেন ওদের, কালচার বলতে আমি তাই বুঝি।

পরিচিত ভদ্রলোক কি বলছিলেন জানি না কিন্তু সেখানে আর বসে

থাকি নি। সোজা পথ ধরে একেবারে আলহামরা স্টুডিওতে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে ম্যানেজারের সংগে সাক্ষাৎ করি। ম্যানেজার অনেক বৎসর সিঙ্গাপুরে ছিলেন এবং মালয় ভাষা ভাল জানতেন। আমরা উভয়ে প্রাণ ভরে কথা বল্লাম এবং তাকে জানালাম, সিংগাপুরের জার্মাণ কন্‌সালই আমাকে মানুষ বানিয়েছিলেন ম্যানেজারের অনুরোধে কি করে জার্মাণ কন্‌সাল আমাকে মানুষ বানিয়েছিলেন সেই ঘটনাটি তাঁর কাছে বলেছিলাম।

আলহামরার ম্যানেজার আমার কখানা ছবি উঠিয়েছিলেন এবং আমি যেদিন হেনোভারের দিকে রওয়ানা হই সেদিন একজন ক্যামেরাম্যান্ আমার সংঙ্গে গিয়ে কতকগুলি ছবি উঠিয়েছিল। সেই ছবিগুলি পরে ফিল্মএ পরিণত হয়ে ইউরোপের অনেক স্থানে ছায়াচিত্রে দেখান হয়েছিল।

বার্লিনে ছিলাম মাত্র দ্বাদশ দিন। এই দ্বাদশ দিনের ডাইরী লিখেছিলাম অনেকগুলি ফুলস্কেপ। তার মধ্যে বাজে কথাও ছিল। অনেক বিষয়ে আমার অজ্ঞতা ছিল বলেই বাজে কথা লিখতে হয়েছিল। জার্মাণ জাতের মধ্যে জাতীয় ভাব এনেছিলেন বিস্‌মার্ক। এই পর্যন্তই আমি জানতাম, কিন্তু এক শতাব্দী পূর্বেও জার্মাণদের রাজধানী বার্লিন রুশিয়ান্‌রা আক্রমণ করে, বার্লিন অবরোধ করেছিল তা আমি জানতাম না। জার্মাণ জাত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সেই বিভক্ত জাতের মধ্যে একতার সন্নিবেশ করেছিলেন বিস্‌মার্ক এবং পরে উইলিয়ম জাতটাকেই জাতীয় প্রেরনার ভেতর দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ হবার পূর্বেই পর্দার আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর এসেছিলেন হিটলার। তিনি যখন বিজয় গর্বে গর্বিত তখনই তাঁর রাজধানীতে আমি গিয়েছিলাম।

জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

আমি ভেবেছিলাম বার্লিন নগরীতে জার্মাণদের রণনিপুণতার কিছু না কিছু দেখব। সিনেমা দেখে অনেক সময় আমরা নানা কথাই মনে পোষণ করে থাকি কিন্তু বার্লিনে যাবার পর সেখানে সেপাই এবং সেপাইদের সরঞ্জাম কিছুই দেখতে পাইনি। রোমের মুসলিনীর ছবি পথে ঘাটে নাকি দেখা যেত, কিন্তু হিটলারের ছবি বাজারেও দেখতে পাওয়া যেত না। হয়ত লোকের ঘরে ঘরেই হিটলারের ছবি বিরাজ করত। এক দিন অনেক অনুসন্ধান করে হিটলারের এক খানা ছবি কিনতে সক্ষম হয়েছিলাম। ম্যন্ কেম্ফ কেনারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ইংলিশ ভাষায় সে বই না পাওয়াতে আর কেনা হয়নি। তারপর যখন শুনতে পেয়েছিলাম এই পুস্তকে ভারতবাসীদের স্থান পরাধীনতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখার বন্দোবস্তই রয়েছে, তখন আর সে বই কেনার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না।

কালচারের স্তর যত উর্দ্ধেই উঠুক না কেন, মানুষ মানুষই থাকবে। মানুষের মনে পরিবর্তন আসতে পারে, মানুষ মনের শক্তিতে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে কিন্তু মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং অন্যান্য প্রবৃত্তি থাকবেই। যখন দেখা যাবে মানুষ এসবও পরিত্যাগ করে আপন মনে যত্র তত্র বেড়াচ্ছে তখনই বুঝতে হবে সেই মানুষটি নর সমাজ হতে খসে পড়েছে। হিটলারের আদেশে জার্মান নারী নরডিক পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সংগে কোন রূপ প্রেমালাপ করার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছিল। হিটলার পুরুষ। তাঁর পক্ষে নারীর প্রতি সে আদেশ দেওয়া সম্ভব। নারী দেশ প্রেমের মোহে, জাতের আত্মরক্ষার্থে অনেক সময় সে আদেশ মেনে নেয় বটে, কিন্তু নারীর অন্তরালে প্রবল বাসনা সহজে লোপ পায় না। নারী অল্পে তুষ্ট হয়। নারী শত দিকে শত ভাবে ধাবিত হয়। তার গতি কে রোধ করে? নরনারীর গতিকে

সংযত করা যায় কিন্তু রোধ করা যায় না। হিটলার বোধহয় সে কথাটা জানতেন সেজন্যই নারীর গতি সংযত করার আদেশ দিয়েছিলেন। যে দেশের নারী স্বাধীন ছিল তাদের পক্ষে "পাক ঘরে ফিরে চল" আদেশ-টিই অপমানজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিটলারের আদেশ জার্মাণ নারী সমাজে কেহ মেনেছিল আর কেহ অবজ্ঞাভরে তা পদতলে নিষ্পেষিত করেছিল।

আমাদের মধ্যে একটি নিয়ম আছে, সেই নিয়মটি হল, মেয়েদের বিয়ে দিতে হবেই নতুবা সমাজে মুখ দেখানো কষ্টকর হয়। সমাজচ্যুত হতে হয়। মেয়ের ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক মেয়েকে বিয়ে করতে হয়ই। ঠিক সেরূপ আর একটি আদেশ হিটলার দিয়েছিলেন। প্রত্যেক যুবতীকে বিয়ে করতে হবে এবং সন্তান উৎপাদন করতে হবে। ইত্যাকার আদেশ এশিয়া মহাদেশে দেওয়া চলে। এশিয়া মহাদেশে নারীর অধিকার বলতে যা আছে তার ব্যাখ্যা করে লাভ নাই কিন্তু জার্মাণী হ'ল নরডিক ভূমি, সেখানে নারীর অধিকার আর্থিক নিষ্পেষণ খর্ব করতে সক্ষম হয়নি। নারী স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম হ'ত, কিন্তু এই নূতন আইন কত বিভৎস তা চিন্তা করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ফ্যুরারের আদেশ' বিয়ে করতে হবেই। ছেলে উৎপাদন করতে হবেই। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই কথাটি তখন জার্মাণীতে প্রচলন হয়েছিল কিন্তু সেই কথাটি শুধু জার্মাণ নর এবং নারীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সিমেটিক রক্তের গন্ধও তাতে থাকবে না। এই আদেশ অবহেলা করার কারো অধি-কার ছিল না।

মুস্তফা কামাল পাশা আদেশ দিয়েছিলেন, যে সকল দরবেশ বিয়ে না করে নানারূপ অপ্রাকৃতিক উপায়ে কামরিপুর চরিতার্থ করে তারা

যেন অচিরে বিয়ে করে। আরও আদেশ দিয়েছিলেন বারবনিতাদেরও বিয়ে করতে হবে। এতে সমাজের উন্নতিই হয়েছিল। লোকে তা আনন্দের সহিত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু হার হিটলারের আদেশ আনন্দের সহিত সকল জার্মাণই গ্রহণ করেনি। উগ্রপন্থী সাম্রাজ্য-বাদীরাই শুধু গ্রহণ করেছিল।

পর্যটক অনেক কিছুই দেখে কিন্তু সকল কথা মুখ খুলে বলতে পারে না। জার্মানীতে এমন অনেকগুলি বিষয় আমি দেখেছিলাম যা আজ পর্যন্ত কারো কাছে বলতে সক্ষম হইনি। সেটা আমারই দোষ। ভাষায় যদি আমার অধিকার থাকত তবে মনের কথা প্রকাশ কর্ত্তে কতক্ষণ? কাশীদাসের মহাভারত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম কথা পড়ে কামের দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে বরং বিষয়টাকে আনন্দের সহিতই গ্রহণ করেন। এখানে পাঠকের বাহাদুরী নেই বাহাদুরী কাশীদাসের।

হিটলার ইয়থ দিগের কথা বার বার বলেছি। তাদের কর্মক্ষমতা, দেশভক্তি হিটলারের প্রতি শ্রদ্ধা এসব কথা বিশেষ ভাবে বলেছি। যা জেনেছি তাই বলেছি, এর বেশি কিছুই বলিনি। এখন এদের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে যাচ্ছি, কিন্তু ভয় হচ্ছে তা বলতে পারব কি না। পৃথিবীতে যত ইজম আছে তার মধ্যে পুস্তকে লিখিত অথবা নোটিশ বর্ণিত কতকগুলি বিষয়বস্তু থাকে কিন্তু এ ছাড়াও আর কিছু থাকে যা লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না, মুখে মুখেই সেই আদেশ এবং উপদেশ দেওয়া হয়। নাজি-ইজম সেই নিয়ম হতে রেহাই পায়নি।

সকলের সকল সময় বিয়ে করার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় তোমাকে এখনই বিয়ে করতে হবে তবে সভ্য জগতের লোক তা সহ্য করতে পারে না। হিটলার একটি মৌখিক আইন প্রচলন করেন, সেই আইন মতে যুবতী বিয়ে করুক আর না করুক তাকে

সন্তান উৎপাদন করতে হবেই। এই আইন প্রচলন হবার পর অনেকেরই প্রাকৃতিক কামভাবেরও লোপ পায়, কামভাবকে সজাগ করে দেবার নানারূপ উপায় নির্ণয় করতে গিয়ে এমন অনেক বিভৎস...সৃষ্টি হয়েছিল তা সভ্য ভাষায় বলা চলে না। সুখের বিষয় এ বিষয়টা নিয়ে কোনও ইউরোপীয়ান পর্যটক আজ পর্যন্ত কিছুই লিখেননি সেজন্য আমিও কিছু লিখলাম না। লণ্ডনে যাবার পর এ বিষয়টা নিয়ে অনেকের সংগে কথা হয়। যাদের সংগে কথা হয়েছিল তারা প্রায়ই ছিলেন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। তারা বলেছিলেন এ বিষয় নিয়ে যদি চর্চা করা হয় তবে যে সকল দেশে এখনও বর্বরতা আছে সেই সকল দেশে বর্বরতা বেড়েই যাবে। হিত করতে গিয়ে বিপরীত ফল ফলবে।

শহরের সৌন্দর্য, ভূগর্ভের রেল পথ, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম এসব পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের সংগে দেখাসাক্ষাৎ এবং তাদের অন্তরের কথা জানবার জন্য এখান থেকে সেখানে যেতে লাগলাম। অবশেষে পরিচয় হল এক বাইসাইকেল বিক্রেতার সংগে। লোকটি উগ্রসাম্রাজ্য-বাদী নয়, মামুলী দোকানদার। আমার প্রতি সে সদয় ব্যবহারই করছিল। সে তার দোকানের ভার অন্য লোকের উপর ছেড়ে দিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান দেখাতে নিয়ে গেল। যে সকল স্থান সে আমাকে দেখিয়েছিল তার মধ্যে একটি ক্লিনিক তার অন্যতম। এখানে ক্যান্সার রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। সুখের কথা সেখানে এক জন ভারতীয় ডাক্তারের সংগে দেখা হয়। ডাক্তার আমাকে সেই ক্লিনিকে দেখতে পেয়ে সুখী হলেন না কারণ তিনি ভেবেছিলেন আমিও এক জন রোগী। কিন্তু যখন তাকে বললাম আমি এক জন পর্যটক এবং সংগের লোকটি শহর দেখাতে নিয়ে বের হয়েছে তখন তিনি সুখী হলেন এবং আমাকে নিয়ে ইণ্ডিয়া হোটেলে চলে এলেন। ইণ্ডিয়া হোটেলে

এসে তিন জনে এক সংগে খাবার সময় ডাক্তারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তিনি তার নামের কার্ড আমাকে দেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই কার্ডটি কলকাতায় যেদিন আমার ঘর খানাতাল্লাসী হয় সেদিন হারিয়ে যায়। তবুও যতটুকু মনে আছে তাতে মনে হয় তিনি বম্বের অধিবাসী এবং একজন বিশিষ্ট ডাক্তার।

এই ডাক্তার আমাকে অজিত সিংহের সহিত পরিচয় করিয়ে দেন। কথা প্রসংগে ডাক্তার বলেন, খবরদার ইংলণ্ডে গিয়ে যেন কারো কাছে অজিত সিংহের কথা না বলি। অজিত সিংহের সংগে কয়েকবারই দেখা হয়। তাঁর ভয়ানক রাগ এবং কর্ম্মক্ষমতা দমে যাওয়ায় ভয়ানক খিটখিটে মেজাজ হয়েছিল। তাঁর সংগে যে সকল কথা হয়েছিল তা ভ্রমণ কাহিনীতে না বলাই ভাল কারণ অনেকে হয়ত সেসব কথা মোটেই পছন্দ করবেন না, সেজন্য এখানে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না।

ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এক পাঠানের সংগে দেখা করতে যাই। পাঠানের নাম হল আহম্মদ উল্লা।

আহম্মদ উল্লা বড়ই দরিদ্র। আমান উল্লার রাজত্বের সময়ে তিনি বার্লিন আসেন এবং সেখানেই চিরস্থায়ী ভাবে থেকে যান। এদেশে তিনি বিবাহও করেন নি, তবে ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একজন House wife বা গৃহরক্ষিণী রাখেন। তাঁর ঘরে কতক্ষণ বসার পরই তাঁর গৃহরক্ষিণী এসে উপস্থিত হলেন। দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে সম্মান দেখালাম। আমার শরীরের কালো রং দেখে গৃহরক্ষিণীর যেন আমার প্রতি একটু ঘৃণাই হল, কিন্তু আহম্মদ উল্লা কয়েকটি কথা বলায় পরই গৃহরক্ষিণীর মুখ পরিষ্কার হ'ল। আহম্মদ উল্লা যতগুলি কথা বলেছিলেন তার মধ্যে "পেট্রিয়ট" কথাটি মাত্র বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম।

বাস্তবিক পক্ষে জার্মানীতে পেট্রিয়ট কথাটির বিশেষ মূল্য আছে। গৃহ রক্ষিণী তৎক্ষণাৎ কাফি তৈরী করে আমাদের খেতে দিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন।

গৃহরক্ষিণীর জ্ঞান অফুরন্ত। তিনি সর্বপ্রথমই কাশ্মির সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। আহম্মদ উল্লা যদিও দোভাষীর কাজ করছিলেন তবুও আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমার কথা ভাল করে অনুবাদ করতে পারছিলেন না। তাঁর গৃহরক্ষিণীর কথাও যে অনুবাদ করতে পারছিলেন তাও মনে হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি দোভাষীর কাজ পরিত্যাগ করে নিকটস্থ ক্লাব হতে একটি লোককে নিয়ে আসেন। আগন্তুক ইংলিশে অভিজ্ঞ ছিলেন।

তিনি এসেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, কাশ্মিরীরা কি নরডিক না জগাখিচুরী। এসম্বন্ধে যদি আপনার অভিজ্ঞতা না থাকে তবে কিছুই বলবেন না।

আমি বল্লাম, আমার যতটুকু মনে হয় কাশ্মিরীদের মধ্যে যারা কাশ্মিরী পণ্ডিত বলে পরিচয় দেয় তারা প্রায় সকলেই নরডিক, অন্যান্যেরা সিমেটিক দ্রাবিড়ে মিশ্রিত।

—আরে বাপ রে! আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ নবাগত লোকটা বাইরে চলে গিয়ে ক্লাবের লোকগুলিকে নিয়ে এল এবং কতক্ষণ পরই ডজন ডজন করে এপেল এনে আমার কাছে রাখতে লাগল। তাদের এই আপ্যায়নের কি মানে তা বুঝতে পারলাম না। অনেক্ষণ বসে তারাই কথা বলতে লাগল। অনেক কাফি, চিনি এবং দুধ এনে গৃহরক্ষিণী গরম গরম কাফি প্রত্যেককে দিতে আরম্ভ করল। আহম্মদ উল্লার ঘরখানা সেদিন থেকে একটি ক্লাবে পরিণত হল। আমিও জার্মাণদের সংগে মিশবার একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম। মনুষ্য-তত্ত্ব-

বিজ্ঞানের সংগে জার্মাণীর পলিটিক্সের যে এত সম্বন্ধ রয়েছিল তা আমি জানতাম না।

এর পরই আরম্ভ হল পৃথিবীর কোথায় নরডিক জাতের অবস্থিতি রয়েছে তার সমালোচনা। সমালোচনা জার্মানরাই করত আর মাঝে মাঝে আমার কাছে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করত। সোয়াস্তিকা কথাটিরও বাখ্যা করত। এক দিন আমাকে আহম্মদ উল্লার ঘরেতেই এক জন জার্মাণ জিজ্ঞাসা করেছিল সোয়স্তিকা শব্দের এবং চিহ্নটির মানে কি? অবশ্য এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার কারো ছিল না। জার্মাণরা এ বিষয়ে কোনরূপ আলাপ আলোচনাও করতে পারত না। সোয়াস্তিকা যেন হার হিটলারের কাছে স্বর্গ থেকে এসেছিল এবং তিনিই শুধু তার মানে জানতেন। অনেক জার্মান সেরূপ ধারণা করত। এতে তাদের দোষই বা কি দেব। আমাদের দেশেও বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকের সেই একই ধারণা।

জার্মান লোকটির প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষেপে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ সোয়াস্তিকা সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর প্রবাহিনী কাগজে তন্ত্রের সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছিলেন, তা আমি পড়েছিলাম, এবং আমার স্বগ্রামে ৺সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন আমার কাকাকে রামপ্রসাদী গানের ভেতরকার কথা ব্যাখ্যা করতেন তখনও সোয়স্তিকা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। তাঁদেরই কথা যথাসম্ভব জার্মাণ লোকটিকে বলেছিলাম। আমার কথা শুনে সে সুখী হয়েছিল এবং আরও কতকগুলি শিক্ষিত জার্মাণকে ডেকে আমার সংগে কথা বলে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবিকই শিক্ষিত লোকের সংগে কথা বলে যে আরাম পাওয়া যায় আর কিছুতে তেমন আরাম পাওয়া যায় না। তবে মাঝে

মাঝে আমি যখন কমিউনিজম সম্বন্ধে দুচারটা কথা বলতাম তখন অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করত আমি সে সম্বন্ধে কোনও বই পড়েছি কি না? এক দিন একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এন্‌জেল্‌স্ সম্বন্ধে আমার কি মত? প্রকৃতপক্ষে তখনও এন্‌জেলস্ কে হন্ এবং তিনি কি করে গেছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। যে বিষয়ে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই সে সম্বন্ধে আমি সকল সময়ই সত্য বলতে কুণ্ঠা বোধ করি না। মার্কস্ এবং এন্‌জেলস্ সম্বন্ধে আমার মামুলী জ্ঞানও নেই দেখে এরা আরও আশ্চর্য হ'ত।

এক দিন একজন জার্মাণ বলেছিলেন, চলুন হার গোয়েরিং এর সংগে দেখা করিয়ে দেই। আমি তাতে রাজি হইনি। আমি বলেছিলাম, আপনাদের দেশের কোনও অফিসিয়েল এর সংগে দেখা করব না। কেন দেখা করব না তা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলছিলাম, আমি এক জন গরিব লোক। গরিব হয়ে বড় লোকের সংগে দেখা করা আর পতঙ্গের আলোতে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা, অতএব ক্ষমা করবেন, আমি সেদিকে যাব না। অবশ্য আমার মনে তখনও কতকগুলি পর্যটকের উপদেশ বেশ জাগ্রত ছিল। ফ্রেঞ্চ পর্যটক প্যারেয়রী বলেছিলেন, জার্মাণ অফিসিয়েলরা বড়ই সন্দেহপ্রবণ এবং কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী। যদি কোনও মতে আপনার মুখ থেকে কমিউনিজমের সহানুভূতিসূচক কথা বের হয়ে যায় তবে সেখানেই আপনার পর্যটন শেষ হবে। সেজন্যই আমি এসব লোকের সংগে দেখা করি নি। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশও কমিউনিজমের শত্রু একথাটা সকলেই জানে, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মুখে প্রায়ই ডিমোক্রেসী বলে একটা কথা শুনা যায়, সেই কথাটির সম্মান রক্ষার্থে তারা সকলকে পথে ঘাটে গলা টিপে মারে না। আইন! আইনের প্যাঁচে ফেলে পচিয়ে মারে।

মিঃ গুপ্ত আমাকে দোতলার পাশের ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন। এদিকে লোকের চলাচল খুব কমই ছিল। আমার আগমনের প্রতি কেউ তাকাত না। বিকালে প্রায়ই বিশ্রাম করতাম এবং সন্ধার পর বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু সেদিন বিকাল বেলা বেরিয়ে এসে কতক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় বেরিয়ে পড়ি। বের হবার পরই পথে একটি যুবকের সংগে দেখা হয়। যুবকের শরীরে শক্তি সামর্থ খুব কমই ছিল। জার্মাণ প্রকৃতি তার মুখে মোটেই ফুটে উঠছিল না। সে আমাকে দেখেই এমন ভাবে হাসল যা দেখলে আপনা হতে মনে হয় পরিচ্ছদ পরার কোথাও দোষ আছে। যুবকের হাসি দেখে আমিও ভাবছিলাম হয়ত আমার বৃচেসের বোতামগুলি বন্ধ করিনি, সেজন্যই যুবক এরূপ ভাবে হাসছে। তৎক্ষণাৎ বোতামগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম। বোতামগুলি কিন্তু আঁটাই ছিল। তারপর আর আমাকে পায় কে? যুবকটিকে অবজ্ঞা করে হাঁটতে লাগলাম। আমার মুখে যদি কালি মাখা থাকে তবে তা আমি বুঝে নেব, প্যাণ্টের বোতাম আঁটা থাকলেই হল।

হিটলার ইয়থ লিগের যুবক অথবা যুবতীদের মধ্যে কিন্তু সেরূপ হাসি এক দিনও দেখিনি। এরূপ বিকৃত হাসির মানে কি তাই ভাবছিলাম আর পথ চলছিলাম। কতক্ষণ যাবার পর আর একটা যুবকের সংগে দেখা হয়। সেও ঠিক পূর্বের যুবকটার মতই হাসতে থাকে। আমি আর সহ্য করতে না পেরে যুবকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ ভাবে হাসবার কারণ কি মশিয়ে?

যুবক নীরব থেকে তাড়াতাড়ি করে পথ চলতে আরম্ভ করল। আমি পথের এক জন পুলিশকে বল্লাম, দুটা যুবক আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ভাবে হেসেছে, আমার পরিধেহ কি খারাপ? সুখের

বিষয় পুলিশটি ইংলিশ জানত। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় সে যুবক? যুবকটিকে দেখিয়ে বল্লাম, ঐ যাচ্ছে। পুলিশ "যুড়া যুড়া" বলে হুইসেল বাজিয়ে দিল। আরও কয়টি পুলিশ আসল, যুবকটিকে কিন্তু তারা ধরতে পারল না।

পুলিশ আমাকে দাঁড়িয়ে রাখল না অথবা থানায় রিপোর্টও করতে বল্ল না, আমি ধীরে সুস্থিরে আমার গন্তব্য স্থলে রওয়ানা হলাম। আমাদের দেশে হলে, পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত, কে জানে?

আহমদের ঘরে গিয়ে দেখি আহম্মদ মুরগীর মাংস আর রুটি আরাম করে খাচ্ছেন আর তাঁর গৃহরক্ষিণী পাশের অন্য একটা টেবিলে বসে শুধু বিয়ার খাচ্ছেন। যখনই আহম্মদ তাঁর গৃহরক্ষিণীর কাছে বিয়ার চাইছিলেন তখনই তাঁর গৃহরক্ষিণী সামান্য একটু বিয়ার আহম্মদের গ্লাসে ঢেলে দিয়ে বলছিলেন, আর দেব না, শেষটায় মাতাল হবে। আহম্মদ বলছিলেন, যদি আরও একটু বিয়ার না পাই তবে পেটে পোকা হবে, আমি কিন্তু তা সইতে পারব না, এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। আমি ত আরব নই, আমি একজন পাঠান, পাঠান বীরের জাত, শরীর রক্ষার্থে আমরা যে কোন জিনিস খেতে পারি।

আহম্মদকে "বন্দেমাতরমজী" বলেই একখানা চেয়ার দখল করলাম এবং পথে যে কটি হাসিমুখো ছোকরা দেখেছিলাম তাদের কথা বল্লাম। আহম্মদ আমাকে বল্লেন, এসব কথার উত্তর আমি দিতে পারব না, সন্ধ্যার পর যখন আপনার বন্ধুরা আসবে তখন তাদের কাছে কথাটা উত্থাপন করবেন।

সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক অনেক দেরী ছিল। আহম্মদের ঘর থেকে বের হয়ে পথে আসলাম এবং পূর্বপরিচিত বাইসাইকেলের

দোকানে গিয়ে দোকানীর সংগে সাইকেল সম্পর্কে নানা কথা বলে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা ইহুদীদের এত ঘৃণা করেন কেন? আমার প্রশ্নটি শুনেই জার্মাণ লোকটি একেবারে সাদা হয়ে গেল। তারপরই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে একজন ইণ্ডিয়ান্ তার যদি প্রমাণ দিতে পারেন তবে আমি আপনার সংগে কথা বলব নতুবা নয়। তৎক্ষণাৎ আমি আমার পাসপোর্টখানা বের করে দিয়ে তার হাতে দিলাম। দোকানী বেশ ভাল করে আমার পাশপোর্টখানা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ইণ্ডিয়াতে ইহুদী আছে কি?—হাঁ আছে বটে তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। এ জীবনে আমি একটি মাত্র ভারতীয় ইহুদী দেখেছি। তাদের নিয়ম কানুন্ কিছুই জানি না। অথচ সেই ইহুদী লোকটাকে মুরগী হত্যা করতে দেখার পর আমার তার প্রতি শ্রদ্ধা একেবারে লোপ পেয়েছিল। ইহুদীরা কি করে মুরগী হত্যা করে তাও বলার পর জার্মাণ লোকটি ধীরে আস্তে বলতে লাগলেন—

—এই যে দেখছেন বার্লিন শহর তার চার আনার মালিক এখনও ইহুদীরাই। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে তারা এই শহরের এত ক্ষুদ্র মাইনরিটি ছিল যে তাদের কথা সকল সময় সকলে ভাবতও না। হাঁ তবে এদের কথা ভাবত বই কি, সে অন্য কারণে। সেই কারণটি শুধরানো হয়েছিল, অনেক শুধ্রেও গিয়েছিল। মহাযুদ্ধের পর থেকে আরও অনেকটা শুধরিয়েছে। তাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল। যে সকল পরিবারে জার্মান রক্ত প্রবেশ করেছিল সেই পরিবারগুলি একেবারে নিষ্পাপ হয়েছিল। যে সকল পরিবারে জার্মাণ রক্ত প্রবেশ করেনি সেই পরিবার-গুলিতে এখনও শয়তানী প্রবলভাবেই বজায় রয়েছে। সে জন্যই আমরা ইহুদীদের এড়িয়ে চলি। সুখের বিষয় ফ্যুরার ইহুদীদের এরই মধ্যে কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছেন, অনেককে জার্মাণী হতে তাড়িয়ে

দিয়েছেন। শুনতে পাচ্ছি দুআঁসলা ইহুদীদেরও তাড়ানো হবে। সুখের কথাই।

—এত সুখী হবার কারণ কি মহাশয়?

• পাইকারী দরে সাইকেল বিক্রেতা আমাকে অনেক বাজে কথা বলে বিদায় দেবার পূর্ব্বে বল্লেন, যদি আর একদিন দেখা হয় তবে সকল কথা শুনতে পারবেন। আজ আপনি সাইকেল সংগে করে নিয়ে আসেন নি, অন্যদিন আসার সময় আপনার সাইকেলখানা নিয়ে আসবেন। এই লোকটির কাছে আর একদিনও গিয়েছিলাম। সেদিন শুধু সাইকেল সম্পর্কিত কথাই হয়েছিল। ইহুদীরা কেন জার্ম্মানীতে ঘৃণ্য সে বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা আহম্মদের ঘরেই অর্জন করেছিলাম।

সন্ধ্যার পর আহম্মদের ঘরে গিয়ে দেখলাম কয়েকজন লোক মাত্র বসে আছেন। তারা আমাকে দেখা মাত্র "আসুন্ আসুন্ বসুন" বলে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। চেয়ারে বসেই, নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে উপস্থিত ভদ্রলোকদের একটি করে সিগারেট দিলাম এবং ভাবতে লাগলাম আমরা কতই দুর্ব্বল? আমাদের দেশ হলে, হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানরা হিন্দুর বিরুদ্ধে এরই মধ্যে কত কথা বলত, কিন্তু এঁদের সংগে সপ্তাহ খানেক বন্ধু ভাবে কেটে গেল তবুও এরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলছে না। এদের ধৈর্য ধরে থাকবারও বিশেষ ক্ষমতা আছে। যাকগে এসব বাজে কথা, আজ আমাকে সোজাভাবে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে হবেই।

গৃহরক্ষিণী আমার সামনে এক পেয়ালা কাফি দিয়ে বল্লেন, আপনি আহম্মদকে কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন না? সে প্রশ্নটা এদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন ঠিক ঠিক উত্তর পাবেন। আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি, হাঁ, ভুলে গেলাম, আজ রাত্রে এখানে আপনি খাবেন। আহম্মদ

আমাকে মাখনের দাম দিয়ে গেছেন। আপনার জন্য সব্জি আর আলুভাজা আমি পাক করব আর আহম্মদ নিজেই আপনার জন্য ভাত রাঁধবেন। এই ত বলে গেলেন আহম্মদ। আচ্ছা আমি এখন আসি। এই বলেই আহম্মদের গৃহরক্ষিণী বিদায় নিলেন।

আমার সামনে যে ভদ্রলোকটি বসেছিলেন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইহুদীদের এত ঘৃণা করার কারণ কি তা কি আপনি আমাকে বলতে পারেন ?

ভদ্রলোক চুপ করে আছেন দেখে ফের জিজ্ঞাসা করলাম, ইহুদীরা খৃষ্টানদের ঘৃণা করে এটাই কি তার কারণ? আমাদের দেশেও সেরূপ আছে, এসব বিষয় লুকিয়ে রাখতে পারবেন না, এক দিন বের হবেই।

ভদ্রলোক বল্লেন, আমাদের দেশে রোমান ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টেণ্টে যত মারামারি কাটাকাটি হয়েছে সেরূপ পৃথিবীর কোথাও হবেনা এটা নিশ্চয় কথা, তবুও আমরা ক্যাথলিকদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলি না অথবা কনসেনট্রেসন কেম্পে পাঠাই না। অনেক পোল এবং চেক আমাদের দেশে আছে, তাদের আমরা আমাদের মধ্যে মিলিয়ে ফেলতে চাই। রুশদের প্রতিও আমাদের সেই একই ব্যবস্থা রয়েছে, তবে রুশদের প্রতি এখনও আমোদের সন্দেহ যায়নি, কারণ তারা ইহুদীদের ঘৃণা করে না। বৃটিশ হল ইহুদীর মিত্র আর খাটি কথা বলতে কি বৃটিশই হল আমাদের আসল শত্রু, তবুও আমরা বৃটিশদের ঘৃণা করি না, বৃটিশ এবং ফ্রেনচদের আমরা হিংসা করি। আমরা ঘৃণা করি ইহুদীদের, বাস্তবিক ঘৃণা করি। আমরা দেখতে চাই ইহুদীরা পৃথিবী হতে লোপ পাক। যদি কোনদিন যুদ্ধ বাধে তবে আমরা ইহুদীদের জনবাচ্চা সহকারে পৃথিবী হতে বিদায় করব নয়ত বলব তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করুক এবং একদম খাঁটি চাষার কাজ করুক। তাতে যদি ইহুদীরা

রাজি হয় তবে ইহুদীরা রক্ষা পাবে নতুবা যমালয়ে পাঠানোই তাদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা হবে।

বাস্তবিকই জার্মাণ লোকটির একঘেয়ে কথা শুনতে আমার ভাল লাগছিল না। শুধু ইহুদী নিধনের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে, কিন্তু ইহুদীরা কি দোষ করেছে তার একটি কারণ দেখানো হচ্ছিল না।

আবার আমি বল্লাম, শুনেছি, ইহুদীরা গত মহাযুদ্ধে জার্মাণদের প্রতারণা করেছিল। জার্মাণীর ব্যাঙ্কগুলি চুরি করে ফাঁক করে দিয়েছিল। তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়েছিল তখন নাকি তারা বিদেশী অর্থের সাহায্যে জার্মাণীর প্রায় শহরই কিনে ফেলেছিল। এসব কারণই কি তাদের প্রতি আক্রোশের কারণ?

ভদ্রলোক পকেট হতে এক প্যাকেট সিগেরেট বের করে আমাকে একটি দিলেন এবং নিজে আর একটি ধরিয়ে বল্লেন, এসব যদি কারণ হ'ত তবে জার্ম্মাণ জাতের পিতা কখনও ইহুদীদের দেশ হতে তাড়াতে বলতেন না। এসব হল আপনাদের মন গড়া কথা। হঠাৎ আমি বল্লাম, হাঁ হাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি কেন আপনারা ইহুদীদের তাড়াতে চাচ্ছেন। তারা সকলেই কমিউনিষ্ট সেজনাই তাদের তাড়াচ্ছেন, কেমন তা নয় কি?

জার্ম্মাণ লোকটির ভাবান্তর হ'ল। সে কিছুই বল্লে না। অনেকক্ষণ চুপ থেকে বল্লে আচ্ছা আজ আর এখানে বসে এ বিষয়ে কথা হবে না, আগামী কল্য সকালে এখানে আসবেন, আমি আপনাকে অন্য আর একটি স্থানে নিয়ে যাব, সেখানে গিয়ে বুঝবেন কেন আমরা ইহুদীদের ঘৃণা করি। আর আপনি বলেছেন ইহুদীরা কমিউনিষ্ট সেজন্য আমরা তাদের ঘৃণা করি। আপনার সেধারণাও কতকটা উল্টাধরণের সত্য।

ইহুদীরা কমিউনিজম্ গ্রহণ করেছে বলেই আমরা তা পরিত্যাগ করেছি। আমরা গঠন করে তুলছি নেসনেল সোসিয়েলিজম্।

পূর্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে সকল কথা আমি বলেছি, সেই কারণগুলি কমিউনিজম ধ্বংস করার প্রধান কারণ ছিল না। পৃথিবীর সর্বত্রই আজকাল অনেক অসৎ দোষের সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য কোনও জাত অথবা কোনও ধর্ম দায়ী নয়। দায়ী পুঁজিবাদ। ধরুন আমার হাতে প্রচুর টাকা আছে। সেই টাকার বিনিময়ে আজ কলকাতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, যে কোন অন্যায় করতে পারি। অনেকে তা করেছেও। সেজন্য বাঙ্গালী জাত দোষী নয়। দোষী হল পুঁজিবাদ, যার প্রভাবে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে বেশিক্ষণ লাগেনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মাণীতে সাধারণ লোকের মধ্যে পরাজয়ের ভাব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হয়েছিল। তারপর এসেছিল আর্থিক দুর্গতি। আর্থিক দুর্গতে ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। সাধারণ দুর্দ্দিনে কি করে বাঁচবে তাই ভেবে পাচ্ছিল না। অনেকে ভাবছিল যদি জার্মাণীতে কমিউনিজম স্থাপিত হয় তবে সকলেরই সুবিধা হবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণ মজুরের মধ্যে সে কথাটা বেশ জোর গলায় প্রচার করতে থাকে। অনেকে সেই প্রচারের ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু কি করে তা স্থাপিত করতে হবে, সে বিষয়টা যদিও অনেকের অজ্ঞাত ছিল।

বার্লিন হতে বিদায়

বার্লিন হতে বিদায়ের দু'একদিন পূর্বে এক বেহারী ভদ্রলোকের সংগে দেখা হয়। সেখানে তিনি ইনজিনিয়ারিং শিখছিলেন। কথা প্রসংগে বলছিলেন বার্লিনে থাকা খাওয়া বাবত—ষাট্‌মার্ক (পঁচাত্তর টাকা) খরচ হয়। অবশ্য মিঃ গুপ্তের অনুগ্রহেই এত কম খরচে থাকতে পারছিলেন। তিনি আরও বলছিলেন ইণ্ডিয়ানরা যদি পৃথিবীর বড় বড় শহরে শুধু খাবার রেঁস্তোরা খুলে বসে তবেই অনেক ভারতবাসী বিদেশে গিয়ে অতি অল্প খরচে বিদ্যাভ্যাস করে দেশে ফিরে আসতে পারে। তবে কথা হল ক'জন ভারতবাসী মিঃ গুপ্তের মত দিলখুলা? জানি না মিঃ গুপ্ত কোনও রাষ্ট্রনৈতিক কাজে ইণ্ডিয়াতে নিযুক্ত ছিলেন কি না; রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে যে সকল ভারতবাসী লিপ্ত ছিলেন এবং বিদেশে গিয়ে কোনও বৈষয়িক ব্যাপারে নিজেকে সমর্পণ করেন তাদেরই মন উদার তা সকলেই বুঝতে পারত।

ধনীর ছেলেরা বিদেশে গিয়ে প্রায়ই তাদের পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করে দেশে ফিরে আসে। তারা টাকার মর্ম্ম বুঝে না। বুঝে শুধু নিজের গরিমা এবং স্ফূর্ত্তি। অবশ্য এর মাঝেও কি ভাল লোক থাকে না? নিশ্চয়ই থাকে।

মিঃ গুপ্তের প্রতি বিহারী যুবকের কৃতজ্ঞতা দেখে সুখী হয়েছিলাম এবং তাকে বললাম যাতে দেশের লোক বিদেশে গিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারে সেদিকে সকলেরই চেষ্টা করা দরকার এবং আমিও সে বিষয়ে চেষ্টা করব। ইউরোপ হতে ভারতে ফিরে এসে অন্তত পাঁচশত লেকচার দেই এবং সর্বত্রই বলি বিদেশে গিয়ে অন্তত পক্ষে যদি রেঁস্তোরা করেও থাকা যায় তবুও স্বদেশের সমূহ উপকার হবে।

আমাদের দেশে পাসপোর্ট পেতেই লোক আধমরা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বিদেশে গিয়ে ব্যবসা করাটা একরূপ অসম্ভব বললেই চলে। এবার আমরা স্বাধীন হয়েছি। পাসপোর্ট পাবার দিক দিয়ে আমাদের ভাগ্য খুলবে কিনা কে জানে।

বিদেশে যাবার পর ধর্ম্মের গোড়ামী সত্যই লোপ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি এনতোয়ার্পে এক রেঁস্তোরার মালিকের সংগে দেখা হয়। ভদ্রলোক চট্টগ্রাম জেলার বাংগালী মুসলমান। অনেক বৎসর ধরে সেখানে ছিলেন এবং স্থানীয় ভাষায় বেশ জ্ঞানও অর্জন করেন। তার সংগে দেখা হয় পথে। পথে দাঁড়িয়েই তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন। যখন শুনলেন আমার নাম রামনাথ তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়। অবস্থা দেখে দুঃখিত হলাম বটে কিন্তু সংগ ছাড়লাম না। যখন তার দোকানে পৌছলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আপনি ত আমার এখানে খাবেন না, আপনাকে ডেকে আনা অন্যায় হয়েছে। ভদ্রলোক জানতেন না আমি কি চিজ্। আমিও তাঁকে আমার মনের কথা খুলে বলিনি। শুধু বলছিলাম আমাকে বিদেশী ভেবে যা ইচ্ছা খেতে দিন।

খাবার টেবিলে গিয়ে মেনুর কার্ডে যা লিখা ছিল তাই একটার পর আর একটা আনতে আদেশ দিলাম। তাঁর মেনু কার্ডের খাদ্য শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কিছু আছে? ভদ্রলোক বল্লেন, হাঁ

আছে, শুকনো মাছের ঝোল আর ভাত। বল্লাম, তাও নিয়ে আসুন। তাও আনা হল। পুরো দু প্লেট ভাত আর অনেকটা তরকারী খেয়ে মুখটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বলুন ত আপনার মনে কি কি কথা কিলবিল করছিল অথচ মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না।

—আপনার খাওয়া দেখে সুখী হলাম। আপনি বেশ খেতে পারেন। খাওয়ার অনুপাতে বিদ্যাটা কিরূপ তাও পরীক্ষা করতে চাই, তাতে কোনও আপত্তি আছে কি?

—এখন নয়। আমি প্রচুর খেয়েছি। বিকালে জ্ঞানের পরীক্ষা হলে হয় না?

—তাই হবে।

ভদ্রলোককে আমার ঠিকানা দিয়ে ফিরে হোটেলে আসলাম।

তখন ছিল বিকাল বেলা। আমি তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ভদ্রলোক এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে দেবার পর দেখলাম ভদ্রলোকের সংগে আরও কজন স্থানীয় লোক। তাদের প্রত্যেকের সংগে পরিচয় করে দিয়ে চট্টগ্রামের ভদ্রলোক বললেন, এখানে ত কথা হবে না, চলুন একটা বড় কাফেতে যাই। আমরা সকলে মিলে একটা বড় কাফেতে গেলাম এবং একটা নিরিবিলি স্থান দেখে বসলাম।

ভদ্রলোক বড়ই আমোদে। সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এই সংসারে সুখী হয়ে বেঁচে থাকতে চান না মরলে পরে স্বর্গে গিয়ে সুখী হতে চান?

—এ সংসারে যত দিন বাঁচব ততদিন সুখী থাকলেই যথেষ্ট, মরলে পরে কি হয় না হয় আজ পর্যন্ত কেউ বলেননি আর এ বিষয়ে আমি কোন চিন্তাও করি না।

—তবে এত পূজা পার্ব্বণ, নমাজ রোজা করা কেন?

—এসবের ধার ধারি না, আপনি এসব কথা অন্যলোককে জিজ্ঞাসা করে সুখী হবেন বলেই আশা করি। পৃথিবী ভ্রমণ করে বুঝতে পেরেছি, যাকে আমরা ধর্ম্ম বলি তা হল সভ্যতার একটি ক্রম বিকাশ। আধ্যাত্মিক-বাদও তার মধ্যে একটি।

ফিন অর্থাৎ নেদারলেণ্ডের উত্তরার্ধের লোক যে ভাষা বলে তা মোটেই বুঝতাম না, সেজন্য চট্টগ্রামের ভদ্রলোকই তাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় অনুবাদ করলেন।

আমাদের কথার শেষ এখানে হয়নি। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলার এখানে স্থান নেই, কারণ এটা হল ভ্রমণ কাহিনী। যদিও চট্টগ্রামের ভদ্রলোক স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র অপরিচিত কিন্তু তাঁর মত লোক যদি বিদেশে গিয়ে বিদেশীর সংগে থেকে মনের পরিবর্তন করতে সক্ষম হন তবে অনেকের মনের পরিবর্তন হবেই। চীনের বিদ্রোহের গোড়ার সংবাদ যাঁরা অবগত আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন ডাক্তার সুন-ইয়াত-সেন তাঁর যে সকল স্বদেশবাসী হতে সাহায্য পেয়েছিলেন তারা সবই ছিল বিদেশী। প্রবাসী স্বদেশবাসীরা নিজের দেশ সম্বন্ধে দরদ দিয়ে যতটুকু চিন্তা করে অন্যে তেমন করে না।

এখন আবার বার্লিনের কথায় ফিরে আসা দরকার। বার্লিনে এসে কয়েকজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুখী হয়েছিলাম কিন্তু এমন কয়েক জন ইণ্ডিয়ানের সংগে দেখা হয়েছিল যাদের সংগে দেখা না হলেই সুখী হতাম। এদের মধ্যে একজন মিঃ গুপ্তের হোটেলেই থাকতেন। তিনি সর্বপ্রথমই আমার পোশাক দেখে বলছিলেন, এই পোশাক নিয়ে সভ্য দেশে এসেছেন, এতে যে আমাদের দেশের বদনাম হবে? লোকটা যদিও ধনীর ছেলে তবুও তার

সাধারণ জ্ঞানের দৌড় দেখে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেইনি। তারপর কথা হয়েছিল ইংলিশ ব্যবহার নিয়ে। মাতৃভাষায় কথা বলার সময় অভ্যাস বশে "বুপিজিয়ন ইংলিশের" ব্যবহার করতাম। ইউরোপের লোক্ কচ্চিৎ দুএক জন ইংলিশ বলতে পারে। আমি যখন ইউরোপে ইংলিশ বলতাম তখন প্রায়ই অক্সিলারী ভার্ব বাদ দিতাম, কারণ "হ্যাজ, হ্যাব, স্যাল" এসব কথা মুখ্য ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবহার করলে অনেকেই তা বুঝত না। কথা প্রসংগে এই বাংগালী ভদ্রলোকই আমাকে বলছিলেন লণ্ডনে গেলে আমার কথা কেউ বুঝবে না এবং আমাকে অপদস্থ হতে হবে। এর কথারও কোন উত্তর দেইনি। তারপর যখন তিনি অহংকার করে বলছিলেন তাঁর জন্ম বঙ্গদেশের কোনও বিখ্যাত জমিদার বংশে এবং তিনি কোনও ঋষির আটচল্লিশতম বংশধর তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, কথাটা ঠিক বলেছেন কারণ আপনার পূর্ব পুরুষ আফ্রিকাতে ছিলেন। জমিদার পুত্র আমার কথার বোধহয় মানে বুঝতে সক্ষম হননি কারণ তিনি আমাকে একেবারে অশিক্ষিত লোক রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। ভদ্রলোকের মাথার চুলগুলি দেখতে যদিও আসলী নিগ্রোদের মত ছিল না তবুও বলতে বাধ্য তার চুল একটু উন্নত ধরনের নিগ্রোদের মতই। বিদায়ের সময় ভদ্রলোক আমাকে তার লণ্ডনের ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন লণ্ডনে পৌছলে তিনি আমাকে দেব সেবা দেবেন। লণ্ডনে পৌছানোর পর তার সংগে দেখা হয়। তার কাছে দেব সেবা পাইনি পেয়েছিলাম "দেখি নাই-ভাব।" সেজন্য নিজে যেচেই বলেছিলাম, মশাই, আপনার চেয়ে ইংলিশ ভাষায় আমি কম পণ্ডিত নই। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভদ্রলোক যখন বিপদে পড়ে তখন স্থানত্যাগ ছাড়া আর উপায় থাকে না।

ইংলেণ্ড ভ্রমণ লিখব কিনা জানি না। সেজন্য এখানেই ইংলিশ ভাষা সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলে ফেলি। ইংলণ্ডের যে কোন স্থানে গিয়ে ইংলিশ জানি না ভাণ করেছি সেখানেই সম্মান পেয়েছি। যেখানেই বিশুদ্ধ ইংলিশে কথা বলেছি সেখানেই কলনিয়েল অথবা বর্ণশঙ্কর বলে ঘৃণীত হয়েছি। যখনই আমার কোন কথা বলা দরকার হয়েছে তখনই ইচ্ছা করে ভুল ইংলিশ বলেছি যেমন একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, শিলিং হোস্টেলে যাবেন? উত্তরে আমি বলেছিলাম, "আই নো গ"। প্রশ্নকারী বুঝতে পেরেছিল আমি ইংলণ্ডে যাবার পর এই কয়টি কথা আরম্ভ করেছি। আমরা যখন স্বাধীন হব তখন যদি আমরা ইংলেণ্ডে গিয়ে ভাল ইংলিশ বলি তখন তারা আমাদের বাহাদুরী দেবে এর পূর্বে নয়। আজকাল ভারতীয় স্কলারদের ইংলিশরা বলে একটা বিদেশী কুকুর দেশী কুকুরের মত বলছে। A country dog howling like a home dog.

বার্লিনের বিদায়ের কথা বলতে গিয়ে অনেক বাজে কথা বলতে হল। এখন বিদায়ের কথাটা বলছি। বার্লিন হতে বিদায়ের দিন সকালবেলাটা বেশ সুন্দর ছিল। হোটেল থেকে বের হয়েই যখন সুন্দর সূর্যটিকে দেখতে পেলাম তখন একটা শ্লোক মনে হয় যেমন হে সূর্য ইত্যাদি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হল সূর্যের প্রাণ নেই। এর কাছে প্রার্থনা করলে কিছু পাওয়া যাবে না। চাওয়া পাওয়াই দুনিয়া। আর কোন চিন্তা না করে হেনোভারের দিকে রওয়ানা হই। বার্লিন হতে হেনোভার পর্যন্ত রাস্তার নাম এক নম্বর হাইওয়ে। রাস্তাটি প্রশস্ত এবং সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী। বড় বড় কামান বয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে উপযুক্ত। পথে সাইকেল চালাতে মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না। বার্লিন হতে বের হবার পর কতকগুলি ক্যামেরা-ম্যান আমার পেছন নেয়।

তারাও বাইসাইকেলেই চলছিল। তারা আমাকে দাঁড় করিয়ে কয়েকটি ছবি নিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

হেনোভারের পথে

দেখতে দেখতে পাসডম (Potsdam) এসে পৌঁছুলাম। শহরটি পুরাতন। হিটলার তা আবার নূতন করে গড়ে তুলেছেন। পাসডম্-এ একটি ছোট্ট পার্কে কতকগুলি শিশুকে খেলা করতে দেখে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম তারা ধুলা নিয়ে খেলছে। তবে একে অন্যের গায়ে ধুলা ফেলছে না। পার্ক হতে একজন জার্মাণ তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে বড়ই অপ্রস্তুত হন। তিনি হয়ত ভেবে-ছিলেন, আমাকে দেখে তাঁর স্ত্রী সুখী হবেন এবং আমার সংগে কথা বলবেন। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র তাঁর স্ত্রী অন্য ঘরে চলে যান এবং একটি কথাও বলেন নি। জর্মাণ ভদ্রলোক আমাকে বলেন, এখান থেকেই বর্ণবিদ্বেষ আরম্ভ হয়েছে। আপনি আর লোকের সহানুভূতি পাবেন না। বিদায় বন্ধু। আসল কথা কিন্তু তা ছিলনা। তিনি ছিলেন সোসিয়েলিস্ট আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন নেসনেল সোসিয়েলিস্ট তবে তাঁর কথা আংশিক সত্য ছিল। বুঝতে পেরেছিলাম জার্মাণ ভদ্রলোক কি বলতে চাইছেন। বার্লিন পর্য্যন্ত হ'ল পূর্ব্বদেশ। এর পর থেকেই আরম্ভ হয় পশ্চিম দেশ। পশ্চিম দেশের লোক অশ্বেত-কায়দের মোটেই পছন্দ করে না এবং মানুষ বলে স্বীকার করতেও যেন

রাজী নয়। এটা হবারই কথা। যারা অপরকে শাসন এবং শোষণ করতে ইচ্ছুক তারা কখনই সাধারণ মানুষের মত থাকতে চায় না। আপনা হতেই একটা চিন্তাধারা এসে যায় যাতে শাসক শাসিতকে হেয় জ্ঞান ত করেই, ক্রমে শাসিতকে মানুষ পর্যায় হতেও দূরে ঠেলে ফেলে দেয়। পরের দেশের কথা বলে কোনও লাভ নেই। আমাদের দেশের জমিদার শ্রেণীর লোক কি কখনও তাদের প্রজার দুঃখে কি দুঃখিত হয়? কখনও হয় না। প্রজার ছেলে মরুক, মেয়ে মরুক, নির্বংশ হউক, তাতে জমিদারের মনে একটুও দুঃখ হয় না। জমিদার ভাবে, পুরাতন প্রজা যদি চলে যায় তবে নূতন প্রজা আসবে, নূতন করে কতকগুলি টাকা আমদানী হবে।

পটস্‌ডেমে দুর্ব্যবহার পেয়ে মনে বড়ই দুঃখ হয় এবং সেজন্যই বোধ-হয় হেনোভারের দিকে পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চালাতে সক্ষম হই। লক্ষ্য করছিলাম বার্লিনে পৌঁছানোর পূর্ব্বে লোকে আমার সংগে কথা বলার জন্য, আমার কাছে কিছু জানবার জন্য যেমন আগ্রহ প্রকাশ করত এদিকের লোক সেরূপ কিছুই করছে না। তবে যখনই কোন রেঁস্তোরায় খাবার খেতে যাচ্ছিলাম তখনই বয় খাবার এনে দিত। দামের দিক দিয়েও বেশি চাইত না। ন্যায্য দাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত।

পটস্‌ডেমে এক দিন থেকে পরের দিন ব্রেণ্ডেনবার্গ পৌঁছানোর পূর্ব্বে হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়। উত্তরের বড় বড় মেঘমালা আকাশ ছেয়ে ফেলে। প্রবল বেগে এগিয়ে চলি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়। বৃষ্টি হতে বাঁচবার কোন উপায় ছিল না কারণ আশে পাশে কোনও গোলাবাড়ী ছিল না। যখন উপায়হীন ভাবে পথে চলছিলাম তখন হঠাৎ পেছন দিক হতে এক খানা লরী এসে আমার কাছে থামল এবং ইংগিতে আমাকে লরীতে

গিয়ে বসতে বল্ল। গাড়িতে গিয়ে বসলাম, অন্য একজন লোক আমার সাইকেলখানা চট করে লরীতে উঠিয়ে নিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই শহরের উপকণ্ঠে একটি রেঁস্তোরাতে পৌছানোর পর গাড়ি থামল। ড্রাইভার আমাকে গাড়ি হতে নামিয়ে দিয়ে জার্মাণ ভাষায় বল্‌ল "কাছেই শহর।"

ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিলাম। ড্রাইভার কিছু না বলেই চলে গেল। রেস্তোরাঁয় কয়েকজন লোক বসে ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের পোশাক বেশ পরিষ্কার ছিল। কারো গায়ে শুধু সার্টও ছিল, কোট ছিল না। বুঝতে পারলাম এরা নিকটেই কোথাও থাকেন। কিছু খাবার আনতে আদেশ দিলাম। বয় তাড়াতাড়ি করে খাবার এনে দিল। আমি যখন খাচ্ছিলাম তখন একজন লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে আমার একখানা পরিচয় পত্র দিলাম। তিনি পরিচয় পত্র পড়ে সুখী হন এবং আমার হাতে পাঁচটি মার্ক দিয়ে বলেন, মশায় পশ্চিমের লোক বড়ই বর্ণবিদ্বেষী, আপনি সাহায্য পাবেন কিনা জানিনা সেজন্যই আপনাকে কিছু দিচ্ছি।

—পশ্চিমের লোক বর্ণ বিদ্বেষী কেন মশাই ?

—পশ্চিমের লোক শুধু বর্ণবিদ্বেষী নয়, তারা বার্লিনের পূর্ব দিকের লোককেও বর্ব্বর বলতে ছাড়ে না। এদের এটা হল মজ্জাগত অভ্যাস। আমরা এই নিয়ে কত লেকচার দিয়েছি তার অবধি নেই। কিন্তু এদের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

ভদ্রলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি জাতে রুশ। হোয়াইট রুশিয়া তার দেশ। রুশ দেশে যখন বিদ্রোহ হয় তখন তিনি জার্মাণীতে পালিয়ে আসেন। পলিটিক্স তাঁর আলোচনার বাইরে। সোভিয়েটের বিরোধী তিনি ছিলেন না। কিন্তু সোভিয়েট হবার পর

যে পরিবর্ত্তন এসেছিল সেই পরিবর্ত্তন তাঁর ধাতে সহ্য হয়নি বলেই পালিয়ে আসেন। সোভিয়েট রুশিয়ায় ফিরে যাবার পাস তার কাছে-ছিল। তিনি আমেরিকা গিয়ে বসবাস করার পক্ষপাতী থাকায় জার্মাণীতেই বাস করছিলেন। রুশ ভদ্রলোক এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন ত আমার ইংলিশ বলা কেমন হয়েছে?

বল্লাম, আপনি যে ভাবে ইংলিশ বলতে পারছেন আমিও তেমনি ভাবে ইংলিশ বলতে পারি না। আপমি কবে আমেরিকা যাচ্ছেন?

—অতি সত্বর বন্ধু। ইউরোপ ছাড়তে পারলেই বাঁচি। এখানে আবার যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে আমি যোগ দিতে পারব না। আমার এখন বয়স হয়েছে, এখন শান্তভাবেই জীবন কাটাতে ইচ্ছা করি। আমেরিকাতে নিশ্চয়ই বড় বড় বন আছে। বনের কাছে ঘর করেই থাকতে এবং সারা জীবন কাটাতে চাই।

লোকটির নির্লিপ্ত ভাব দেখে দুঃখিত হই। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রেডেনবার্গের দিকে রওয়ানা হই। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। পথটা ঝক মক করছিল। শহর মাত্র দু মাইল দূরে। দু মাইল চলতে আমার অতি অল্প সময় লাগারই কথা ছিল, কিন্তু পুরো একটি বাইসাইকেল প্রসেশন চলে যাচ্ছিল দেখে একটু দাঁড়াতে হয়। প্রসেশানটি চলে যাবার পর শহরে পৌছি। এখানে যে হোটেলে প্রথম গিয়ে উঠি, সে হোটেলের মালিক রুম নেই বলে বিদায় দেওয়ায় বড়ই রাগ হয় এবং নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেসনে যাই। সেখানে গিয়ে যার কাছে রুম চেয়েছিলাম তিনি আমাকে পুলিশ স্টেশনে থাকতে বলেন। আমি তাতে রাজি হই। আমাকে তিনি একটি হাজত রুম খুলে দিয়ে বলেন,

এখানে রাত কাটিয়ে আগামী কল্য সকালে চলে যাবেন।

হাজত রুমে লোহার খাটের উপর একখানা পাতলা জাজিম বিছানো ছিল। বিছানার চাদর ছিল না। একটি পাতলা বালিশ ছিল কিন্তু বালিসের ওয়ার ছিল না। দুখানা পাতলা কম্বল ছিল কিন্তু কম্বলের নীচে চাদর ছিল না। আমি এতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। সাইকেলখানা হাজত রুমের এক পাশে রেখে পুলিশ স্টেসনটা কিরূপ তাই দেখতে বের হলাম। ছোট্ট বাড়ির ভেতরে সুন্দর সাজানো গোছানো রুম। এখানে একজনও এস্ এস্ পুলিশ দেখতে পাইনি। জার্মাণীর বিশেষ পুলিশকে "এস্ এস্" বলে। তাদের বাঁ হাতে সর্বদা সোয়াস্তিকা বেজ বাঁধা থাকে। এখানকার পুলিশের লোক দেখে মনে হল এরা সবাই সিভিলিয়ান। এদের আচার ব্যবহার ভদ্র এবং বেশ ধীরে কথা বলে।

কারো আদেশ না নিয়েই পুলিশ স্টেসনটি "পরিদর্শন" করছিলাম। পরিদর্শন করে হাজত রুমে ফিরে এসে যখন ডাইরী লিখছিলাম তখন পূর্বের পুলিশটি এসে জিজ্ঞাসা করল, মশাই কি লিখছেন? বল্লাম, আপনাদের পুলিশ স্টেসনের সম্বন্ধে কিছু লিখে নিচ্ছি। পুলিশটি ডাইরীতে কি লিখেছি তাহা জানবার জন্য আমার ডাইরী দেখতে চাইল। তাকে ডাইরী দেখালাম। ডাইরী বাংলাতে লেখা ছিল। কিছুই বুঝতে না পেরে, সর্ব্বপ্রথমই জিজ্ঞাসা করলে, এটা কে ভাষা মশাই।

—এটা বাংলা ভাষা।

—হাঁ তাই ত দেখছি, বাংলা দেশটা কোথায়?

—ইণ্ডিয়ারই একটি অংশ।

—হাঁ, তাই নাকি, দেখান ত মানচিত্রে।

পুলিশ ষ্টেসনে পৃথিবীর মানচিত্র ছিল। মানচিত্রে বাংলা দেশের অবস্থিতি দেখিয়ে বল্লাম, এটাই হল আমার জন্মভূমি।

পুলিশ আমাদের দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে বল্ল, এখানে আপনার থাকার দরকার নেই। চলুন একটি হোটেলে নিয়ে যাই। আমরা একটি হোটেলে গেলাম। হোটেলের মালিক একজন ইহুদী। তাঁর হোটেলের দরজায় একটি বড় নাক আঁকা ছিল। পুলিশ সমেত আমাকে দেখে হোটেলের মালিক বেশ ভীত হয়েছিলেন।

সারজেণ্ট ঘরে প্রবেশ করেই হোটেলের মালিককে হাইল হিটলার বলে নমস্কার করেন এবং আমার সম্বন্ধে কিছু বললেন। হোটেলের মালিক একখানা রুম দেখিয়ে দিয়ে, নিজেই আমার সাইকেলখানা হোটেলের ভেতর একটি নিরাপদ স্থানে রেখে দেন এবং উভয়কে এক কাপ করে কাফি খেতে দেন। পুলিশের কাফি খাওয়া হয়ে গেলে যাবার পূর্ব্বে হাইল হিটলার বলে সম্মান জানান।

এটা হল ইনটারনেসনেল হোটেল এবং বোর্ডিং হাউস্। এখানে বিদেশের নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক এসে বাস করে। সেজন্যই হোটেলের মালিক একজন ইহুদী। হোটেলে ইংলিশ সংবাদপত্রও ছিল। অনেকক্ষণ তাই পড়লাম। তারপর যখন উপরে রুমে যাচ্ছিলাম তখন হোটেলের মালিক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—মশাই কি এখানেই খাবেন?

—হাঁ মশাই এখানেই খাব তবে মারগারিণ এবং ড্রিপিং খাইনে।

—ও বাব্বা, এ যে এক ধনী লোক দেখছি, মারগারিন্ এবং ড্রিপিং খাবে না বলছে গো, তবে খাবেন কি মশাই?

—আর যা দিন।

লোকটি চুপ করে থাকল। উপরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফের নীচে নেমে এসে সাইকেল নিয়ে শহর বেড়াতে বের হলাম। কয়েকটি স্থানে ভিক্ষাও চাইলাম কিন্তু কেউ ভিক্ষা দিল না। ভাবলাম এখানে আগামী-

কল্য থাকব এবং দেখব এখানকার ব্যাপার কি ?

সারাদিন পরিশ্রান্ত ছিলাম সেজন্য তাড়াতাড়ি করে খেয়ে শুয়ে থাকলাম। কিন্তু আমাকে হোটেলওয়ালা শুয়ে থাকতে দিল না। সে আমার রুমে এসে নানা কথা বলে সময় ক্ষেপণ করতে লাগল। হোটেল ওয়ালার সংগে মন খুলে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলাম। মন খুলে কথা বলে কয়েকবারই কষ্ট পেয়েছি বলেই কিছুই বললাম না। হোটেল-ওয়ালাকে দেখতেও ইহুদীর মত দেখাচ্ছিল না। হোটেলওয়ালার কথা বলতে যখন বেশি উৎসাহ তখন তাকে বললাম, আগামীকল্য এখানে থাকব. আজ আমি বড়ই পরিশ্রান্ত।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি রেস্তোরাঁতে অনেক লোক খেতে এসেছে। প্রত্যেকেই একটি করে অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম, দু টুকরা রুটি, সামান্য মাখন, এক টুকরা গাজর এবং কাফি খেয়ে বিদায় নিচ্ছে। আমিও গিয়ে খেতে বসলাম। আমিও তাদের মতই খেলাম তারপর কতকগুলি ভিক্ষা পত্র নিয়ে বড় বড় রেস্তোরাতে যেতে আরম্ভ করলাম। বড় বড় রেস্তোরাঁগুলিতে যেয়ে যা পেলাম তাতে সারাদিনের খরচ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ আমার সংগে ভালভাবে কথা বলেনি।

বিকাল বেলাও আবার ভিক্ষায় বের হলাম। যখন একটি ছোট্ট রেঁস্তোরায় বসে খাচ্ছিলাম তখন একজন যুবক আমার কাছে এসে বসেন। যুবকের শরীরে স্বাস্থ্যে ভরা। তাঁর কোট এবং প্যান্ট বড়ই পরিষ্কার। তার ভাষা পূর্ব্বদেশীয় অর্থাৎ বলকান দেশীয়। যুবককে দেখলেই ধনী লোক বলে মনে হয়। তিনি আমার কাছ থেকে চেয়েই এক খানা ভিক্ষা পত্র নিলেন এবং সেই ভিক্ষাপত্র পড়ে আমার হাতে পঁচিশ মার্ক দিয়ে বল্লেন, পুনরায় যখন দেখা হবে তখন আরও দেবেন।

যুবকের পরিচয় জানার বেশ একটা আগ্রহ হয় এবং তাঁকে তার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন তাঁর নাম Beautyman, বিউটিম্যান। আজ পর্য্যন্ত কোনও লোকের নাম বিউটিম্যান্ বলে শুনিনি তবুও লোকটিকে আমার বেশ ভাল লাগছিল। কথা প্রসংগে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কোন হোটেলে আমি থাকি ? আমার ঠিকানার কার্ডখানা তাঁকে দেই এবং বলি, যদি দরকার মনে করেন তবে দয়া করে আমি যে হোটেলে থাকি সেখানে গেলে বাধিত হব।

মশাই আমি আপনার হোটেলে যাব না, আজই রাতে হেনোভারে যাব, সেখানে হয়ত দেখা হবে, এই বলেই বিউটিম্যান বিদায় নেন।

ফেরবার পথে আরও অনেক রেস্তোরায় যাই কিন্তু কোথাও কোন সাহায্য পাইনি। কোন লোক কথা বল্লনা দেখে দুঃখিত হয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন দেখলাম বিউটিম্যান রেস্তোরাঁয় বসে আছেন। আমাকে দেখামাত্র ভদ্রলোক একটু হেসে বল্লেন, আপনার কার্ড ভাল করে না পড়েই বিদায় দিয়েছিলাম; আপ[illegible] জানেনই আমি একজন ব্যবসায়ী, আপনাদের দেশ থেকে পাট আম[illegible] ফার্ম্মে প্রচুর আসে তবে কথা হল কোনরূপ সুন্দর পাটের থলে আ[illegible]দের দেশে পাওয়া যায় কিনা সে সংবাদটা নেবার জন্যই আসলাম। [illegible]ার দেশ হল মরভিয়া। আমাদের দেশে আমাদের যে এজেন্ট আছে[illegible]র সংগে পত্রালাপ হয়েছে, তিনি শুধু পাট কিনেন এবং নিজের সুখ[illegible]র কথাই লিখেন কিন্তু পাটের তৈরী কিছু জিনিস আছে বলে লি[illegible] না। বলুন ত ব্যাপারখানা কি ?

—তারা হল কাঁচামাল সরবরাহক। ইচ্ছা করেই পাকা মালের সংবাদ দেবে না। ইংলণ্ডের মত কাঁচামাল কিনে সেই কাঁচামালকে পাকামালে পরিণত করে আবার ইণ্ডিয়াতে পাঠাতে চায় বলেই এরা আপনাকে সত্যিকারের সংবাদ দিচ্ছে না। আমার ত এই ধারণা।

—আমারও সেধারণাই হয়, তারা জানে না আমাদের দেশের মজুরকে দিয়ে থুয়ে আমার মত ছোট্ট ফেক্টরী মালিকের কিছুই থাকে না, সেজন্যই তৈরী থলের সন্ধান করছিলাম। যাক শুভক্ষণে আপনার সংগে দেখা হয় সেজন্য অনেক খবর পেয়ে গেলাম। আমিও এ শহরে নূতন এসেছি। আজ এ হোটেলেই রাত কাটাতে মনস্থ করেছি। আপনাদের দেশের অনেক সংবাদ শুনা যাবে। যান মুখ হাত ধুয়ে আসুন তারপর একত্রে খাওয়া যাবে।

ইউরোপের গোপনীয় পুলিশ বড়ই পরিশ্রমী এবং তাদের ধৈর্যেরও শেষ নেই। কাজের শেষ করতে গিয়ে সময় এবং টাকার সৎব্যবহার বেশ ভাল করতে পারে। ইউরোপের লোক সহজে মিথ্যা কথা বলে না এবং সত্য বলে যা একবার বুঝে নেয় তা সহজে পরিত্যাগও করে না। অতএব এহেন দেশে পুলিশের কাজ বড়ই কঠিন। আমি পরাধীন দেশের দুর্ব্বলচেতা লোক। ভেবেছিলাম লোকটি হয়ত গোপনীয় পুলিশ হবে, কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমার সে ভুল চলে যায়।

যুবক আমার ইতস্তত ভাবপূর্ণ মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারেন তাকে আমি সন্দেহ করেছি। তিনি প্রকাশ্যেই বল্লেন, আপনাদের দেশের অনেক বইও পড়েছি। আপনাদের দেশের লোক প্রায়ই নিরক্ষর এবং অন্ধ বিশ্বাসী। তারা দায়ে পড়ে যেমন মিথ্যার আশ্রয় নেয়, চাপে পড়লে আবার কেঁদে ফেলে এবং সত্য কথাও বলে। ইউরোপের অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই আপনাদের দেশের অনেকের স্বভাব। যাকগে এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলে ফেল্লাম। আগামী কল্য সকালেই এখান থেকে বিদায় নেব। আপনার সংগে পথে অনেক স্থানে দেখা হবে। আপনি কি মাদরীদ যাবেন ?

জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

—না মশাই আমি মাদরীদ যাব না, প্যারী হয়ে লণ্ডন যাব। মাদরীদে কি হচ্ছে মশাই, অনেকেই আমার কাছে মাদরীদের কথা জিজ্ঞাসা করছে। আমি মাদ্রীদ যাত্রী ভেবে অনেকে সাহায্য করেছে। এখন দেখছি আপনিও সেকথাটা জিজ্ঞাসা করছেন। যুবক আমার কথা শুনে একটু হাসলেন মাত্র তার পরই নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমিও শুতে গেলাম কিন্তু কতক্ষণ পরই দরজায় একটি মৃদু করাঘাত হল। দরজা খুলে দেখতে পেলাম হোটেল ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে না জিজ্ঞাসা করেই ঘরে প্রবেশ করল এবং চুপে চুপে বল্‌ল, মশাই ঐ যে লোকটি দেখছেন সে মামুলী লোক নয়, হিসেব করে চলবেন। ওর কোন জাত আমরাও স্থির করতে পারি না। নাৎসীদের বিরুদ্ধে এর কাছে একটি কথাও বলবেন না। কি জানি কি হয় এবং আপনাকে কোন বিপদে ফেলারও সম্ভাবনা আছে। হোটেলওয়ালা বিদায় নিলে আমিও শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকাল বেলা যখন হেনোভারের দিকে রওয়ানা হই তখন বিউটিম্যানের সংগে আমার দেখা হয়নি। আমি আপন মনে পথ ধরে চলছিলাম। উনত্রিশ মাইল চলে Gemthim গেম্থিম্ বলে একটি ছোট্ট গ্রামে আসি। গ্রামটি দেখতে বড়ই সুন্দর। গ্রামে থাকা ভাল মনে করে ছোট্ট একখানা হোটেলে উঠি। হোটেল মালিক রুম দেখিয়ে দিয়েই পঁচাত্তর সেণ্ট পকেটস্থ করে চলে যায়। উপরে কয়েকটি রুমই ছিল কিন্তু তাতে একটি লোকও ছিল না। বস্ত্র পরিবর্তন করে শরীরে বেশ মালাজ করে পুনরায় কাপড় পরে গ্রামে বেড়িয়ে পড়ি। গ্রামে একটি পুলিশের সংগে দেখা হয়নি। গ্রামবাসী নিজ নিজ দোকানে বসে নিজেদের কথা বলছিল। প্রত্যেক দোকানীকেই আমার ভিক্ষার কার্ড দিয়েছিলাম। প্রত্যেকেই আমাকে

কিছু কিছু সাহায্য করেছিল। অবশেষে একটি বিয়ার সেল দেখতে পেয়ে তাতে প্রবেশ করলাম। যারা বিয়ার খাচ্ছিল তারা জার্মানীর জাতীয় গান করছিল এবং মাঝে মাঝে হাইল হিটলার বলে চিৎকার করছিল। বিয়ার সেলের পেছনেই একটি মজুরগৃহ ছিল। দূর থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম এটা মজুর গৃহ ছাড়া আর কিছুই হবে না। সেখানে গিয়েও প্রত্যেক মজুরকে এক খানা করে কার্ড দেই। তারা প্রত্যেকে আমার কার্ড পড়ে বলছিল, আজ যদি কোনও আবিসিনিয়ান্ আমাদের এখানে আসত তবে তাকে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করতাম। এই কথা বলেই প্রত্যেকে আমার হাতে দশ সেণ্ট করে দিতে লাগল এবং যারা ইংলিশ জানত তারা অনেকেই ভবিষ্যৎ মাদ্রিদের কথা জিজ্ঞাসা করল।

তখনও মাদ্রিদে ফ্রাঙ্কো রাজত্ব হয়নি, এমন কি তিনি যে একদিন বিদ্রোহ করবেন তাও বোধহয় এশিয়াবাসী জানতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু ইউরোপের লোক রাষ্ট্রনীতি বুঝে বেশ ভাল সেজন্য তারা অনেক বিষয় যা পরে ঘটবে তাই বলতে সক্ষম হয়। তারা যখন শুনতে পেয়েছিল আমি মাদ্রিদের দিকে যাচ্ছি না তখন দুঃখিত হয়েছিল। ইন্টারনেসনেল বৃগেডের গঠন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকেই গড়ে উঠছিল এবং ইন্টারনেসনেল বৃগেডের লোক ফ্রান্স, জার্মাণী, বেলজিয়ম্, হলাণ্ড এবং ইংলণ্ডে জমা হতে আরম্ভ করছিল।

পশ্চিম জার্মানীতে কিন্তু এই ধরনের লোক কমই আসত। জার্মাণী তখনও প্রকাশ্যে ইথোপিয়ার সমর্থকই ছিল। এদিকে ইথোপিয়া সমর্থক অথবা মাদ্রিদ্-পন্থীরা না আসার অন্য একটি কারণও ছিল। নাৎসিইজম এদিকে পেকে উঠেছিল। এন্টি-বৃটিশ প্রপোগেণ্ডা এদিকে বেশ জোরের সহিতই চলছিল। কিন্তু এসব হলে কি হয়, পশ্চিম জার্মানীর

নারী সমাজ পূর্ব্ব জার্মাণীর নারী সমাজের মত নাজিইসম গ্রহণ করতে পারছিল না। তারা নাজিইজম এর চেয়ে নরডিক্ইজম ভাল করে আঁকড়ে রয়েছিল। নরডিকইজমে নারীর সম্মান এবং স্বাধীনতা অত্যধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি, নরডিকইজম মতে নারী কখনও পুরুষের সেবাদাসী হতে রাজি নয়। সহধর্মিণীও হয় না। নারীর নারীত্ব বজায় রেখে পুরুষের সংগে যতটুকু পা ফেলে চলা দরকার মনে করে তার বেশি তারা এক পাও নড়তে রাজি হচ্ছিল না।

হিটলার চাইছিলেন পূর্ব জার্মাণীর মত পশ্চিম জার্মাণীতেও নারীদের শিশু উৎপাদনের মেশিনে পরিণত করবেন, কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের নারী হিটলারের সে আদেশ অবজ্ঞার সহিত বর্জন করেছিল এবং নিজকে রক্ষা করবার জন্য বাইরে যাওয়াও একরূপ বন্ধ করেছিল। সেজন্যই মজুরগৃহে নারীর অস্তিত্ব ছিল না।

দুঃখের সহিত বলছি এই গ্রামে এসে এমন কয়টি বিষয় ঘটতে দেখলাম যা আমি এখানে প্রকাশ করতেও অসমর্থ। জার্মাণ যুবতীরা কি করে মনের দুঃখে ঘরেতেই নিজকে আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়, ঘটনাগুলি সে বিষয়েরই। এদের দুর্ব্যবস্থা দেখে খুব হুসিয়ারীর সহিত চলতাম। ভুল করেও যাতে আমার বৃচেসের বোতাম এঁটে রুমের বাইর না হই সেদিকে সচেতন থাকতাম। রাজপথে কোথাও মূত্র ত্যাগ করতাম না। নারী তুমি মা বোন ছাড়া আর কিছুই নও। তোমাদের সম্মান, তোমাদের সুখ সুবিধা দেখা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। হিটলার ভাবছিলেন তিনি ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে সুখী হবেন কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে তিনি যে সিমেটিক সভ্যতা গ্রহণ করেছিলেন সে সংবাদ তাঁর ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী পলিটিক্স বড়ই বালাই। এতে হিতাহিত জ্ঞান লোপ হয়।

জার্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

গোস্থিম গ্রামে ছেড়ে যখন পথে আসলাম তখন মানচিত্র পড়ে বুঝলাম, আজ চল্লিশ মাইল পথ চলতে হবে। শরীরও বেশ ভালই ছিল। সেজন্য পথের দুদিকের দৃশ্যাবলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পথের পাশেই একখানা ভূগর্ভস্থ ঘর দেখে সেই ঘরটা কিরূপ দেখতে ইচ্ছা হয়। একটা বস্তবড় টিলা। ভূগর্ভ খনন করে যে মাটি উঠানো হয়েছিল তাতেই একটা মস্তবড় টিলা হয়। টিলার উপর শস্য বুনা হয়েছিল। শস্য উঠানো হয়েছিল, কিন্তু শস্যের শিকড়গুলি তখনও ছিল। ভূগর্ভস্থ গৃহের কাছেই একজন মামুলী লোক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে আর বিরক্ত করব না ভেবে ভূগর্ভের পথে নামতে যাচ্ছি এমন সময় লোকটি আমাকে বাধা দিয়ে বল্ল, এদিকে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। আমার মন এতেই কালিমায় আবৃত হয়। বুঝতে পারলাম এটা ঘর নয়, অন্য কিছু। পথ ধরে চল্লাম। কতক্ষণ যাবার পর দেখলাম একটি লোক ড্রিলিং করে মাটির নীচে একটি মোটা পাইপ বসিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে মাটির নীচে পাইপ বসাতে হলে অনেক লোকের দরকার হয়। কিন্তু জার্মাণীতে যন্ত্রের সাহায্যে এক জনই ড্রিলিং করে মাটির নীচে বেশ মোটা একটি পাইপ ঢুকাতে পারে দেখে বিজ্ঞানের উচ্চ প্রশংসা করি। লোকটির কাছে অনেকক্ষণ বসে মাটির নীচ হতে কি রকমের পদার্থ বের হয় তাও দেখি। সময় যে বয়ে যাচ্ছে সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না।

যখন উঠতে যাচ্ছি তখন তিনজন নাজী সেপাই সেদিকে যাচ্ছিল। তারাই আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় যাব? যখন শুনল আমি মেগ্‌দেবার্গ (Magdeburg) যাচ্ছি তখন একজন আমাকে তাদের সংগে যেতে বল্ল এবং আরও জানাল যদি আমি তাদের সংগে যাই তবে গাড়িপথে অল্প সময়ের মধ্যে শহরে পৌঁছে দিতে পারবে।

তাদের কথায় রাজি হলাম এবং সংগ নেই।

আমারা যে পথে চলছিলাম তা হল এক পায়ে পথ। পথে সংগীদের মধ্যে এক জনকে মূত্র ত্যাগের সময় লক্ষ্য করে দেখলাম যে ভাবে লোকটি মূত্র ত্যাগ করল তা সভ্য সমাজ সহ্য করতে পারে না। লোকটিকে কিছুই বল্লাম না। কতক্ষণ চলার পর লোকটি মায়ের জাতের প্রতি কতকগুলি তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথা বলে, যেমন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। আমি নাজী সেপাইকে বলি এসব কথা সিমেটিক জাতের লোকই বলে থাকে জানতাম, জার্মানদেশের লোকের মুখ থেকে এরূপ কথা বের হবে তা ভাবিও নি। আমার কথা শুনে লোকটি ভেবাচেকা খেয়ে যায় এবং নিকটস্থ গ্রামে গিয়ে একটি ঘর থেকে রুটি চেয়ে এনে আমাকে খেতে দেয়। রুটি খাবার পর আর ফাড়ি পথে চলতে ইচ্ছা হল না। বড় পথে চলা ভাল হবে সেই কথা জানিয়ে আমি নাজি সেপাইদের সংগ পরিত্যাগ করি।

নাজি সেপাইরা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য করছিল, সেরূপ মন্তব্য বৃটিশ সেপাই কখনও ইংলণ্ডে করে না কিন্তু যখনই তারা বিদেশে আসে তখনই তারা বিদেশী নারীদের সম্বন্ধে একেবারে বেপরওয়া ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলে।

মেগদিবার্গে আসার পর একটি ভাল হোটেলে স্থান নেই, কারণ আমার কাছে অনেক মার্ক জমেছিল। তখনকার জার্মাণীর নিয়ম মতে পঞ্চাশ মার্কের বেশি কেউ জার্মাণী হতে বাইরে নিয়ে যেতে পারত না। পূর্বদেশীয় জার্মানরা আমাকে অনেক মার্ক দিয়েছিল। এই মার্কগুলি যাতে খরচ হয়ে যায় তারই আমি চেষ্টা করছিলাম। ভাবছিলাম কোলন্ এবং মুনিচ দেখে যাব, কিন্তু পার্বত্য ভূমির উপর দিয়ে যে সকল পথ চলে গেছে তা উঠানামা করতে বড়ই কষ্ট হ'ত সেজন্য আমি

মুনিচ যাইনি। মুনিচ না যাওয়ার জন্যই আমাকে সঞ্চিত মার্ক খরচ করবার সমূহ দরকার হয়েছিল।

মস্তবড় হোটেলে গিয়ে পাঁচ মার্ক দিয়ে একটি রুম ভাড়া নিলাম। রুমটা বেশ প্রশস্ত এবং সুন্দর। সংগেই বাথরুম থাকায় আরও আরাম অনুভব করলাম। সারাটা বিকাল শুয়ে এবং স্নান করেই কাটিয়েছিলাম এবং রাত্রে খেয়ে আসার সময় একটি বড় রেস্তোরাঁয় গিয়ে আড্ডা দিতে বসলাম। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন হাতে এত মার্ক থাকা সত্বেও ছোট রেস্তোরাঁতে খেয়ে বড় রেস্তোরাঁতে যাবার দরকার কি। ইউরোপের সর্বত্রই ছোট রেস্তোরাঁগুলিতে স্বামী স্ত্রীতে মিলে খাবারের দোকান চালায়। এসব রেস্তোরাঁয় সকল সময় খাওয়া পাওয়া যায় না। যখন গৃহস্থ এবং গৃহিণী খায় তখনই খেতে পাওয়া যায়। রেস্তোরাঁয় যদি একটু আগে যাওয়া যায় তবে তাদের পাক প্রণালী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের এই শ্রেণীর একটি খাবার গৃহ ১৯১৩ সালে নৈহাটীতে দেখেছিলাম। পেট চুক্তি খাওয়া—যা পাক হয় তা সমভাগে বিভক্ত হ'ত। খাবার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এরূপ রেস্তোরাঁয় খেয়ে যেরূপ তৃপ্তি হয়, বড় হোটেলে খেয়ে সেরূপ তৃপ্তি হয় না।

বড় রেস্তোরাঁতে গিয়ে একটি ভাল স্থান দখল করলাম। চারদিকে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা সকলেই ধনী বলে মনে হল। আমার পোশাক দেখে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি ব্রাউন শার্টের মেম্বর? ভদ্রলোক যখন শুনলেন আমি কোনও শার্টেরই মেম্বর নই মাত্র একজন ভূপর্যটক তখন তিনি আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কথা প্রসঙ্গে আমাদের দেশের মারশেল রে; অর্থাৎ যারা বংশগত ভাবে যোদ্ধা তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের

দেশের যোদ্ধা জাতগুলির নাম বলার পর ভদ্রলোককে জানিয়েছিলাম এসব প্রশ্ন বাজে এবং অতীব পুরাতন কথা। জার্মাণী কি এখনও বিশ্বাস করে যোদ্ধা বলে একটা জাত আছে? আজ যার হাতে ভাল অস্ত্র থাকবে সেই যুদ্ধে জয়ী হবে। শুধু তাই নয় যারা লড়াই করতে যাবে তাদের পেছনে যদি স্কিল্‌ড মজুর সাহায্যকারী না থাকে অথবা জাতের মধ্যে যদি জনযুদ্ধ ভাব না আসে তবে সে জাত পরাজিত হবেই।

ভদ্রলোক ছিলেন একজন বড় দরের মিলিটারী অফিসার। তাঁকে যখন বুঝিয়ে দিলাম সৈনিক যুদ্ধ যাবার পূর্বে যদি বুঝতে পারে যে সে তার শুধু দেশ নয় মানব সমাজের সেবার্থে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তখনই তার লড়াই করার প্রকৃতি পুরাদমে জেগে উঠে, তার পূর্বে নয়। এবিষয়টা নিয়ে তর্ক বেশ চলছিল। তর্কে আমিই পরাজিত হই কারণ তখনও অস্ত্রের শক্তি, সেপাইদের আত্মবলিদানের প্রবৃত্তি এবং সাধারণ জনসমাজের যুদ্ধের জন্য কত অবদান তা আমার যেমন জানা ছিল না, তার্কিক জেনারেল মহাশয়েরও জানা ছিল না।

মেগদেবার্গ বেশ বড় শহর। একদিন থেকে শহর থেকে চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সেজন্য পরের দিনও থাকতে ইচ্ছা করেই দেরীতে ঘুম থেকে উঠলাম। ঘুম থেকে উঠেই যখন বসবার ঘরে গেলাম তখন দেখতে পেলাম একজন প্রৌঢ় জার্মাণ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি হিন্দুস্থানীতে আমার সঙ্গে কথা বলেন আমিও তাঁর সঙ্গে হিন্দুস্থানীতেই কথা বলি। তিনি বলেন কলকাতার কোনও এক বড় ফার্মের সংগে তার ব্যবসা ছিল এবং সেই সূত্রে কলকাতায় তিনি অনেক বৎসর কাটিয়ে গেছেন। বাঙ্গালী বাবুদের তিনি বড়ই ভালবাসতেন এবং বাঙ্গালী বাবুরা তাঁর কাজ বড়ই সুশৃঙ্খলতার সহিত চালাত।

তাঁর বড় বাবুর স্ত্রী নাকি প্রায়ই তাঁর জন্য ভারতীয় খাদ্য পাক করে পাঠাতেন। আজ হঠাৎ পুলিশের কাছে একজন ভারতীয়ের আসার সংবাদ শুনে তিনি সুখী হন এবং তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছেন! তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়িতে উভয়ে রওয়ানা হই।

অপ্রশস্ত গলি। দুদিকে সুন্দর উঁচু ফুটপাথ পরিষ্কার। ফুটপাথে লোকচলাচল অতি অল্প। বিপরীত দিক থেকে যারা আসছিল তারা আমাদের বামে রেখে চলছিল। জার্মাণীতে ট্রাফিক ডান দিকে চলে। ফুটপাথে চলার সময় কিন্তু "যার তার" বামে চলতে হয়। ডিসিপ্লিন মেনে চলা লোকের অভ্যাস আছে বলেই, পথে চলতে কষ্ট হয়নি। আমরা কিন্তু ডিসিপ্লিন মেনে চলাটাকে ভয়ানক কষ্টকর কাজ মনে করি এবং ডিসিপ্লিন না মেনে চলতে পারলেই সুখী হই। হাত পা ছড়িয়ে শুতে যেমন আমরা ভালবাসি, তেমনি হাত পা বিস্তার করে পাখীর মত ডানা ছড়িয়ে পথে চলতেও ভালবাসি।

নবপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে পৌছে দেখলাম তিনি একখানা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। ফ্ল্যাট বাড়িতে তিনখানা রুম। প্রত্যেকটি রুম প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তিনি যদিও অবিবাহিত তবুও তাঁর ঘরে একজন গৃহরক্ষিণী রেখেছেন। গৃহরক্ষিণী বসবার ঘরে কাফে এনে হাজির করলেন। কাফির কাপে চুমুক দিয়ে জার্মাণ ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—প্রদেশে আসবার কারণ কি বাবু।

—শুধু ভ্রমণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য মশাই।

—আমার ত তা বিশ্বাস হয় না। আপনার মতলব যাই থাকুক না কেন স্পেনে কখনও যাবেন না। স্পেনে সত্বরই গৃহযুদ্ধ বাধবে। সেখানে কমিউনিষ্টরা ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে লড়াই করবে এটা একেবারে

অবধারিত কথা। যে মুহূর্তে কমিউনিষ্টরা লড়াই করতে নামবে, সেই মুহূর্তে ইতালী এবং জার্ম্মানী ফ্রাঙ্কোকে ধনজন এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে। রুশিয়া অবশ্য কমিউনিস্টদের সাহায্য করবে কিন্তু হারবে নিশ্চয়ই।

বল্লাম, এসব বালাই আমার নেই মশাই, আমি স্পেনে যাব না। আমি ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ড যাব এবং যদি অর্থের সংস্থান করতে পারি তবে সেখান থেকে আমেরিকা যাব। এর বেশি আমার আর কোনও মতলব নেই।

—বেশ ভাল কথা তবে মশাই যে আপনি কমিউনিস্ট নন, ভগবানকে ধন্যবাদ এসব বদলোক এখনও ইণ্ডিয়াতে জন্মায়নি। আসুন, আজ আমরা দুজনায় মিলে ইণ্ডিয়ান খাদ্য তৈরী করি।

কথার জবাব না দিয়ে ভারতীয় খাদ্য তৈরীতে মন দিলাম। ভেড়ার মাংস, ভাত এবং মাছের ঝোল পাক করতে পাক্কা দেড় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হ'ল। ঘরে গ্যাস ছিল বলেই এত অল্প সময়ে পাক করতে সক্ষম হই। তারপর যখন খেতে বসলাম, গৃহরক্ষিণী আমাদের খাবার পরিবেশন করলেন। জার্মাণ ভদ্রলোক তৃপ্তির সহিত খেলেন এবং অনুপাতে আমার দেড়া খাদ্য খেলেন দেখে চমৎকৃত হলাম কারণ ইউরোপীয়ানরা ভারতীয় খাদ্য এত অধিক পরিমাণে খেতে পারে তা আমার জানা ছিল না। ইংলণ্ডে যাবার পরও একজন ইংলিশ ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খিচুরী পাক করিয়েছিলেন কিন্তু এই জার্মাণ ভদ্রলোকের মত এত অধিক খেতে পারেননি। খাবার হয়ে গেলে জার্ম্মাণ ভদ্রলোক সোফাতেই শুয়ে পাইপ টানতে আরম্ভ করেন এবং ভারতীয় খাদ্যের প্রশংসা অনেকক্ষণ করেন। জার্মাণ খাদ্য তৈরী করতেও যে কম সময় লাগে তা কেউ বলতে পারে না।

তাদের আলু এবং কপি সিদ্ধ করতে পাক্কা এক ঘণ্টা সময় লাগে। আমাদের ভাত সিদ্ধ করতে তত সময় লাগে না।

বিদায়ের সময় জার্মাণ ভদ্রলোক আমাকে শহর দেখাবার ভার নেবেন বলে বিদায় দেন। তাঁর বাড়ি থেকে এসে আমিও হোটেলে আরাম করে শুয়ে থাকি। বিকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই জার্মাণ ভদ্রলোকের বাড়ি যাই এবং শহর বেড়াতে বের হই। আমরা কয়েকটি প্রাইমারী স্কুলে যাব ঠিক করি। প্রাইমারী স্কুলে বিকাল বেলা ছাত্র থাকে না। ছাত্রের অনুপস্থিতিতে প্রাইমারী স্কুলের ফারনিচার দেখেই সুখী হব সেকথা তাঁকে জানাই এবং তিনি তাতেই সুখী হন। কয়েকটি প্রাইমারী স্কুলেই গিয়েছিলাম। প্রত্যেকটি স্কুলের ফারনিচার একই ধরণের। প্রত্যেকটি স্কুলেই জার্মাণ সাম্রাজ্যের মানচিত্র রক্ষিত ছিল। ছেলেদের বুঝাবার জন্য দুই রকমের মানচিত্র ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর কোন কোন দেশে রাজ্য ছিল এবং দ্বিতীয় মানচিত্রে দেখান হয়েছিল ভবিষ্যৎ জার্মাণী কি চায়। এই এই দুইখানা মানচিত্র দেখেই আমি প্রাইমারী স্কুল দেখার একটি সুন্দর মন্তব্য আমার মনের কোণে আঁকতে পেরেছিলাম। জার্মাণ ভদ্রলোক যখনই জিজ্ঞাসা করছিলেন, এরূপ মানচিত্র রাখা কি অন্যায় হয়েছে? তখনই আমি বলতাম, "ঠিক হুয়া"। জার্মাণ জাত যদি বাঁচতে চায় তবে তাকে এসব পেতে হবেই। আর কি রক্ষা আছে? জার্মাণ ভদ্রলোক যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। যখনই তিনি আমাকে উচ্চ প্রশংসা করছিলেন তখনই আমার মনে হচ্ছিল হেলসিংকির কথা। তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হয়নি, তখনও উইলিয়ম কাইজার বার্লিন হতে পালিয়ে যাননি। কিন্তু একই জাহাজে করে বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মাণ সেপাই ফিনল্যাণ্ডের সোভিয়েট সেপাইদের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

অদূরদর্শি জার্মাণ বুঝতে পারছিল না, একজনের প্রশংসায় যে লোক আপন ভুলে যায় সে কোনও মতেই এতটুকু ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় না।

এই ভদ্রলোক ভারতে অনেক দিন থেকে ভারতের খুটিনাটি অনেক কথা জেনেছিলেন এবং কি করে বৃটিশদের সরিয়ে দিয়ে জার্মাণরা ভারতে নুতন সাম্রাজ্য গড়তে পারবে তারই কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু এই ধুরন্ধর জানত না যেমন ইউরোপে তেমনি এশিয়ার কোন কোন স্থানে সাম্রাজ্যবাদী এবং উগ্র সাম্রাজ্যবাদীদের উভয়ের সংগে একই সংগে যুদ্ধ করার জন্য অনেকেই তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে মার্শেল টিটো এবং মাওসুতং মাত্র কৃতকার্য হন। যখনই সাম্রাজ্যবাদী এবং উগ্রসাম্রাজ্য-বাদীতে লড়াই লাগে তখনই মারশেল টিটোর পথ অবলম্বন ছাড়া পরাধীন জাতের আর উপায় থাকতে পারে না।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দেখা হয়ে গেলে, যখন হোটেলে ফিরে যাব তখন জার্মাণ ভদ্রলোক বল্লেন, আর একটা জিনিস দেখে যান। এখানে একটি ঔষধের কারখানা আছে। সেই কারখানায় দিনরাত কাজ চলে। আপনার মত কোনও ভূপর্যটক যদি কারখানাটি দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে হয়ত কারখানার ডাইরেক্টরগণ আপনাকে বিজ্ঞাপন বাবত কিছু টাকাও দিতে পারেন। আমি তাতে রাজি হইনি। তাঁকে বলছিলাম, ঔষধের বিজ্ঞাপন বিলি করে কারো কাছ থেকে অর্থ নেব না, আমি পর্যটক। পর্যটককে যারা ভালবাসে তাদের সাহায্যই আমার কাছে যথেষ্ট। জার্মাণ মহাশয় যখন বুঝলেন আমি টাকার গোলাম নই তখন আমাকে ঔষধের ফ্যাক্টরীতে নিয়ে যেতে তার আর ইচ্ছা হল না। আমি কিন্তু ঔষধ ফ্যাক্টরীতে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম এবং তিনি আমাকে সেদিকে নিয়ে গেলেন।

ফ্যাক্টরীটি শহরের বাইরে ছিল না সেজন্য আমাদের সেখানে

যেতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগেনি। আমরা যখন ঔষধ ফ্যাক্টরীতে গিয়ে পৌছলাম তখন আট ঘণ্টা মজুরী দিয়ে এক দল বেড়িয়ে পড়ছিল। তাদের ফ্যাক্টরী হতে বের হওয়ার পদ্ধতিটা আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগছিল। আমাদের দেশে বড় বড় অপিস থেকে ভদ্রলোকদের বেড়িয়ে আসার সময় তাদের মুখের ভাষা অশ্রাব্য হয়, তাদের পায়ের গতি বেতালা হয়, মনে হয় যেন একপাল মেষ চালক হীন হয়ে পথে ঘাটে দৌড়াদৌড়ী করছে। আর এদের মুখের ভাষা সংযত, গমন শৃঙ্খলিত। যদিও অনেকের মুখেই পরিশ্রমের কালিমা পড়েছে তবুও দেখে মনে হয় অত্যন্ত পরিশ্রমী লোকটির মুখেও একটি শান্তির আভা রয়েছে। আমাদের দেশে অসভ্য বর্ব্বর বলে যে সকল মজুর পরিচিত তারাও যখন ফ্যাক্টরী হতে বের হয় তখন তাদের গতিবিধিও অনেকটা সংযত, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যারা তারাই অন্য ধরনের। এটা হবার নানা কারণ আছে।

এখান থেকে যারা বের হচ্ছিল তারা কিন্তু সকলেই স্কিলড মজুর। এর মানে হল আমাদের দেশে যারা বি এস্ সি পাস করে কোনও কেমিকেল ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, কর্ম্ম ক্ষমতায় তারা তাদেরই মত।

এসব স্কিলড মজুর চলে যাবার পর আমরা ম্যানেজারের রুমে প্রবেশ করলাম। ম্যানেজার তখন রুমেই ছিলেন। উভয়ে মিলে যখন হাইল হিটলার বলে ম্যনেজারের সামনে দাঁড়ালাম তখন তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। আমার সংগের ভদ্রলোক আমার পরিচয় দিয়ে আমাদের আসার উদ্দেশ্য বল্লেন। ম্যানেজার সম্মান দেখিয়ে আমাদের বসতে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি দেখতে চান? আমি বল্লাম, ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই, ঔষধ সম্বন্ধেও তথা। আমি আপনাদের স্কিল্ড মজুরদের সম্বন্ধে কটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তারই

উত্তর চাই। ম্যানেজার আমার প্রশ্ন শুনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধরুন দুজন মজুরের মধ্যে কোনও কারণ বশত বিবাদ হল এবং একে অন্তের সর্বনাশ করবার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে এবং ফ্যাক্টরীর বাইরে তাদের বিবাদ মেটাবার কোনও সুযোগ না পায় এবং ফ্যাক্টরীতেই সেই বিবাদের একটা হেস্তনেস্ত করবার মতলব করে, একের কাজ অন্য নষ্ট করার প্রয়াসী হয় তখন আপনারা তার কি প্রতিবিধান করেন ?

ম্যানেজার আমার কথা শুনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বল্লেন, এটা স্কিলড মজুরের কর্মক্ষেত্র, এখানে সেরূপ হবার কোনও কারণই নেই, জার্মাণীর সাধারণ মজুরের মধ্যেও সেরূপ দুর্মতি কারো নেই।

তারপর কি ভাবলেন এবং সংগের জার্মাণটিকে আমার সংগ পরিত্যাগ করার আদেশ দিলেন। আমার ঔষধ ফ্যাক্টরী দেখা আর হয়নি। হিন্দুস্থানী জানা জার্মাণ ভদ্রলোক বাইরে এসে বল্লেন, আপনার সংগে আর কোথাও আমি যাব না। ঐ আপনার পথ। ঐ পথ ধরে আপনি আপনার হোটেলে পৌঁছতে পারবেন। তারপরই তিনি বিপরীত পথ ধরে অন্যত্র চলে গেলেন।

হোটেলের দিকে রওয়ানা হবার সময় মাথা নত করে পথ চলছিলাম আর ভাবছিলাম, ভারতে যারা সভ্য বলে পরিচয় দেয় তারা একে অন্যের সর্বনাশ করার জন্য এমন অন্যায় পথ অবলম্বন করে যার তুলনা সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদেশে গিয়েও অনেকে সেরূপ অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

এডিনবড়ায় এক বাংগালী ছাত্রের সংগে এক বাড়িওয়ালীর বিবাদ হয়। বাড়িওয়ালী বাঙ্গালী ছাত্রকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে

বলে। ছাত্র মহাশয়ের বাড়ি পরিত্যাগ ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। তিনি বাড়িওয়ালীর প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য, কতগুলি মল জাজিমের কাপড় ছিড়ে তারই ভেতর, আসবার সময় রেখে আসেন। বাঙ্গালী ছাত্র মহাশয় ভেবেছিলেন বেশ প্রতিশোধ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কাজের ফলে ভবিষ্যতে কোনও বাঙ্গালী ছাত্র সেই বাড়িতে আর স্থান পেত না। এডিনবড়া বড় সহর হলে কি হয়? সেখানে বর্ণ বিদ্বেষ বিশেষ ভাবে প্রচলিত। এহেন কুস্থানে সকল বাঙ্গালী ছাত্র সকল সময় লজিং খুঁজে বের করতে পারে না। কয়েকটি বাড়িতেই ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের থাকতে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে একটি বাড়িতে বাঙ্গালী ছাত্রের প্রবেশ নিষেধ হওয়ায় অপর বাঙ্গালী ছাত্রেরই হয়রাণ হতে হয়েছিল। যিনি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তার প্রতিশোধের প্রতিফল সকল বাঙ্গালীকেই পেতে হয়।

এই সংগে বলছি, আজ হয়ত সেই ভদ্রলোকই কোনও বড় একটা কাজ নিয়ে বেশ সুখেই আছেন এবং তাঁর পরিচালিত ফ্যাক্টরীতে যারা কাজ করছে তাদের অনেককে শাস্তির ব্যবস্থাও করছেন। জার্মাণ ম্যানেজারকে আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম, সেরূপ ভাবে মজুরে মজুরে প্রতিশোধ তার ফ্যাক্টরীতে বোধ হয় অনেকে নেয়, সেক্ষেত্রে তিনি কি শাস্তির ব্যবস্থা করেন জানেন। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় হল, এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে কি হীন ভাবে প্রতিশোধ নেবার প্রথা রয়েছে।

আমেরিকাতে এখনও ইণ্ডিয়ানদের মোকদ্দমা বিচারের জন্য কোর্টে পাঠানো হয় না, কারণ এমেরিকার পুলিশ জানতে পেরেছে, ভারতবাসীদের মধ্যে মিথ্যা মোকদ্দমার করে একে অন্যকে হয়রান করার প্রবৃত্তি আছে। যাদের মধ্যে মিথ্যা মোকদ্দমা করা এবং সেই

সেই মিথ্যা মোকদ্দমা শিক্ষিত উকিল সাজিয়ে কোর্টে হাজির করে সেই দেশের শিক্ষিত সমাজ কত হীন স্তরের তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

এরূপ নানা চিন্তা করে যখন হোটেলে ফিরে এসেছিলাম তখন দেখতে পেলাম এক জার্মাণ যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমাকে বেশ ভাল করে হাইল হিটলার বল্ল এবং আমিও তাকে তারই অনুপাতে হাইল হিটলার বল্লাম। বসবার ঘরে বসে উভয়ে মিলে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করার কথা নিয়েই আলোচনা হ'ল। বুঝতে পারলাম এই যুবক আর জার্মাণীতে থাকতে ভালবাসছে না। এমন কি জার্মাণ নেসনেলিটি পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে চাইছে। খাঁটি জার্মাণ হয়ে দেশত্যাগ, জাতিত্যাগ করাব চিন্তা মনে আসা অতীব দুঃখের ফলেই হয়ে থাকে। যুবকের প্রাণের কথা জানতে ইচ্ছুক হলাম। যুবক অনেকক্ষণ তার মনের কথা আমার কাছে প্রকাশ করেনি তারপর উপরে গিয়ে সে হঠাৎ কেঁদে ফেলে। তার ক্রন্দন দেখে মনে হ'ল সে একটি অসৎ লোক। তার প্রতি আমার সকল রকমের সহানুভূতি চলে গেল। আমার সিঙ্গাপুরের বন্ধু গৌরীশ চন্দ্র সিংহ রা[illegible]কে অন্য আর একটি বাঙ্গালী ঠকিয়েছিল। যখন তাকে গৌরীশের বন্ধুগণ ধরে ফেলে, সেও এই জার্মাণ যুবকের মতই কেঁদেছিল। জার্মাণ যখন কাঁদছিল তখ[illegible] আমি একটি চেয়ারে বসে একখানা ইংলিশ কাগজ পড়তে আরম্ভ ক[illegible]। যুবকের ক্রন্দন শেষ হয়ে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মশাই এখন বলুন আপনার কি বলার আছে?

যুবক তখন তার মনের দুঃখ সহজ ও সরল ভাবে প্রকাশ করে। বাস্তবিকই যুবকের কাহিনী বড়ই করুণ। সমকামের ফলে তার পুরুষত্বের হানি হয়। ডাক্তার তাকে উপদেশ দেন, তার এ জীবন ব্যর্থ হয়েছে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই অপকর্মের জন্য দায়ী কে? সে অকপটে বলে এর জন্য দায়ী তার স্বদেশবাসী এবং তার পিতামাতার দরিদ্রতা।

যুবককে বললাম, স্বদেশবাসী কথাটা উঠিয়ে দিয়ে, শুধু আপনার পিতামাতার দারিদ্র কথাটাই মনে রাখুন। আপনার মা বাবার দারিদ্র্যই আপনার সর্বনাশ করেছে। এখন আপনি পণ করুন, জার্মাণীতে কারো মা বাবা যেন দরিদ্র না থাকে, তবেই আপনার জীবন সার্থক হবে। তবে এদিকে কাজে অগ্রসর হওয়া বড়ই কষ্টকর। আমি আপনাকে এ বিষয়ে ভাল উপদেশ দিতে পারব যদি আপনি আমার সংগে জার্মাণীর বাইরে কোথাও দেখা করেন। আমি আর মাত্র দুমাস জার্মাণীতে থাকব, এর বেশি নয়।

—আপনার সংগে কোথায় দেখা হতে পারে?

—এই ধরুণ আমস্টারডমে।

—তাই হবে মশাই, আমি তাই করব।

আমোস্টারডমে যাবার পর আমি ছিলাম একটি গরিবখানায়। সেখানে দৈনিক চার আনার মত ঘর ভাড়া দিতে হ'ত। খাবার খেতে লাগত আমাদের দেশের ছ আনা। সিগারেট খরচ হত দু আনা। এত সস্তা স্থানে বিদেশী লোক গিয়ে কখনও থাকে না এবং এসব স্থানের অবস্থিতি কোথায় তারও সকলের সন্ধান করার সু্যোগ হয় না। এরূপ লজমেণ্টে দুদিন থাকার পরই আমার পূর্ব পরিচিত জার্মাণ যুবক এসে দেখা দিয়েছিলেন।

আমস্টারডমের নিকৃষ্টতম একটি স্থানে ভারতীয় পর্যটককে অম্লান বদনে বাস করতে দেখে জার্মাণ যুবকের বেশ কষ্ট হয়। দুঃখ করে বলেন, ভগবানের ইচ্ছা অপরূপ, কাউকে রাজপ্রাসাদে রাখেন আর

কাউকে আস্তাকুড়ে রাখেন।" লোকটির কথা শুনে আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। আমি বললাম, আপনাদের দেশেই কার্ল মার্কসের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু এ হেন দেশে এত নির্বোধ কি করে জন্মে আমার জানা ছিল না। ধনী এবং দরিদ্র বলে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেনি। এ দুনিয়াতে সবল দুর্বলকে দাবিয়ে রাখে, বুদ্ধিজীবী বেকুবের কথা সর্বস্ব হরণ করে। এ কথাটাও বুঝতে পারেন না ?

যুবক বল্লে, আপনি দেখছি আমাদের দেশের সোসিয়েলিষ্টদের মতই কথা বলছেন। তাদের মধ্যে সমকামের প্রচলন আছে সেজন্যই কেউ তাদের মত গ্রহণ করেনি, করবেও না।

—এবং তাদের সাহায্যেই জার্মাণ ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের বিতারণ করেছে। মনে রাখবেন পৃথিবীর সর্বত্র সোসিয়েলিস্ট দল সব সময় ধনীদের সংগে হাত মিলিয়ে চলে এবং মুখে বলে মার্কস্ইজম। এদের কথা এবং অন্য কোন দলের কথা আমার কাছে বলবেন না। কোন দলের আওতায় আমি নেই। যা ভাল বুঝি তাই বলি। আপনার পতনের কারণ দারিদ্র্যকেই সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করতে হবে। তারপর বলতে হবে এহেন দুষ্ট দরিদ্রতার হাত থেকে যদি রেহাই পেতে চাও তবে প্রলিটারিয়েট ডিক্‌টেটরী ছাড়া আর উপায় নেই। কি করে প্রলিটারিয়েট ডিক্‌টেটর ভবিষ্যৎ বংশদের রক্ষা করতে পারবে তাও আপনাকে বলতে হবে নতুবা কেউ আপনার কথা শুনবে না। আমষ্টার-ডমে আমি দশ দিন থেকেছিলাম। এই দশ দিনই জার্মাণ যুবক এবং একজন পাদ্রী আমার সংগে সকল সময়ই ছিলেন। যেদিন আমি আমস্টারডম হতে বিদায় নেই সেদিন পাদ্রী আমার সংগে পদব্রজে অনেক পথ অগ্রসর হয়ে বিদায় দেন।

এই জার্মাণ যুবকের সংগে পরে লণ্ডনে দেখা হয়। সে জার্মাণ

কলনী পশ্চিম আফ্রিকায় নাগরিক হবার আবেদন করে তাতে কৃতকার্য হয় এবং আমার সামনেই পশ্চিম আফ্রিকাতে রওয়ানা হয়ে যায়। বিদায়ের পূর্বে আমি জার্মাণ যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি বর্ণ-বৈষম্য মেনে চলবে? উত্তরে সে বলে, তার কাছে বর্ণবৈষম্য পৌছবে না কারণ পশ্চিম আফ্রিকার কালাহারী মরুভূমিতেই বসবাস করবে। ডাক্তার নাকি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, মরুভূমিতেই বসবাস করা তার পক্ষে ভাল হবে।

এবার আমি হেনোভারের যাত্রী। হেনোভার জার্মাণীর একটি বিশেষ শহর। এথান থেকেই নাকি অনেক সেক্সন্ চলে গিয়ে বৃটেনে বসবাস করে, সেজন্য স্থানটি দেখবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হয় কিন্তু পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বাতাস পশ্চিম দিক হতে আসছিল। পথে অনেক ঘটনাও ঘটে। হেনোভার পৌছবার পূর্বে কথনও সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিনি এবং কথনও বড় হোটেলে যাইনি। সর্বদাই গরিবদের আশ্রয়স্থানে কাটিয়ে হেনোভরে পৌছি। ব্রান্‌চে্‌ড (Braunschwd) পৌছবার পর স্থানীয় দরিদ্র নিবাস খুজে বের করে তাতে ঢুকে পড়লাম। এদেশে দরিদ্রনিবাসকে মজুরগৃহ বলে, পূর্বে এসব সেলভেসন আর্মির বাড়ি ছিল।

ব্রান্‌চেভোর গরীবগৃহ খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগল না। ঘরটা দোতলা। উপরের তলায় মজুর রাত্রে থাকে আর নীচ তলায় খাওয়া বসা এবং পাক হয়। দরজার কাছে পৌছা মাত্র একটা দুর্গন্ধ অনুভব করলাম। ঘরটাতে প্রবেশ করতেও ইচ্ছা হল না। কিন্তু কি করি পশ্চিম জার্মানীতে আসার পর জার্মানীর মজুর গৃহ একটিও দেখিনি সেজন্য চিন্তা না করেই ঘরে প্রবেশ করে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কেউ ইংলিশ কথা বলতে পারেন? অন্তত দশজন

লোক একই সংগে ইংগিত করে জানাল তারা সকলেই ইংলিশ বলতে পারে। তাদের মুখ এবং পোশাক দেখে মনে হল, এরা সকলেই যেন বিদেশী।

আমীর নামীয় একটি আরব আমার কাছে এসে বল্ল, বল ভাই কি সাহায্য চাই?

সাহায্য! সর্বপ্রথম সাহায্য চাই এখানে যদি আজ রাত কাটাই তবে কত দিতে হবে তা জেনে নেওয়া, দ্বিতীয় কথা হল, কখন খাবার পাব এবং বিছানাটা কিরূপ হবে? চতুর্থ কথা হল, বাইসাইকেল খানা বাইরে রয়েছে তা যদি চুরি হয় তবে জাহান্নামে যাব, তারও একটা ব্যবস্থা করা।

আমীর হাক দিয়ে ডেকে জন্‌সন্‌কে বলল, এদিকে এস ত, এর সাইকেলটা মালগুদামে রেখে এস। আপনি জন্‌সনের সংগে যান্ সেই সাইকেল রাখার ব্যবস্থা করে আসবে। সাইকেল সমেত পিঠ ঝোলাটাও মালগুদামে রেখে আসবার সময় শুধু অটোগ্রাফ বইখানা হাতে করে নিয়ে এলাম। সাইকেল এবং পিঠঝোলা রাখার জন্য রসিদ দেওয়া হয়নি। তারপর যখন ঘরে এসে বসলাম তখন আমীর আমাকে বল্‌ল, থাকবার জন্ত চল্লিশ সেন্ট আর এখানে পেট চুকতি খানা, তার জন্তও প্রত্যেক বেলা পঁচিশ সেন্ট করে দিতে হয়। পারবেন ত?
—হাঁ ভাই তা দিতে পারব। এই বলেই কলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বেশ তাজা হয়ে তাদের কাছে বসলাম। জন্‌সন্ যদিও বৃটন তবুও সে এখানে চাকুরি পেয়েছে। সে মালগুদামের ইন্‌চার্জ। আমীর এখানে থাকে আর ফুর্তি করে। আর যে কয়জন লোকের সংগে বন্ধুত্ব হয়েছিল তারা নানা দেশবাসী। এদের মধ্যে একজন মিশরীয় আরব, দুজন ত্রিপলীর আরবও ছিলেন। মোট চারজন আরব পেয়ে সুখী হই। আমীরের

বাড়ি ছিল এডেন্ সেজন্য তিনি হিন্দুস্থানী এবং ইংলিশ বেশ ভাল জানতেন। তাঁর সংগে হিন্দুস্থানীতেই কথা বলতাম এবং তাকে আমি আমার স্বদেশবাসী বলেও পরিচয় দিতাম। আমীরের সংগ পেয়ে সুখী হই এবং জার্মাণী সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানতে পারি।

সর্বপ্রথমই আমীর আমার অটোগ্রাফ বইটা দেখতে চাইলেন। তাঁকে আমার ভ্রমণের আরম্ভ হতে জার্মানীতে পৌছানো পর্যন্ত প্রত্যেক দেশের লোকের অটোগ্রাফ দেখালাম। আরবদের অটোগ্রাফ দেখে তিনি সুখী হন এবং বলেন, সমুদয় আরবদেশ আপনার ভ্রমণ করা উচিৎ ছিল। আরবের প্রত্যেকটি পাহাড়ের ইতিহাসের সংগে সম্পর্ক রয়েছে। আমীর যখন আরব দেশের গুণকীর্তন করছিলেন তখন তাঁর মুখ হতে যেন খৈ ফুটছিল এবং তাঁর আওয়াজ ক্রমেই উচ্চে উঠে হিটলারের লেকচারে পরিণত হচ্ছিল। আমীরকে বললাম, আপনার স্বদেশ প্রেম প্রশংসনীয়। আমি জার্মাণীতে এসেছি, জার্মাণীর কথাই আপনার কাছ থেকে শুনব। জার্মাণীর কথা যখন আমীর আমার কাছে বলতেন তখন প্রায়ই হিন্দুস্থানীতে কথা হ'ত এবং অন্যান্য তিনজন আরবের সামনে কোন কথাই বলা হ'ত না। ত্রিপলীর আরবদ্বয়ের সম্বন্ধে তাঁর বদধারণা ছিল। তিনি বলতেন এরাও ফেসিস্থ। মুসলিনীর গুপ্তচর। কতকগুলি ত্রিপলী আরব প্যানইস্‌লামের সহায়তার জন্য দেশ বিদেশ ভ্রমণ করত এবং তাদেরই অজানীতে মুসলিনীর গুনকীর্তন করত। অন্য দুটি আরব কিন্তু সেরূপ ছিলেন না। তাঁরা মুখ খুলে কথা বলতেন না। যেন "টাইম পাস" করে যাচ্ছিলেন। "টাইম পাস" শব্দ দুটির বিশেষ অর্থ আছে। যারা স্বদেশ হতে বিতাড়িত হয়ে ভিন্ন দেশে গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হন, তাদের বিদেশে গিয়ে চিন্তাযুক্ত ভাবে বসে থাকাকেই বলে "টাইম পাস"। এঁদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে তাদের বিরক্ত

করতাম না। এতে তাঁরা আমার প্রতি খুসী ছিলেন। আমীর কিন্তু এদের "টাইম পাস" করাটাকেও সন্দেহের চক্ষেই দেখতেন।

পাঁচটা বাজতেই মজুর ঘরে ঘন্টি পড়ল। এই ঘন্টির মানে হল এখন কাফি খাবার সময়, যার ইচ্ছা কাফি খেয়ে নেও। পাঁচজনের জন্য কাফির আদেশ দিলাম। কাফির সংগে বিস্কুটও কিনলাম। কাউকে সিগারেট যাচাই করা মজুর গৃহের আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ ছিল কারণ সিগারেট ছিল আক্রা, মানে সকলে কিনতে পারত না। সেজন্য কাউকে সিগেরেট দিলাম না। কাফি বেশ সুস্বাদু ছিল। তবে চিনি কমই দেওয়া হয়েছিল। আমার বেশি চিনির দরকার হওয়ায় আরও চিনি চেয়েছিলাম। অবশ্য সেজন্য কিছু সেণ্টও বেশি দিতে হয়েছিল।

কাফির টেবিলে জনসন্‌ও ছিলেন। দু চার চুমুক কাফি খাবার পরই সকলের দিল খুলে গেল। জন্‌সনই বলতে লাগলেন, জার্মাণীতে যেমন কাফি সুস্বাদু তৈরী হয় পৃথিবীর কোথাও তেমন কাফি তৈরী কেউ করতে পারে না।

আমীর বল্লেন, জনসন্ তোমার পৃথিবী বড়ই ছোট, লণ্ডন থেকে হামবাগ হয়ে এখানে এসেছ এই ত ?

—এর বেশি কি পৃথিবীতে আর কিছু আছে ? জার্মাণী, ফ্রান্স, হলেণ্ড, বেলজিয়ম আর গ্রেটবৃটেন নিয়েই ত পৃথিবী, তা নয় কি ?

—হাঁ তাই, এই বলেই আমীর চুপ করে রইলেন।

আমি আমীরকে বল্লাম, বাস্তবিক জন্‌সন যা বলেছেন তাই ঠিক। এই কয়টি দেশের লোকই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করছে। আর যত দেশ দেখছ তারা সকলেই এদের হাতের পুতুল।

জন্‌সান বল্লেন, আমি তাই মনে করে কথাটা বলেছিলাম। এরা অনেক সময় তা বুঝেনা।

জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

আমীর বল্লেন, সোভিয়েট কি এদের হাতের পুতুল?

—এখনও সোভিয়েট রুশিয়া গড়ে উঠেনি হে, টলমল করছে, কখন ডুবে যাবে, কেমন মিস্টার আপনি কি বলেন?

আমি নীরব থাকাই পছন্দ করলাম। সেজন্য কিছুই জবাব দেইনি।

আমীর রেগে বল্লেন আরে রেখে দেও তোমার বাজে কথা। হিটলারের জন্মদাতা বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা ভেবেছে হিটলারের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েট রুশকে ধংস করবে, তা কি কখন হয়। সোভিয়েট রুশিয়ায় বেড়িয়ে এসেছি হে বুঝলে ত? সংগে ত তুমিও ছিলে।

আরবদের মধ্যে একটি কুপ্রথা আছে। সেই প্রথাটি হ'ল, যদি কেউ গল্প বলার সময় ইচ্ছা করে কোনও মিথ্যা কথা বলে তবে তার পাশের লোকটিকে সাক্ষী করে। পাশের লোকটি কিছুই বলে না, শুধু তার চোখ দুটা আলুঢালু করে। এতেই বুঝতে হবে লোকটা যা বলছে তার সবই মিথ্যা কিন্তু আমীরের পাশে বসা আবু সেরূপ কিছুই না করে বলে উঠল "বেগ্‌রা খোদাই" দেশের কথা না বল্‌লেই ভাল হ'ত।

বুঝতে বাকি রইল না এরা উভয়েই সোভিয়েট রুশিয়ায় নাবিকের কাজ নিয়ে গিয়েছিল এবং বন্দরের আশেপাশে যা দেখেছিল তাই নিয়ে একটা মামুলী ধারণা পোষণ করে চলে এসেছে। আবু প্রকাশ্যেই বল্লেন, সোভিয়েট রুশ এমন জঘন্য দেশ যে সেখানে বারবনিতা বলে কিছুই নেই, পুরুষগুলি কি করবে হে?

জার্মাণীর প্রায় স্থানেই বারবনিতা লোপ হয়েছিল কিন্তু হামবার্গ, হেনোভার প্রভৃতি স্থানে বারবনিতার অভাব ছিল না। কথা হ'ল জার্মাণীর বারবনিতাবৃত্তি হিটলারের আমলে যা চলত তা বড়ই গোপনে। অনেকেই বুঝতেই পারত না বারবনিতা কি ভাবে কোথায় থাকে।

বিদেশী পলিটিক্সের কথা শুনতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না সেজন্য কথার মোড় ফেরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, এদেশ থেকে কি কমিউনিস্টরা একদম সরে পড়েছে ?

আবু বল্লেন "এ শূয়ররা যেখানে একবার প্রবেশ করে সেস্থান কি সহজে পরিত্যাগ করে ? এরা একেবারে দাজ্জাল, শয়তান ইত্যাদি।"

আমি বল্লাম, কোথাও ত দেখতে পাচ্ছি না ? পাশে বসা আমীরের দুটা চোখ জবা ফুলের মত হয়েছিল। তিনি সকলের কথাই শুনছিলেন অথচ কিছুই বলছিলেন না। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে আমার হাত ধরে বল্লেন, চলিয়ে সাহেব, থোরাসা বাহার যায়েংগে। বাইরে এসে বল্লেন, এটা হল জার্মাণী। এখানে সকলেই সোভিয়েট বিরোধী। আবু সোভিয়েটে পৌঁছে যখন বারবনিতা পেল না তখন সোভিয়েটে থাকতে পছন্দ করেনি, সেজন্য সে হামবার্গে চলে আসে, সাথের দুজন প্যান ইসলামি, সোভিয়েটের নাম শুনলেই কেঁপে উঠে অথচ মুসলিনী তাদের ঘাড়ে বসে বগল বাজাচ্ছে তা যেন বুঝতে পাচ্ছে না। এদের সংগে কথা বলে সময় ক্ষেপণ করে কোন লাভ নেই। চলুন আমি আপনাকে একটি স্থানীয় ক্লাবে নিয়ে যাই, সেখানে অনেক ভদ্রলোক পাবেন যাদের সংঙ্গে কথা বলে আরাম হবে।

আরব জাতের আর একটি বিশেষত্ব আছে। তারা যে বিষয়ে মাথা পাতে না, সে বিষয় সম্বন্ধে চিন্তাও করে না। জার্মাণীতে কোনও আরব বিয়ে করতে পারবে না বলে হিটলার একটি আদেশ দেন। অন্য তিনজন আরব এ বিষয়ে চিন্তাও করত না। কিন্তু আমীর এই বিষয়টাকে এতই বড় করে দেখছিলেন যে তাঁর সামনে অন্য কোনও বিষয় যেন আসতই না। চলার পথে শুধু বিয়ের কথাই বলছিলেন। মানুষের মধ্যে সম্মান এবং অসম্মান বলে দুটি স্তান আছে। আমীর হিটলারের

আদেশ ঠিক অসম্মানের একটি মস্তবড় বোঝা ভাবছিলেন এবং যাতে হিটলার তাঁর এই আদেশটি প্রত্যাখ্যান করেন তারই জন্য সতত চেষ্টা করতেন। আমীর হিটলারের শক্তি বুঝতে পারতেন না। তিনি ভাবতেন' হিটলার শুধু কটি বাক্যে আদেশ দিয়েই সুখী হবেন এবং অন্য জাত যখনই হিটলারের আদেশের প্রতিবাদ করবে তখনই সেই আদেশ পরিত্যাগ করবেন। বাস্তবিকই শহরের ভেতর থেকে হিটলারের শক্তির কিছুই বুঝা যেত না।

দু এক জন লোককে শুধু মিলিটারী পোশাকে দেখা যেত। হিট-লারের ডিসিপ্লিন চলত গ্রামে এবং যেখানে কলকারখানা চলে সেখানে। শহরে তিনি কমই পরিবর্তন এনেছিলেন।

আমরা যে ক্লাবে চলছিলাম তা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অনেক দিন সাইকেলে চলুলে পায়ে হেটে চলতে মোটেই ভাল লাগে না সেজন্য আমরা মোটরে যাওয়াই ঠিক করে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম এবং মিনিট দশেকের মধ্যে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে ট্যাক্সিকে বিদায় দিলাম। ট্যাক্সি হতে নেমেও আমাদের কতক্ষণ হাটতে হয়েছিল। পথের দুদিকের দোকান এবং পথচারীদের সহজ এবং সরল ভাবে পথ চলা দেখে মনে হচ্ছিল এদেশে রাষ্ট্র বিপ্লব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। শহটি একেবারে শান্ত।

কতক্ষণ আরও হেটে আমরা একটি বিয়ার সেলের সামনে আসলাম এবং বিয়ারের ষ্টেণ্ড থেকে দুগ্লাস বিয়ার খেয়ে পেছন দিকে চলে গেলাম। আমাদের যাওয়া কেউ লক্ষ্য করল না, আমরাও কোনরূপ দ্বিধা না করে পেছনের দিকে চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা হল। তাতে অন্তত দুশ লোক বসে কাফি এবং নানারূপ খাদ্য খাচ্ছে। তারা ধীরে আস্তে কথা বলছিল। ঘরটাতে হিটলারী চাঞ্চল্য কিছুই অনুভব

হচ্ছিল না। অন্যান্তরা যেমন করে নীরবতা বজায় রাখছিল, আমরাও তেমনি নীরবতা বজায় রেখে ছুটি চেয়ার দখল করি। এসব ক্লাবে গিয়ে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে হয়। আধঘণ্টার মধ্যে হয়ত একবার মাত্র বয় এসে জিজ্ঞাসা করবে, "কি চাই?" আমাদেরও আধঘণ্টার পর বয় এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই?" আমরা বল্লাম, দু পেয়ালা কাফি আর দু প্যাকেট সিগারেট। এসব স্থানে সিগারেট এবং দেশলাইও পাওয়া যেত।

আধঘণ্টার মধ্যে আমরা একেবারে চুপচাপ ছিলাম। কেউ এখানে এসে সংবাদপত্র পড়ে না। সকলেই যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। আগন্তুক আসার পর দেশবাসীর বিশেষ কোন ব্যগ্রতা দেখাচ্ছিল না। আসছ, বস এই ভাব। আমরা যাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তারা পূর্বেই এসেছিলেন। অন্য টেবিলে ব্যস্ত থাকায় আমরা তাদের কোনরূপ ইংগিত করিনি, তারাও যে আমাদের দেখতে পেয়েছেন সেরূপ ভাব প্রকাশ করেন নি। ঘণ্টা দুই বসার পর এক ভদ্রলোক এসে আমাদের কাছে বসলেন এবং আমীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোকটি কে? আমীর আমার পরিচয় পত্র তার হাতে দেবার পর ভদ্রলোকের মুখ সাদা হয়ে গেল। সাদা হয়ে যাওয়ার মানেই হল, আমার সম্বন্ধে তিনি এমন কিছু জানতেন যে জন্য তিনি আমাকে মোটেই পছন্দ করেন না। আমি ভদ্রলোকের মুখের অবস্থা দেখেই তা বুঝতে পারলাম, আমীরও তা টের পেল।

আমীর বল্লেন, তারপর?

তারপর আর কি? এমন লোককে সংগে নিয়ে পথ চলাও নিরাপদ নয় সেকথা কি জান না?

নিশ্চয়ই জানি বন্ধু, তবুও লোকটি ভাল।

—কোকা কোন সময়ই খারাপ হয় না।

আমীর বল্লেন, সে যা হক, আমরাই কথা বলব, সে ত আর বুঝতে পারবে না। এখন বস দুটি কথা বলি।

কথা পরে হবে, বলেই আগন্তুক চলে গেলেন। লোকটি চলে যাবার পর আমীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কি করেছি যে জন্য লোকটি কথা না বলে চলে গেল ?

আমীর বল্লেন, তা আপনি বুঝবেন না। সেদিন আপনি মেগদেবার্গে একটি হিন্দুস্থানী জানা লোকের সংগে চলাফেরা করছিলেন না? সে লোকটি সরকারী লোক। সে আপনাকে নানারূপ ভাবে পরীক্ষা করে। জানি না আপনি তার কাছে কি বলেছিলেন সেজন্য এখন আপনার পেছনে জার্মাণ পুলিশ লেগেছে। এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না সত্যকথা, কিন্তু যারাই আপনার সংগে থাকবে তাদেরই সমূহ ক্ষতি হবে। আমারও কোন ক্ষতি হবে না। আমি এদেশে থাকতে আসিনি। আমি হামবার্গ থেকে বার্লিন দেখতে গিয়েছিলাম। ছিলাম মশিয়ে গুপ্তের হোটেলে। পথে এখানে গত তিন সপ্তাহ ধরে আছি। সত্বরই হামবার্গ থেকে লণ্ডন চলে যাব। আমরা হলাম নাবিক। আমাদের দুর্ঘটনা ঘটবার কোন কারণ নেই। আপনারও নেই। আপনি হলেন রোলিং স্টক। আবর্জনা যেমন আপনার শরীরে লাগে না তেমনি ভাল বলেও কিছু লাগে না। তবে আপনি যাদের সংগ করেন তাদের কিছুটা ক্ষতি হয় বই কি? চলুন এখন যাই। নীরবে উভয়ে ক্লাব হতে চলে এলাম। ভাবলাম এবার থেকে স্বাধীন ভাবেই ভ্রমণ করব। কেউ যদি কোন উপদেশ দিতে আসে তবে তা শুনব না। এটা হল একটা পরস্পর সন্দেহ করা লোকদের আড্ডা। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করে এই লোকটি এত সংবাদ রাখে, অথচ সে একজন সামান্য আরব।

জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

পথে বের হয়েই আমীরকে বিদায় দিয়ে আপন মনে পথ চলতে লাগলাম। খাবারের দোকানে, মনোহারী দোকানে, ক্লাবে সর্ব্বত্র ভিক্ষাপত্র বিলি করতে লাগলাম। কেউ কথা বল্ল, কেউ বল্ল না, কেউ ভিক্ষা দিল, কেউ ভিক্ষা দিল না। আমি ছিলাম নির্লিপ্ত সেজন্য শুধু দেখেই যাচ্ছিলাম আর মনকে বলছিলাম, দেখে নেও মন, আর ত এদেশে আসা হবে না। শুধু আনন্দই করে নেও। প্রাণ ভরে দেখার আনন্দ অনুভব করে নেও। শরীরে তখন শক্তি ছিল, মনকে যেদিকে চালাতাম সেদিকেই চলত। সারাটা সন্ধ্যা শুধু দেখেই কাটালাম। কখনও বা ইচ্ছা করে পুলিশকে গিয়ে নানারূপ প্রশ্ন করতাম। অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়েই সেই প্রশ্ন। জানারও নানা বিষয় ছিল। এমন কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না যাতে পুলিশের ধৈর্যচ্যুত অথবা সন্দেহ হয়।

একটি ঘড়ির দোকানে গিয়ে ঘড়ি কিনতে চেয়েছিলাম। দোকানী বলেছিল, মশাই আপনার হাতে বেশ দামী ঘড়ি আছে, আবার আর একটা কেন? আমি বলেছিলাম, আপনাদে দেশের অনেকগুলি মার্ক জমে গেছে। পঞ্চাশ মার্কের বেশি ত বাইরে নিয়ে যেতে পারব না, সেজন্যই একটা ঘড়ি কিনে নিয়ে যেতে চাই। দোকানী হেসে বল্ল, আপনাকে খাবার খেতে, হোটেলে থাকতে এবং দরকারী খরচের জন্য জার্মাণ জাত অকাতরে দান করেছে, ঘড়ি কেনার জন্যে তারা মার্ক দেয়নি। যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনার ঘড়িটা বদলি করে আর একটা ভাল ঘড়ি দিতে পারি। একটি নূতন ঘড়ি আপনার কাছে বিক্রি করতে পারব না।

ঘড়ির দোকানের ম্যানেজার আমার সংগে বেশ ভাল ব্যবহারই করছিলেন কিন্তু আমারই পাশে দাঁড়িয়ে কতকগুলি লোক আমাকে বিদ্রূপ করছিল এবং কি বলছিল। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে

জানলাম এই লোকগুলি আমার কালো মুখ দেখে জড় হয়েছে এবং কালো লোকটাকে ভাল করে দেখতে চাচ্ছে। শিক্ষিত দেশের পক্ষে এটা কিন্তু মহা অন্যায় কাজ। ভদ্রতা বলে যাদের জ্ঞান নেই তারাই এরূপ ভাবে লোকের দিকে চেয়ে থাকে। পূর্ব জার্মানীতে আমার দিকে এমন করে কেউ চেয়ে থাকত না। কিন্তু যতই পশ্চিমে যাচ্ছিলাম ততই লোক আমাকে হেয় চক্ষেই দেখত। আমি কিন্তু এদের খারাপ ব্যবহারে একটুও রাগতাম না। বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেশের কথাই তাদের কাছে বলতাম। অনেক সময় নাজী পুলিশের সামনেই ন্যাসনেল সোসিয়েলিজমের বিরুদ্ধে বলতাম। সকলেই দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনত আর হাসত। আমার কথার একটু গুরুত্ব দিত না।

ঘড়ির দোকান হতে বের হয়ে একটি ছোট্ট রেস্তোরাঁর গিয়ে কিছু খাবার দিতে আদেশ দিলাম। এখানে কেউ আমার মুখ দেখতে আসেনি। রেস্তোরাঁর মালিক একজন হংগেরীয়ান্ জু। হংগেরীয়ান জু তখনও জার্মানীতে অবাধ বাণিজ্য করতে পারত। তবে এদের বিরুদ্ধেও বিদেশ থেকে নানারূপ উস্কানী আসত। এমন কি জার্মানীতে যে সকল ইণ্ডিয়ান থাকতেন তাঁরাও পারলে ইহুদী বিদ্বেষ প্রচার করতে ছাড়তেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কথা এখানে না বললেও চলে।

দোকানী খাবার দিয়ে আমাকে ফরাসী ভাষায় কি বল্ল। তাকে ভদ্র ভাবেই বল্লাম যে আমাদের দেশে শুধু ইংলিশই বিদেশী ভাষারূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেজন্য ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ভাষা আমার জানা নাই। আমার কথা শুনে লোকটি সুখী হয় এবং একটু ধীরে সুস্থির হয়ে খেতে বলে। অবশ্য কথাগুলি সে ফরাসী ভাষায়ই বলছিল। কতক্ষণ পর দোকানীর কন্যা ঘরে প্রবেশ করে আমার মত বিদেশীকে দেখতে পেয়ে মধুর স্বরে সুসন্ধ্যা জানিয়ে

আমারই কাছে বলল। পাঠক আমার ভ্রমণ কাহিনীতে যুবতীর কথা মোটেই দেখতে পাননি। এটিই প্রথম। যুবতী সুন্দরী। তার সৌন্দর্য কথার ভেতর দিয়ে আমার মনে আরও দাগ কাটছিল। যুবতী অনর্গল ইংলিশ ভাষায় বলছিল, আমি ইহুদী কন্যা। ধর্ম সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বুঝতে পেরেছি এখন আদম ইভের যুগ নেই। ধর্ম সম্বন্ধে ইউরোপ অনেক এগিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে। ধর্ম সম্বন্ধে যুবতী যখন কথা বলছিল তখন তার পিতা দোকান বন্ধ করে দেন। রুদ্ধ দরজার ভেতর বসে যুবতী আমার কাছে বলছিল, ধর্ম, এই ত ধর্ম, প্রাণের দায়ে এবং আমার ছোট ভাইটির মায়ার আমার মা বাবা প্রটেষ্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। আমরা ইহুদী বলে পরিচয় দেই না, তবুও লোকে ইহুদী বলে, তবুও লোক আমাদের ঘৃণা করে। শুনেছি ইণ্ডিয়াতে অস্পৃশ্য বলে একটা জাত আছে, তাদের ইণ্ডিয়ানরা হত্যা করে না, কাজ করায়। আমাদেরও যদি ইউরোপের লোক অস্পৃশ্য করত আর প্রাণ না নিত তবুও সুখী হতাম। আমাদের অধিকার থাকত। আমরা ব্যবসা করি। ব্যবসা কে না করে? বৃটিশ জার্মানী হতে মাল নিয়ে বিদেশে চালান দেয়, সেই মাল হতে বৃটিশ বেশ মোটা টাকা উপার্জ্জন করে। জার্মান জার্মানদের কাছে মাল বিক্রি করে, তারাও মুনাফা খায়। কই তাদের ত কেউ মুনাফাখোর বলে না? বৃটিশকে কেউ মুনাফাখোর বলে না, বলে আমাদের, আমরা কি দোষ করেছি? আমরা আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার জন্য আবেদন করেছি, অবশেষে কনসালদের কাছে শরীর পর্য্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছি কিন্তু কেউ ভিসা দিচ্ছে না, এমনকি প্যালেস্টাইন যাবারও আদেশ পাচ্ছিনা। পর্যটক, তোমাকে দেখে আমার হিংসা হয়। তুমি দেশ দেশান্তরে মহানন্দে ভ্রমণ কর আর আমরা

ইউরোপের পাগলা গারদে পচে মরছি। তোমাকে বিয়ে করলে যদি তুমি আমাদের ইউরোপের বাইরে নিয়ে যেতে পার তবে এখনই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।

পিতার সামনে দাঁড়িয়ে কন্যার এহেন ব্যগ্রভাবে কথা বলতে দেখা এই প্রথম। আমি মাথা নত করে অনেকক্ষণ থাকার পর উপদেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সকলেই চীনের সাংহাই যাবার জন্য চেষ্টা কর, হয়ত কৃতকার্য হবে। আমার উপদেশ মত কাজ করে তারা কৃতকার্য হয়েছিল এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন আমি সাংহাই পৌঁছি তখন এই যুবতী এবং তার মা বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়। যুবতী তখন কয়েকটি ছেলে মেয়ের মা হয়েছিল। তার পিতা বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার মা একটি রেঁস্তোরার মালিক হয়েছিলেন। আমি যখন তাদের রেঁস্তরায় মিঃ বাগচিকে নিয়ে যেতাম তখন তারা কোন কথাই বলত না, কিন্তু যখনই একলা যেতাম তখনই তারা মন খুলে কথা বলত। সাংহাই আসার পর এদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের পরিবর্তন হয়েছিল। তারা হিটলার, মুসলিনী অথবা অন্য কোনও উগ্র সাম্রাজ্যবাদীর নামে বদনাম করত না, তারা বলত সাম্রাজ্যবাদ যে কোনও প্রকারেরই হউক তাই ধ্বংস হউক। অবশ্য এসব কথাও তারা প্রকাশ্যে কারো কাছে বলত না। ঐ কথাগুলি তাদের পরিচিত লোকের মধ্যেই বলা কওয়া করত।

পাঁচ দিন একটি শহরে থাকা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না সেজন্য ষষ্ঠদিন সকাল বেলাই হানোভারের দিকে রওয়ানা হই। পথ এতই সুন্দর এবং মসৃণ ছিল যে সাইকেল চালাতে মোটেই কষ্ট হয়নি। বেলা দশটার সময় হঠাৎ আকাশ মেঘমালায় ছেয়ে ফেলে। উত্তরে বাতাস দক্ষিণ দিকে ঠেলতে থাকে। বিপরীত দিকের বাতাস

আমারই কাছে বলল। পাঠক আমার ভ্রমণ কাহিনীতে যুবতীর কথা মোটেই দেখতে পাননি। এটিই প্রথম। যুবতী সুন্দরী। তার সৌন্দর্য কথার ভেতর দিয়ে আমার মনে আরও দাগ কাটছিল। যুবতী অনর্গল ইংলিশ ভাষায় বলছিল, আমি ইহুদী কন্যা। ধর্ম সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বুঝতে পেরেছি এখন আদম ইভের যুগ নেই। ধর্মসম্বন্ধে ইউরোপ অনেক এগিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে। ধর্ম সম্বন্ধে যুবতী যখন কথা বলছিল তখন তার পিতা দোকান বন্ধ করে দেন। রুদ্ধ দরজার ভেতর বসে যুবতী আমার কাছে বলছিল, ধর্ম, এই ত ধর্ম, প্রাণের দায়ে এবং আমার ছোট ভাইটির মায়ার আমার মা বাবা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। আমরা ইহুদী বলে পরিচয় দেই না, তবুও লোকে ইহুদী বলে, তবুও লোক আমাদের ঘৃণা করে। শুনেছি ইণ্ডিয়াতে অস্পৃশ্য বলে একটা জাত আছে, তাদের ইণ্ডিয়ানরা হত্যা করে না, কাজ করায়। আমাদেরও যদি ইউরোপের লোক অস্পৃশ্য করত আর প্রাণ না নিত তবুও সুখী হতাম। আমাদের অধিকার থাকত। আমরা ব্যবসা করি। ব্যবসা কে না করে? বৃটিশ জার্মানী হতে মাল নিয়ে বিদেশে চালান দেয়, সেই মাল হতে বৃটিশ বেশ মোটা টাকা উপার্জ্জন করে। জার্মান জার্মানদের কাছে মাল বিক্রি করে, তারাও মুনাফা খায়। কই তাদের ত কেউ মুনাফাখোর বলে না? বৃটিশকে কেউ মুনাফাখোর বলে না, বলে আমাদের, আমরা কি দোষ করেছি? আমরা আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার জন্য আবেদন করেছি, অবশেষে কন্‌সালদের কাছে শরীর পর্য্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছি কিন্তু কেউ ভিসা দিচ্ছে না, এমনকি প্যালেস্টাইন যাবারও আদেশ পাচ্ছিনা। পর্যটক, তোমাকে দেখে আমার হিংসা হয়। তুমি দেশ দেশান্তরে মহানন্দে ভ্রমণ কর আর আমরা

ইউরোপের পাগলা গারদে পচে মরছি। তোমাকে বিয়ে করলে যদি তুমি আমাদের ইউরোপের বাইরে নিয়ে যেতে পার তবে এখনই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।

পিতার সামনে দাঁড়িয়ে কন্যার এহেন ব্যগ্রভাবে কথা বলতে দেখা এই প্রথম। আমি মাথা নত করে অনেকক্ষণ থাকার পর উপদেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সকলেই চীনের সাংহাই যাবার জন্য চেষ্টা কর, হয়ত কৃতকার্য হবে। আমার উপদেশ মত কাজ করে তারা কৃতকার্য হয়েছিল এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন আমি সাংহাই পৌঁছি তখন এই যুবতী এবং তার মা বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়। যুবতী তখন কয়েকটি ছেলে মেয়ের মা হয়েছিল। তার পিতা বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার মা একটি রেঁস্তোরার মালিক হয়েছিলেন। আমি যখন তাদের রেঁস্তরায় মিঃ বাগচিকে নিয়ে যেতাম তখন তারা কোন কথাই বলত না, কিন্তু যখনই একলা যেতাম তখনই তারা মন খুলে কথা বলত। সাংহাই আসার পর এদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের পরিবর্তন হয়েছিল। তারা হিটলার, মুসলিনী অথবা অন্য কোনও উগ্র সাম্রাজ্যবাদীর নামে বদনাম করত না, তারা বলত সাম্রাজ্যবাদ যে কোনও প্রকারেরই হউক তাই ধ্বংস হউক। অবশ্য এসব কথাও তারা প্রকাশ্যে কারো কাছে বলত না। ঐ কথাগুলি তাদের পরিচিত লোকের মধ্যেই বলা কওয়া করত।

পাঁচ দিন একটি শহরে থাকা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না সেজন্য ষষ্ঠদিন সকাল বেলাই হানোভারের দিকে রওয়ানা হই। পথ এতই সুন্দর এবং মসৃণ ছিল যে সাইকেল চালাতে মোটেই কষ্ট হয়নি। বেলা দশটার সময় হঠাৎ আকাশ মেঘমালায় ছেয়ে ফেলে। উত্তরে বাতাস দক্ষিণ দিকে ঠেলতে থাকে। বিপরীত দিকের বাতাস

ঠেলে সাইকেল চালানো উত্তর জার্ম্মাণীতে শক্তিসাধ্য কিন্তু ডান অথবা বাঁ দিক থেকে যখন প্রবল ভাবে বাতাস বইতে থাকে তখন সাইকেল চালানো অসম্ভব। উপায়ান্তর না দেখে পদব্রজে সাইকেল ঠেলেই পথ চলা ভাল মনে করলাম।

কতক্ষণ যাবার পর পথের পাশে একটি অপরূপ দৃশ্য দেখলাম। কতকগুলি ছেলে মেয়ে পথের পাশে এক স্থানে জড় হয়ে বসে ছিল। তারাও প্রচণ্ড বাতাস ঠেলে পায়ে হেটে পথ চলতে পারছিল না। আমার মনে হয়েছিল এই বালক বালিকাদের মধ্যে কারো বয়স দশ বৎসরের বেশি ছিল না। এত অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদেরও হিটলার বাহিনীতে নেওয়া হয় এবং তাদের প্রতি কি আদেশ ছিল জানি না, তবে তারা সেদিন যে হেনোভার পৌছুতে পারবে না তা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম।

দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম এদের পাশে বিশ্রাম করব কি না? জার্ম্মাণীতে শ্বেতকায় ছেলে মেয়েদের কাছে দাঁড়াতেও ভয় হয়। যখন তাদের কাছে পৌছলাম তখন আর দাঁড়াতে ইচ্ছা হল না। না দাঁড়াবার প্রথম কারণ ছিল, এরা হয়ত আমাকে দেখে ভয় পাবে, দ্বিতীয় কারণ ছিল, এদের পাশে আমাকে দাঁড়ানো দেখে পথচারীর রাগ হবে এবং প্রহার করতে পারে। এরূপ চিন্তা করে যখন চলছিলাম তখন কয়েকটি ছেলে ইংগিত করে আমাকে দাঁড়াতে বল্ল। পথে না দাঁড়িয়ে একেবারে তাদের কাছে গেলাম এবং হাইল হিটলার বল্লাম, তখন তারা সমস্বরে হাইল হিটলার বলে, নানারূপ প্রশ্ন করল। অনেকে আমার আসল রং দেখবার জন্য সার্টের বোতাম খুলে যখন দেখল ভেতরটা সাদা আর বারটা কালো তখন তারা কি বলছিল তা মোটেই বুঝতে পারিনি। হিটলারের জার্ম্মাণীতে শিশুদের পর্যন্ত শেখানো হয়েছিল,

পশ্চিম ইউরোপের লোকই মানুষ। এছাড়া পৃথিবীতে যত লোক আছে তারাও মানুষ বটে কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের লোকের মত মনুষত্ব বিকাশ হয়নি। যাদের শরীরের রং যত কালো সেই তত নিকৃষ্ট, তারই মানসিক শক্তি তত বিকাশিত হয়নি।

বেলা বারটার সময় দমকা হাওয়া বন্ধ হওয়ায় এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম।

পথে একটি যুবকের সংগে সাক্ষাৎ হয়। যুবক পায়ে হেটে হেনোভারের দিকে যাচ্ছিল। কতক্ষণ তার চলনের নমুনা দেখেই মনে হল সে নাজী পার্টিতে যোগ দেয়নি এবং কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। যুবকের সংগে কথা বলতে ইচ্ছা হ'ল কিন্তু কোন্ ভাষায় কথা বলব তাই চিন্তা করে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে জার্মাণ ভাষায় কথা বলা ঠিক করে তার কাছে গিয়ে সাইকেল হতে নামলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি হেনোভার যাবে? যুবক বল্লে, হাঁ সেদিকেই যাচ্ছি। এর বেশি কথা হল না। আমিও পথে আর না দাঁড়িয়ে হেনোভারের দিকে চল্লাম—কিন্তু জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল এমন করে কেন যুবকবৃন্দ পথে ঘাটে অসহায় অবস্থায় চলাফেরা করে? পূর্বে এরূপ অসহায় যুবকবৃন্দকে পথে ঘাটে হাটতে দেখলেই মনে হ'ত, এরা কোনও রাষ্ট্রনৈতিক দলের লোক, অর্থাভাবে পায়ে হেটে চলছে। পশ্চিম জার্মাণীতে আসার পর আমার মত পরিবর্তন করতে হয়েছিল কারণ এখানকার রাষ্ট্রনৈতিকরা বিনা কারণে পথে ভ্রমণ করত না।

কয়েকদিন পর এ বিষয় নিয়েই একজন জার্মাণের সংগে কথা হয়। তিনি বলেন, যখনই ছেলেরা আঠার উনিশ বৎসরে পদার্পণ করে তখনই তাদের কাজ করতে বলা হয়। কাজ সর্বত্র পাওয়া যায় না। সেজন্য যুবকদের কাজের খুঁজে বের হতে হয়। আমাদের দেশে যেমন

অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ ইত্যাদি হয়ে থাকে ইউরোপীয় সভ্যতা মতেও "যুবক বিদায়" বলে একটি "কর্মারম্ভ" অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কর্মারম্ভ অনুষ্ঠানটি পিতার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মা কর্মারম্ভ অনুষ্ঠানটি মোটেই পছন্দ করেন না। কর্মারম্ভ অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলা পিতা ঘুম থেকে উঠেই মাকে বেশ ভাল খাদ্য প্রস্তুতের আদেশ দেন। মা ভাল খাদ্য প্রস্তুত করে টেবিলে রাখেন, তারপর যে ছেলের কর্মারম্ভ হবে তাকে যথাবিহিত রূপে নিমন্ত্রণ করা হয়। খাবার সময়ও ছেলেটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির চেয়ার দখল করে। খাবার হয়ে গেলে পিতা পুত্রের হাতে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে করমর্দ্দন করে বিদায় করেন। এরূপ ভাবে বিদায় পাবার পর ছেলে আর কখনও পিতার ঘরে ফিরে আসে না, চিঠির বিনিময় করে। কর্মারম্ভের পর পিতাপুত্রে সমভার হয়ে যায়। এই নিয়মটি মজুর শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, মধ্যবিত্ত এবং কোন কোন ধনী পরিবারেও দেখা যায়। তবে এই নিয়মটি ইউরোপের সর্বত্র দেখা যায় না। যে সকল দেশ সর্বতোভাবে পুঁজিবাদী হয়েছে, সেই দেশগুলিতেই এই কর্মারম্ভ নিয়মটি প্রচলিত হয়েছে। জার্মাণীতে পুরাদস্তুর মত পুঁজিবাদের প্রচলন হয়েছিল বলেই তাদের মধ্যে কর্মারম্ভ অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, মোকদ্দমারম্ভ ইত্যাদি পর্ব হয় কিন্তু কর্মারম্ভ হয় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোকের পক্ষে সুখেরই কথা বলতে হবে কারণ আমাদের দেশে এখনও কাজের মর্যাদা হয়নি। অথবা অর্থাভাবও ঘটেনি।

একদা কেন প্রায়ই শুনতাম এবং এখনও শুনি জার্মাণীতে নাকি সকলেই সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে এবং ইণ্ডিয়ানদের দেখা পেলে সংস্কৃত ভাষায়ই কথা বলে। হেনোভারের পুর্ব্বের শহরে আসার পর পালেষ্টাইনের আরবটি আমাকে বলেছিল, তার দেশের অনেকেরই ধারণা, জার্মাণরা আরবী ভাষা বেশ ভাল বলতে পারে এবং

আরব দেখলেই জার্মাণরা আরবী ভাষায় কথা বলে। আমি যখন আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের অভিমত প্যালেস্টাইনের আরবদের কাছে প্রকাশ করলাম তখন তারা আমাকে বল্লেন, আপনাদের দেশের মৌল্লা (ব্রাহ্মণ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছিল) আর আমাদের দেশের মৌল্লারা একই প্রকারের। এদের সাধারণ জ্ঞান বলে কোনও জ্ঞান নেই। সাধারণ লোক কিন্তু এদের কথা শোনে এবং এদেরই কথামত কাজ করে, সেজন্যই আমরা সকল দিক দিয়ে পশ্চাদ্‌পদ। ১৯৩৪ সালে এক জন ভারতীয় ইংলিশ প্রফেসরের সংগে দেখা হবার পর তিনি বলেন, জার্মাণীর হেনোভার শহরের লোক এখনও ইংলিশ ভাষা ব্যবহার করে অর্থাৎ হেনোভারের লোকের ভাষাই হল ইংলিশ। প্রফেসর মহাশয়ের কথাটি হেনোভারে যাবার পর মনে হয়। সেখানে দেখতে পেলাম স্থানীয় লোক কেউ ইংলিশ বলে না। জার্মাণ ভাষার সংগে ইংলিশ ভাষার যে সামান্য মিল আছে, তা ছাড়া আর কোন মিল নেই। ভারতীয় প্রফেসর মহাশয়ের মগজে এই ধারণাটি কেন এসেছিল তা হেনোভার পৌছুবার পর বুঝতে সক্ষম হই।

প্রফেসর অর্থাৎ আচার্য মহাশয় ছিলেন ইংলিশ ভক্ত। ইংলিশদের তিনি মনে প্রাণে ভালবাসতেন বলেই, ইংলিশরা কোথা হতে এসে কোথায় বসবাস করেছিল সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন এবং উপযুক্ত পাত্র অর্থাৎ আমাদের মত পথিক পেলেই তাই উচ্চ নিনাদে বলে সুখী হতেন। এরূপ বিদেশী ভক্ত লোক দেশের লোকের কি সর্বনাশ করে তারা কিন্তু বুঝতে পারে না।

হেনোভার

হেনোভার পুরাতন শহর। জার্মাণ সরকার অনেক চেষ্টা করেও হেনোভারের পুরাতন দাগগুলি মুছতে পারেন নি। হেনোভারে পৌঁছে শহরটি আগাগোড়া দেখার পর বেশ আরাম পাই এটা হবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। অষ্ট্রিয়া থেকে আরম্ভ করে হেনোভার পর্যন্ত সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে চোখ দুটা একঘেয়ে হয়ে উঠে। হেনোভারে এসে পার্থক্য দেখে, পুরাতনকে নূতন বলে গ্রহণ করে কিছুটা আরাম পেয়েছিলাম। পঙ্কিলে যাদের জন্ম এবং বৃদ্ধি তারা পঙ্কিল পূর্ণ স্থানগুলি দেখে আরাম পায়। আমিও সেরূপ ধরণেরই এক জন। পথের পাশে অশ্বত্থ গাছ দেখে সুখী হই, কিন্তু চিন্তা করি না অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় কত বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকার সুযোগ পায়। হেনো-ভারের রাজপথের পাশে যখন পুরাতন বাড়িগুলি দেখে আনন্দ পেতাম তখন মনকে বলতাম, "মন" ভাল করে দেখে নেও, এটাই হল তোমার কৃষ্টি। একাকী পথ চলার সময় মনটাকে দুভাগ করতাম এবং কখন বা মনে মনে আর কখন বা উচ্চারণ করে কথা বলতাম। পথচারী সেজন্য আমাকে পাগল বলত না কারণ তারা আমার ভাষা বুঝতে পারত না, ভাষা বুঝত না বলেই উচ্চারণ করে নিজের সংগে নিজেই কথা বলে আরাম পেতাম। একদিন পথ চলার সময় যখন এরূপ ভাবে কথা বলছিলাম তখন একজন আরব কি বলছিল। তার কথার মধ্যে এখনও একটি কথা মনে আছে। সেই কথাটি হ'ল "খুদবেখুদ"।

হেনোভারের চারিদিক দেখে হোটেলের সন্ধান করতে থাকি। এক জন জার্মাণকে হোটেল দেখিয়ে দিতে বলায় সে আমাকে হোটেল দেখা-

নোর পরিবর্তে টেলিফোন্ বক্সে ফোন করতে গেল দেখে একটু ভীত হয়ে ভাবছিলাম কি অপরাধ করেছি যার জন্য লোকটা টেলিফোন করতে গেল? চম্পট দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কতক্ষণ যাবার পরই একজন লোক আমাকে ডাকল এবং ইংগিতে তার সংগে চলতে বল্‌ল। আমি তার সংগে চলতে লাগলাম। ঘণ্টা খানেক চলার পর একটি হোটেলে আসলাম। হোটেলটি ত্রিতল এবং দেখতে বড়ই সুন্দর। লোকটি আমাকে একখানা রুম দেখিয়ে দিল এবং ইংগিতে বল্ল এই রুমটাতেই আমাকে থাকতে হবে। রুমটাতে থাকতে রাজি হয়ে নীচ থেকে পিঠ ঝোলাটা উঠিয়ে নিয়ে আসবার সময় সাইকেলটার যেন প্রাণ আছে তাই মনে করে সাইকেলটাকে উদ্দেশ্য করে বল্লাম, তুমি এখানে থাক, আমি এখন যাই, কেউ যদি তোমাকে নিয়ে যেতে আসে তবে কোথাও যেও না। পিঠ ঝোলাটা রুমে এনে রেখে এক খানা আরাম কেদারায় বিশ্রামার্থে বসলাম। ইতিমধ্যে লোকটিও হাইল হিটলার বলে চলে গেল। রুমের সামনার দরজাটা খোলাই থাকল। ইউরোপের কোথাও দরজা খুলে বসে থাকা অসভ্যতার মধ্যেই গণ্য করা হয়। এর এক মাত্র কারণ হ'ল আবহাওয়া। আমার সে খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ একজন লোক রুমে এসেই বল্ল, এরূপ ভাবে দরজা খুলে বসে থাকা মহা অন্যায় কাজ, এরূপ করে বসে না থাকার জন্য বোধহয় আপনাকে কেউ কিছু বলেনি?—হাঁ মশাই মহা অন্যায় কাজই করে ফেলেছি সেজন্য ক্ষমা করবেন। আপনি ত বেশ ইংলিশ বলতে পারেন দেখছি? নবাগত অন্য একখান চেয়ার এনে আমার কাছে বসে বল্লেন, এটা জাংকার্ণ হোটেল। এখানে বিদেশের বড় বড় লোক এসে থাকেন। এখানে থাকবার জন্যই শুধু দৈনিক পনের মার্ক দিতে হয়। তা দিতে পারবেন কি?—হাঁ নিশ্চয়ই পারব, বিল নিয়ে

আসুন এখনই দিয়ে দিচ্ছি। লোকটি আর কথা না বাড়িয়ে নীচে গিয়ে পনর মার্কের একখানা বিল নিয়ে এল। আমি তাকে পনেরটি মার্ক দিয়ে দিলাম এবং রসিদখানা পকেটে রেখে কোথায় কি আছে দেখাতে বল্লাম। লোকটি একটি বোতাম টিপা মাত্র একটা দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। দেখলাম সেই রুমটা বাথরুম। এরূপ সুন্দর বাথরুম ইউরোপে কমই দেখেছি। দেখবই বা কি করে? বড় হোটেলে কমই গিয়েছি। এখানে বাথরুমটির কথা বলা দরকার মনে করি। গরম জল এবং শীতল জল স্নানের টাবে ত আসছিলই উপরন্তু একটা শাওয়ার বাথও ছিল। বাথরুমের পাশেই ড্রেসিং রুম। সেখানে তিনটা বড় বড় আয়না ছিল। দাঁড়ালে শরীরের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যেত। বাথরুম এবং ড্রেসিং রুম দেখেই আমি সুখী হই। শোবার রুমে সোফা, নানারকমের চেয়ার এবং সুন্দর কয়েকটি ছাইদানীও ছিল। রুমগুলি ভাল করে দেখে লোকটিকে বিদায় দেবার পূর্বে বললাম, আমি এখানে আগামীকল্যও থাকব। লোকটি আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বল্লে, তাহলে আপনি ব্রেকফাষ্টও পাবেন। খাবার খেয়ে বসবার রুমে এসে দেখি পাঁচজন লোক বসে কি কথা বলছে। আমি আর এদের বিরক্ত করা পছন্দ করলাম না। শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই স্থানত্যাগ করব ভেবে বের হতে যাচ্ছি এমনি সময় বয় প্রভাতী খানা এনে হাজির করল। প্রভাতী খানা বড়ই সুখাদ্য। পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা হল না। বয়কে আরও ষোলটি মার্কস্ দিয়ে বল্লাম, আগামীকল্য সকালে আমি এখান থেকে বিদায় নেব। সে বল্লে, আগামীকল্য যদি নাও থাকেন তবুও আপনি প্রভাতী খানা খেতে পারেন। ধন্যবাদ জানিয়ে হেনোভারের পথে বের হলাম।

এখানে একটি বৈজ্ঞানিকদের আড্ডা আছে তা বার্লিনে শুনতে পাই। ইচ্ছা হচ্ছিল এদের সংগে একবার দেখা করে যাই কিন্তু এঁরা থাকেন কোথায় সে সংবাদটি জানা ছিল না। সে জন্য দু এক জন পুলিশের কাছে বৈজ্ঞানিকদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করি। পুলিশের সংগে যখন আমি কথা বলছিলাম তখন একজন বৃদ্ধ জার্মাণ আমাদের কথা শুনে বল্লেন, মঁশিয়ে আমার সংগে আসুন। আমি বিনাবাক্যব্যয়ে বৃদ্ধের সংগে চল্লাম। বৃদ্ধ আমাকে তার হোটেলে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে এলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এদেশে ম্যাক্স মূলার নামে এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের দেশের অনেক বই ইংলিশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বেদ চারখানাও তিনি অনুবাদ করেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় হল বেদ পড়ে ম্যাক্স মূলার কি উপসংহারে এসেছিলেন তাই জেনে যাওয়া।

—এ বিষয় জানবার জন্য মহাশয়ের বৈজ্ঞানিকদের স্মরণাগত হতে হবে না। এটা সাধারণ কথা মাত্র। আমি এক্ষণই একজন লোককে ডেকে নিয়ে আসছি তিনিই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

ভদ্রলোক সেই ব্লকেই থাকতেন। ডাকা মাত্র চলে এলেন। আমাকে দেখারও উৎসাহ ছিল। কিন্তু যখন আমাকে দেখলেন তখন পণ্ডিত মহাশয়ের উৎসাহ কমে যায়। তিনি হয়ত ভাবছিলেন আমি তাঁরই মত কিছু হব। অন্তত কিছুটা নরডিক্ রক্ত আমার মধ্যে থাকবেই। তার নিরুৎসাহ দেখে আমিই মুখ বাড়িয়ে বল্লাম, আমার মুখ দেখে আপনি সুখী হবেন না তা আমি জানতাম। বর্ণবিদ্বেষ আপনাদের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তা পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে না। তবুও বলুন আপনার বেদ সম্বন্ধে কি ধারণা। পণ্ডিত গাম্ভির্যের সহিত বল্লেন, "এসব হল আমাদের পূর্ব পুরুষ যখন চাষা ছিলেন

তখনকার ভাষা। এর বেশি আর কিছুই নয়।"

—আপনাদের পূর্ব-পুরুষ বৈদিক যুগে কি মামুলী চাষাই ছিলেন?

—হঁ্যা, তার বেশি কিছুই নয়। এখন আমরা অনেক উন্নতি করেছি। ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করব।

এই কয়টি কথা বলেই পণ্ডিত মহাশয় কাউকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। আমি পণ্ডিতের রগড় দেখে বেশ করে হাসলাম এবং লণ্ডনে যেসকল টেস্‌ফিরিঙ্গি পিতৃভূমি দেখবার জন্য যায় তাদের সংগে নিজের বেশ সাদৃশ্য খুজে পেলাম। আমরা বলি, আমরাও আর্য, কিন্তু নিজের চেহারার দিকে একবারও তাকাই না। আজ যে হিন্দু,-মুসলমান হল, কালই সে কুরেশী বলে পরিচয় দিতে উৎসাহী হয় এবং নিজের আসল জাত ভুলে গিয়ে নিজকে বিদেশী বলতে পারলেই ভাল মনে করে। আমারও সেই অবস্থা। আমি আমার আসল জাত ভু[illegible] গিয়ে কয়েক দিনই নিজকে আর্য বলে পরিচয় দিয়েছিলাম, কিন্তু এই [illegible]ণ পণ্ডিত আমার চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে বল্লেন, বেদ তোমাদের পূর্ব-পু[illegible] কিছুই নয়, আমাদের পূর্ব-পুরুষের। আমিও অবনত মস্তকে স্বীকার করে সেদিন থেকে সেই বর্ব্বর চাষাদের ভাষার কথা ভু[illegible] বাধ্য হয়েছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল এদের ভাষা ভুলে যাই, এদের [illegible]র ব্যবহার সবই ভুলে যাই আর যোগ দেই গিয়ে নাগা এবং কুকীদের সংগে কারণ তাদের রক্তও আমার শরীরে বইছে। হয়ত তারা আমাকে ঘৃণা করবে না।

সোফার উপর হেলান দিয়ে যখন এসব চিন্তা করছিলাম তখন জার্মাণ বৃদ্ধ আমাকে বল্লেন, আমি এই নাজিটাকে বড়ই ঘৃণা করি কিন্তু মঁশিয়ে এ লোকটাই এ শহরে কে আর্য আর কে অনার্য, ঠিক করবার ভার পেয়েছে। এই লোকটা অনেক বৎসর ভারতে কাটিয়ে এসেছে।

এসব লোকের কথায় আপনার অভিভূত হবার দরকার নেই, আমি আপনাকে এখন একখানা বই দেব, সেই বইখানা পড়বেন। আমার দেওয়া বইখানা পড়লে আপনার মনের গ্লানি চলে যাবে। তবে কথা হ'ল এরূপ বই যদি জার্মান পুলিশ আপনার কাছে দেখতে পায় তবেই জার্মানী হতে তাড়িয়ে দেবে, হয়ত জেলেও আবদ্ধ করে রাখতে পারে। বইখানার নাম নোট বইএ লিখেই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম এবং ইংলণ্ডে গিয়ে বইটা কিনব স্থির করেছিলাম।

এই জার্মান বৃদ্ধের সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁরই কথায় আমি জান্‌কার্স হোটেল পরিত্যাগ করে বেকার মজুর হোটেলে স্থান নেই এবং বেকারদের সংগে মিলে মিশে হেনোভারে আরও সাত দিন কাটাতে সাব্যস্ত করি। অনেকে হয়ত বলবেন জান্‌কার্স হোটে থাকবার মত শক্তি আমার ছিল না। যদি এই ধারণা কেউ করে থাকেন তবে ভুল করবেন। ঘৃণা করেই জান্‌কার্স হোটেল পরিত্যাগ করে এসেছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

জনৈক তথা কথিত অছুৎ হঠাৎ একটা বড় পদবী পেয়ে দিল্লী সিমলা করতে থাকেন। আমি তাঁকে সিমলাতেও দেখেছি এবং দিল্লীতেও দেখেছি। উভয় স্থানেই তিনি তথাকথিত উচ্চবর্ণের সংগে মিশবার চেষ্টা করতেন এবং সর্বত্রই অপব্যবহার পেতেন। একদিন সেই লোকটাকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিল, স্যার, এসব করে শান্তি পাবেন না। নিজের দলে ভিড়ে পড়ুন আর ঐ আমার দেওয়া কেতাব খানা হজম করে নিজের দলের লোককে বুঝাবার চেষ্টা করুন। দেখবেন এতে আপনার পদবীও বাড়বে, সম্মানও পাবেন এবং ভবিষ্যতে হয়ত একটা কেউকেটাও হতে পারবেন। ভদ্রলোক আমার কথা মত কাজ করতে সক্ষম হননি। তাঁর দলে মিশতে বড়ই বাধত। এমন কি

তিনি বাবাকে ফাদার বলতেন, যেমন আমার "ফাদার" অমুক কাজ করেছেন ইত্যাদি। আমি সেরূপ অচ্ছুৎ নই। আমার আত্মমর্যাদা আছে সেজন্যই গরিবের সংগে মিশতে আমার কষ্ট হত না। ধনীদের আমি অধম ভাবতেও কুণ্ঠা বোধ করতাম না। উভয় স্তরের চিন্তাধারা বজায় রাখতে হলে মাথা নত করতে হয় না, মাথা উঁচু রেখে বুক ফুলিয়ে চলবার ক্ষমতা আমার ছিল।

জার্মাণ পণ্ডিতের সংগে দেখা হবার পর থেকেই জার্মানদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। বৃদ্ধ জার্মাণ যতই আমাকে বুঝতে দিলেন, নাৎসীরাই এরূপ ভাবে কথা বলে, অন্য কেউ সেরূপ ধারণা পোষণ করে না তবুও মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। শান্তি না পাবার প্রথম কারণ হল জার্মাণ পণ্ডিত যাই বলুক তাতে আমার এবং আমার মত লোকদের কিছু আসে যায় না, কিন্তু ক্রমাগতই মনে ধাক্কা লাগছিল স্বদেশের কথা ভেবে। আজ যে ভাবে আমি জার্মাণ পণ্ডিতের দ্বারা অপমানিত হলাম আমার স্বদেশে আমার কত ভাই বোন এরূপ ভাবে জাত্যাভিমানীদের দ্বারা নিগৃহীত হয় তার কি ইয়ত্তা আছে?

বৃদ্ধ জার্মাণ ভদ্রলোকের সংগে কয়েক দিন থাকার পর যেদিন হেনোভার ছেড়ে আসি সেদিন তিনি আমাকে তাঁর ঠিকানা দিয়ে বলেন, দেশে পৌঁছে যেন পত্র দেই। ঠিকানা আমার সংগে ছিল কিন্তু স্থানীয় পুলিশ যেদিন ইলিসিয়াম রোডে আমাকে প্রশ্ন করার জন্য টেনে নিয়ে যায় সেদিন সেই ঠিকানা সমেত ইউরোপের প্রেস কাটিং বইটি সেখানেই রেখে আসতে হয়। যে দিন ঘটনাটি ঘটে সেদিন সারা রাত ঘুমাতে পারি নি। অনবরত ভাবছিলাম এর কি কোন প্রতিকার নেই? অনুসন্ধান করে জানতে পারি এরূপ ধরনের অত্যাচারের প্রতিকার হতে রক্ষা পেতে ভারতবাসীর পক্ষে আরও কয়েক শত বৎসরের দরকার।

জার্ম্মাণী এবং মধ্য ইউরোপ

বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বের হলাম। একটা দিন পথে থেকে পরের দিন সকাল বেলা যখন জার্মাণ সীমান্ত অতিক্রম করছিলাম তখন দেখতে পেলাম দুজন এস্ এস্ পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাছে গিয়ে সাইকেল হতে নামলাম এবং পাসপোর্ট সমেত ম্যানিবেগটা দিয়ে বললাম, এর বেশি টাকাপয়সা আমার কাছে নেই। এস্ এস্ সেপাইরা আমার কিছুই না দেখে পাসপোর্ট এবং ম্যানিবেগ ফিরিয়ে দিয়ে বললে, যদি আপনার কাছে পঞ্চাশ মার্কের বেশিও থাকত তবে নিতে দিতাম, হেইল হিটলার মশিয়ে। আমিও তাদের সর্বশেষ "হেইল হিটলার" জানিয়ে বিদায় নেই।